তৃতীয় অধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসাহিত্য ঃ বিষয় ও শিল্পরূপ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসাহিত্যের সম্ভার সংখ্যা তত্ত্বের বিচারে বিপুল এবং গুণগত বিচারে বৈচিত্র্যপূর্ণ শিল্পরূপের অধিকারী। তাঁর বিপুল সম্ভারের গদ্যসাহিত্য, রূপভেদের ভিন্নতার নিরিখে আমরা এই অধ্যায়টিতে তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছি — ক) গদ্য সাহিত্যের প্রথম পর্যায় ঃ উপন্যাস খ) গদ্য সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায় ঃ রিপোর্টাজ, ভ্রমণকাহিনী ও অন্যান্য গদ্য রচনা গ) অন্যান্য গদ্যগ্রন্থ ও অগ্রন্থিত রচনা। এই অধ্যায়ে আমরা পর্যায় তিনটিতে তাঁর সাহিত্যের প্রকরণের বৈচিত্র্য খোঁজার চেষ্টা করেছি। গদ্য সাহিত্য তাঁর লেখনীতে কতটা স্বচ্ছন্দ গতিতে বাংলা সাহিত্যে কোন্ কোন্ অভিনব মত ও পথের দিশা দিয়েছে আমরা তা এই পর্যায়ে বিশ্লেষণের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তাঁর জীবনের নানা ক্ষেত্রের সঙ্গে সেই সাহিত্যের অন্বয় দেখার চেষ্টা করেছি। গদ্য সাহিত্যে তাঁর শিল্পীসত্তার প্রকৃতি, জগৎ-জীবনের ভাবনা, মাননিক চেতনা, জীবনদর্শন এবং জাতীয়তাবোধকে পর্যালোচনার চেষ্টা করেছি। সর্বোপরি আমরা এই পর্যায় তিনটিতে তাঁর গদ্যসাহিত্যের শিল্পরূপের ভিন্নতার প্রকৃতি যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করেছি।

ক) গদ্য সাহিত্যের প্রথম পর্যায় : উপন্যাস

উপন্যাস সৃজনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে উঠেছেন। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা সীমিত - পাঁচটি। তাঁর প্রথম উপন্যাস হল 'হাংরাস'। ১৯৭৩ সালে সত্যজিৎ রায়কে উৎসর্গ করে কলকাতা বিশ্ববাণী প্রকাশনী থেকে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। এর তিন বছর পর ১৯৭৬ সালে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'কে কোথায় যায়' প্রকাশিত হয়। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়েছিল এই উপন্যাসটি। কলকাতার নবপত্র প্রকাশন থেকে এই উপন্যাসের প্রকাশ হয়েছিল। সংখ্যার দিক থেকে তাঁর তৃতীয় উপন্যাস --'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ'। ১৯৮৩ সালে সুকুমার সেনগুপ্ত ও শেফালী সেনগুপ্তকে উৎসর্গ করে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। তাঁর চতুর্থ উপন্যাস 'কাঁচা-পাকা' ১৯৮৯ সালে আনন্দ পাবলিশার্স

থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর শেষ উপন্যাস 'কমরেড, কথা কও' পরের বছর ১৯৯০ সালে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস পাঁচটির মধ্যে আমরা একজন মহৎ সাহিত্যিকের সাহিত্য সৃষ্টির নিদর্শন পাই।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস হাংরাস (১৯৭৩)। উপন্যাসটির রচনার প্রেরণা ও নামকরণ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন। একটা উপন্যাস লিখব। বিশ-বাইশ বছর ধরে এটা একটা ইচ্ছা হয়েছিল মনের মাঝারে। কেমন করে লিখতে হয় না জানায় লেখবার সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। সত্তর সালের পর অবস্থা বৈগুণ্য ধাক্কা দিয়ে আমাকে জলে ফেলেদিল। ভেসে থাকার জন্যে আমাকে হাত- পা ছুড়তেই হল।কিন্তু তাতে উপন্যাস হল কিনা জানি না। হাংরাস নামটা অনেকের কাছেই একটু খটমটে লেগেছে। লবণ আইন ভঙ্গের সময় মেদিনীপুরের সে গ্রামবাসীরা কারাকরণ করেছিল, পরে তাদের কাছ থেকেই ধার করে নিয়েছি। এই উপন্যাসটি লেখার কুড়ি-বাইশ বছর আগে থেকে কবিতা দিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন। যাত্রা শুরু তাঁর পদাতিক দিয়ে (১৯৪০)।

ফলে তাঁর উপন্যাসের শৈল্পিক ধমিতা নিয়ে একটা সংশয় মনে রয়েই গেল। একসময় একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন আমার উপন্যাস কতটা উপন্যাস হয়ে উঠেছে, সে বিষয়েও আমার যথেষ্ট সহেন্দ রয়েছে। তিনি নিজেকে হাড়েহাড়ে একজন সাংবাদিক হিসেবে চেনেন। উপন্যাস লেখার সামার্থ সর্ম্পকে তার নিছক ধারণা হাংরাসের কথকের উক্তিতে ধরা পরে। তিনি বলেন - আমার অনেক দিনের শখ একটা উপন্যাস লেখার। কিন্তু আমি মনে মনে জানি, আমাকে দিয়ে হবে না। আসলে আমি হচ্ছি হাড়ে হাড়ে সাংবাদিক। এর ওর কাছ থেকে ঘটনা, থাকে আমরা সাংবাদিকের ভাষায় বলি স্টোরি বা গল্প, জেনে নিয়ে সে সাজিয়ে গুছিয়ে আমি লিখতে পারি। কিন্তু গল্প মাথা খাটিয়ে বানানোর কথা আমি ভাবতেই পারি না। আমার মুশকিল, কিউ কাঁচামাল না যোগালে আমি কিছু তৈরী করতে পারি না। কথক আরো বলে ক্রমে আমি রিপোর্টাজ লিখতে পারছি দেখে বন্দুদের কেউ কেউ বলল, এবার তুমি উপন্যাসে হাত দাও। এখন ভারি এবার তুমি উপন্যাসে হাত দাও।

এখন ভারি এমনও হতে পারে যে, সত্যি গল্পগুলোকে ওরা মেন করেছিল আসলে আমি বানিয়ে বানিয়ে লিখছি। তাই তার পেছনে শুধু যে উৎসাহ দেওয়ার ভাবছিল তাই নয়, বোধহয় খানিক খোঁচাও ছিল। কথকের বন্দুরা উপন্যাসিদের সম্পর্কে কতগুলো যুক্তি দেখিয়ে এই উপন্যাসে কথক কে উপন্যাস রচনায় নিরুৎসাহিত করে। সেই যুক্তিগুলি হল প্রথম, তুমি তো লিখ না - তুমি দেখে দেখে টুকলিফাই কর। এই টুকলিফাই কথাটা আমার খুব আঁতে বিঁধত কিন্তু অস্বীকার করতে পারিনি। শুধু তখন নয়া এখনও। দ্বিতীয়ত, তুমি মেয়েমানুষ কী জানলে না। প্রেম করনি। খারাপ পাড়ায় যাওনি।

তার মানে,মানুষ জাতের অর্ধেক যে স্ত্রীলোক এবং মনুষ্য জীবনের অর্ধেক যে দেহমনের মিলন তার তুমি খবর রাখনা। মানুষের তুমি যেটা জাগ, সেটা অর্ধসত্য। কিন্তু উপন্যাসে চাই গোটা সত্য কেননা অর্ধ সত্য জিনিসটা আসলে মিথ্যেয়ই কারসাজি। বেশ আর তৃতীয়ত , ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, পার্টি, গণসংগঠন ইত্যাদি তোমাদের যা যা আছে, সব জায়গাতেই লোকে দেখায় তাদের একটা দিক। তাদের ভালর দিক। দেখায় শুধু সেইদিক যেদিকটা দেখালে তাদের ভাল হয়। আর চতুর্থত, তোমার ঐ বাংলার লেটার। তুমি সুন্দর সুন্দর কথ বসাতে পার। কিন্তু ডানাকাটা পারি দিয়ে উপন্যাসের হেঁশেল ঠেলী, ছেলেমেয়েদের গুমুত পরিষ্কার করা, বদ্‌লোকদের গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগানো এসব করা যায় না। পঞ্চমত,--- কিন্তু না, ও পর্যন্ত আর পৌছুতে হয়নি। তার আগেই আমার উপন্যাস লেখার বাসনাটা পঞ্চত্ব পেয়েছিল। কথক অরবিন্দর উপন্যাস সম্পর্কে মতামত মূলত লেখক সুভাষেরই উপন্যাসের মতামতের নামান্তর।

অরবিন্দ মেয়েমানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে বেশী মেলামেশা করতেন না। কেননা তিনি ছিলেন পার্টির হোলটাইমার। আর সেকালে রাজনীতিতে নারীরা আজকালের মতো ব্যাপক অংশ গ্রহণ করতেন না। পার্টিগণ সংগঠন, কৃষক সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি তাদের নিজেদের লোকেদের ভালর দিক দেখালে যে উপন্যাসের গোটা সত্য বিস্মিত হয় সে বিষয়ে ঔপন্যাসিক সুভাষ সচেতন ছিলেন। যেহেতু সচেতন শিল্পী তাই উপন্যাসের শিল্পীর নিরপেক্ষতা অটুট রাখার চেষ্টাও করেন। ডানাকাটা পরি দিয়ে যে উপন্যাস ও সমাজের কাজ হয় না তার কথাও লেখক অরবিন্দর মুখে বলেন। এই উন্যাসের সৃষ্টি আনন্দ সর্ম্পকে কথকের ভাবনা লেখকেরই ভাবনার। হাঙ্গার স্ট্রাইকের বন্দী বরুণবাবু বলেন --- সমাজের ব্যাপারে মার্ক্সবাদ ঠিক আছে, সাহিত্যে অচল। সাহিত্য হল সাহিত্য তার আবার উদ্দেশ্য কী? এর জবারে কথক অরবিন্দ বলেন যাকে সৃষ্টি বলি সেও তো একটা কাজ। বা নেই তাকে হওয়ানো। এই তো? কিন্তু কেন? না, আমরা কাজ করে অভাব মেটাই। অভাব মেটানোটা উদ্দেশ্য। পেটের খিদেমেটে কাজে মেনের খিদে মেটে সৃষ্টিতে। ---- উদ্দেশ্য বলতেই উনি সে একটা ঘাড়ে জোয়াল দেওয়ার ভাব মনে আনেন সেটা ঠিক নয়। কিন্তু একটা কিছু তো গড়ে উঠবে? বরুণ বাবুর প্রেরণা কথাটার আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু নিরুদ্দেশ প্রেরণা তো হয় না। --- উদ্দেশ্যটা হল সংকল্প। সম্ভাবনা। তাকে ফুটিয়ে তোলার উপযুক্ত আয়োজন চাই। শুধু বীজ নয়, তার জমি চাই। ছাড়া ছাড়া ভাব হলে চলবে না। আগাগোড়া টেনে নিয়ে যেতে হবে। নিজেকে জাহির করতে চাইলে উদ্দেশ্যই পন্ড হবে। এ শুধু কলকাঠি নাড়ার ব্যাপার নয়। সৃষ্টির মধ্যে চাই প্রাণ। চাই আনন্দ। এই আনন্দ আসলে অহৈতুকী আনন্দ। ভারতীয় কাব্য তত্ত্বে যাকে বলে ব্রহ্মাঃস্বাদ সহোদর।

এই সৃষ্টির আনন্দ সৃষ্টিতে লেখক সুভাষ লেখেন হাংরাস। তাঁর এই উপন্যাস লেখার প্রেক্ষিত তৈরী হয়ত বাংলার মানুষ ও তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি ছিলেন পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী আবার সংবাদ পত্রের সাংবাদিক। সাংবাদিকতার সূত্রে তাঁকে বাংলার মাঠে ঘাটে কলকারখানায় শ্রমিকদের বস্তিতে ঘুরে ঘুরে কাজ করতে হত। দারিদ্র্য, শোষিত বঞ্চিত মানুষের সামাজিক বৈচিত্র্য তার রিপোর্টাজগুলির সুতিকাগার। এমন অনেক রিপোর্টাজ আছে যেগুলিতে গল্প ও উপন্যাসের বীজ নিহিত রয়েছে। 'দীপংকরের দেশে', 'কলের কলকাতা,' 'চাটগাঁয়ের কবিওয়ালা,' 'বাবর আলির চোখের মতো,' 'একটি অমানুষিক কাহিনী,' 'মরা জালে কুল', 'নাম রেখেছি নবজীবনপুর' প্রভৃতি রিপোর্টাজগুলির কাহিনী তাঁর একাধিক উপন্যাসের সৃষ্টি বীজ। রিপোর্টাজগুলির পাশাপাশি ফুলফুটুক ও অন্যান্য কাব্যের একাধিক কবিতার ফ্রেমে যে গল্প ও কাহিনী নিয়ে নিখুঁত তুলির টানে সুন্দর ছবি এঁকেছেন, তার মধ্যে লেখক সুভাষের উপন্যাস রচনার প্রস্তুতি ঘরের ভেতরকার কথা।

কোন শনিবারের ডায়েরী লিখতে বসে অরবিন্দ বলে হাংরাস। কথাটা প্রথম শুনেছিলাম সরডিহায়। এক পাকাচুল চাষীর মুখে। বিশ সালের আন্দেলনে ও এলাকায় তিনি ছিলেন মাহাতোদের নেতা। বিরাট দলবল নিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। জেলে তখন চলছিল হাংরাস হাংরাস হ্যাঁ, হাংরাস। পাশে ছিলেন সুরজিৎ বাবু। আমাকে টিপে দিয়ে কানের কাছে ফিসফিস করে বলেছিলেন, মানে হাঙ্গার স্ট্রাইক। হাংরাস শব্দটা সেই থেকে আমার মনে গেঁথে আছে । এই মনে গাঁথাটা বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতায় লেখক সুভাষের জীবনের অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত।

গতানুগতিক উপন্যাসের বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ও অধ্যায় বিন্যাস রীতি ঔপন্যাসিক সুভাষ এখানে গ্রহণ করেন নি। তিনি সন তারিখহীন শুক্রবার, শনিবার, রবিবার এভাবে বিভিন্ন বারের নাম দিয়ে জ্ঞাআমার কথা এবং বাদশার কথা শীর্ষনাম দিয়ে ডায়েরী লেখার রীতিতে এই উপন্যাসটি লিখেছেন। হাঙ্গার স্ট্রাইক বা ভূখহরতালের দিনগুলির ডায়েরী, কথক অরবিন্দ বলাই, বংশী কনক প্রমুখ অনৌসৈনিক অনশনের দিনগুলিতে জেলের ভেতরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে। তাদের লড়াইয়ের সমান্তরালভাবে লেখক সাজিয়েছেন বাদশার কথা অংশটি বাদশার কথায় জীবনের নানা কথা ও গল্প জেলখানায় বসে অরবিন্দ শোনে। বাদশা তাকে বলে- যখন বললেন আমার জীবনের গল্প শুনবেন আমার তখন একদিকে লজ্জা হচ্ছিল, অন্যদিকে লোভ হচ্ছিল। আমি একজন লোহা কাটা মজুর, আমার আর কী এমন কথা থাকতে পারে যে লোক ডেকে বলা যায়। ---- আমার লোভ হলো, বলতে গিয়ে পুরনো দিনগুলো আবার ফিরে পাওয়া যাবে

এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কথক অরবিন্দ ও শ্রমিক শ্রেণীর নেতা বাদশা। এই চরিত্র দুটি তাদের আত্মকথনে বিভিন্ন প্রসঙ্গে সমসাময়িক বাস্তব সত্য উত্থাপন করেছেন। এদের আত্মকথায় উঠে এসেছে পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ শাসকের অপশাসন অত্যাচার, নিপীড়ন। উঠে এসেছে রবীন্দ্র নাথ সম্পর্কে তৎকালীন রাজনৈতিক ও বুদ্ধিশীল মানুষের গ্রহণযোগ্যতা, জেলখানার ভেতরে ও বাইরে সমাজতন্ত্র মতবাদে বিশ্বাসী কমিউনিস্ট মতাদর্শে উদ্দীপ্ত শ্রেণী সংগ্রাম এসেছে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ছবি। এই উপন্যাসে এসেছে লেখকের জীবনে রাজনৈতিক পটভূমি বদলের আভাস ও তার প্রতিক্রিয়া। এসেছে বাস্তব সত্য ও জগৎ সত্যের সঙ্গে সংগ্রামীদের নীতিগত আত্মবিরোধের জীবন্ত অভিজ্ঞতা। এসেছে শৈশবচেতনা ও পস্তুতি চেতনা। এসেছে জাহাজ যাত্রার অভিজ্ঞতা, কারখানার শ্রমিকদের বাস্তব জীবনসত্য। এসেছে বাংলার হতদরিদ্র মানুষের প্রতি লেখকের সহমর্মিতা ও দারিদ্র্য সম্পর্কে লেখকের সুচিন্তিত অভিমত বিভিন্ন উপমা ও আটপৌরে মুখের ভাষায় স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে এই উপন্যাসে এসেছে আবদুলের পকেটমার হওয়ার গল্প।

উপন্যাসের কথক অরবিন্দ আত্মপরিচয়ে বলে- আমার পিতা শিবকালী দেবশর্মা পিতামহ --- গুরুদাস দেবশর্মন। কথক আত্ম বিশ্লেষণে বলে - যে অন্যদের জানে সে চতুর, যে নিজেকে জানে সে চক্ষুষ্মান। যে অন্যদের পরাস্ত করে, তার জোর আছে। যে নিজেকে জয় করে, সে শক্তিমান। কথক নিজেকে জানার জন্য আমার কথা শীর্ষক অধ্যায় গুলিতে সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে স্বখাদ সলিলে এগিয়ে চলে। সেই পথ চলায় আমরা পরিচয় পাই লেখক উপন্যাসের বাস্তবতা, তাঁর জীবনদর্শন, সংলাপ - ভাষা ও চরিত্র সৃজনের বিচক্ষণ অর্ন্তদৃষ্টি।

উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায় বিপ্লবের এক ভয়ঙ্কর পরিণতি। বিপ্লব অর্থে হাঙ্গার স্ট্রাইক। এর জন্য কথক আছে আট নম্বর সেলে। সংগ্রাম করতে করতে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাদের লাশগুলো মর্গে নিয়ে যাবার আগে শেষবারের মত কথক ও তার বন্ধুদের দেখাতে আনা হয়েছিল। কথক বলে -- খাটিয়াগুলো একে একে নামাল। তারপর তুলে নিয়ে গেল। গলা অবধি চাদরে ঢাকা। কনকের মুখটা শিউলি ফুলের বোঁটার মতো হলুদ। বাতাসে টিয়ার গ্যাসের ভগ্নাবশেষ ছিল বলেই বোধহয় আমাদের চোখে জল এসে গিয়েছিল। তবু ভুলো মাৎ স্লোগানে সারা জেলখানা আমরা কাঁপিয়ে তুললাম। তারপর আমরা যে যার সেলে ফিরে গিয়েছিলাম। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিল শরীর। কাল সারাদিন ন্যাতার মতো ঘুমিয়েছি। উপন্যাসের গোড়াতেই জেলের পরিবেশের পরিচয় রয়েছে। অরবিন্দর কথায় -- পুরো ঘটনা এখনও আমরা জানিনা। ওয়ার্ডগুলো একটা থেকে আরেকটা সম্পূর্ণ আলাদা। তার ওপর

আমাদেরটা একেবারে একপাশে। ওয়ার্ডগুলোর পাশ দিয়ে গেছে টানা রাস্তা। তার একটা দিকে ইউ-টি ওয়ার্ডে ঢোকার গেট, আর পশ্চিম গেটটা পেরোলে পামেলা এভিনিউ, আর একটা দিকে জেল আপিস, অন্যদিকে ঘড়িঘর। পরদিনের ঘটনার ঝটিকাকেন্দ্র ছিল এই পশ্চিম ফটক। -- কাল থেকে অনশন শুরু হবে, এটা আগে থেকে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু অন্য জেলে গুলি চলেছে, এ খবরটা পরশুর আগের দিনই লোকমুখে আমাদের কানে এসেছিল। এ-জেলের কর্তৃপক্ষ কাগজ বন্ধ করে খবরটা চাপতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পারেনি। পরশু সকালে মিটিং করে কর্তৃপক্ষকে আমরা জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, সন্ধেবেলা আমরা লক-আপ করতে দেব না। লক-আপ হতে না চাওয়া জেল কানুনে সাংঘাতিক অপরাধ। আমরা জানতাম, ওরা জোর খাটাবে ওরাও জানত, আমরা বাধা দেব। দুপুরের পর থেকেই আমাদের এ তল্লাট থেকে সেপাইরা সব হাওয়া। রান্নাবান্না সমেত বিকেলে ফালতুদেরও বিদায় করে দেওয়া হল। বোঝা যাচ্ছিল, গোলমাল বেশ ভালরকম ভাবেই লাগবে। জেলের এই সংগ্রামের মধ্যে কথকের যে চরিত্রটির জন্য খুব কষ্ট হয় তিনি তার দাদু। কথক বলে ভয়ে মুখ শুকিয়ে খোঁড়া পায়ে দাদু আমার দেখা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন। সশস্ত্র পুলিশ জেলখানাটাকে ঘিরে রয়েছে -- দাদু নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছিলেন। দাদুর কথা ভেবে আমার ভয় হচ্ছিল্ল। অরবিন্দদের মধ্যে সবথেকে কনিষ্ঠ সংগ্রামী কনক। সে কলেজে পড়ে। ধরা পড়ে সে এই জেলে এসেছে মাস দুয়েক আগে। তার মিষ্টি মায়াবী মুখ। হালি শহরের এই কনকের কথায় কথকের নিজের শৈশবের স্মৃতি মনে পড়ে ঐ বয়সে আমিও ওর মত ভিতু ছিলাম। আকাশে কড়কড় করে মেঘ ডাকলে ভয় পেতাম। অন্ধকারে ছিল পোকামাকড়ের ভয়। আস্তে আস্তে বুঝেছি, ভয়ের কথা যত ভাবা যায় ভয় তত পেয়ে বসে। আসলে ঝড়জলে ঘরের বাইরে থাকলেই যে মাথায় বাজ ভেঙে পড়বে কিংবা অন্ধকারে পা বাড়ালেই সাপে ছোবল দেবে তার কোন মানে নেই। ভয়কে আমি অনেকটা গা-সওয়া করেছি। ভয় পেয়ে পেয়ে। সংগ্রামের মধ্যে চলতে চলতেই নিজেকে জানার ও চেনার চেষ্টা করে কথক। লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে তারা বোতল গ্লাস ও ইটপাথর সিঁড়ির মুখে মজুত করে। এবং মনে মনে বলে, ভয়ের মত সাহস জিনিসটাও যে ছোঁয়াচে, ছুটে ছুটে লোহার খাট টানতে টানতে বার বার কথাটা মনে হচ্ছিল। নাকি ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে পড়তে পেরেছিলাম এবং ঠিক সেই সময় সাক্ষাৎ ভয়ের কিছু ছিল না বলেই নিজেকে আমার সাহসী বলে মনে হয়েছিল? নিজেকে নিয়ে নিজের সঙ্গে তর্ক করা, এটা আমার হালে শুরু হয়েছে। সেসময় জেলে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে কথকের অন্তর্জীবনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। সে বলে আগে থেকেই মনে মনে এঁচে রেখেছিলাম যে, আমাকে যদি বলতে বলে তাহলে রবি ঠাকুরকে আচ্ছা করে তুড়ুং ঠুকে দেব। রবি ঠাকুর বুর্জোয়া। আর বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। বলব বলে বাছা

বাছা কিছু শব্দ আমি সাজিয়ে রেখেছিলাম । ধুনোর গন্ধে মনসা নাচে বলেই জানতাম। দেখলাম ধুনোর গন্ধে মাথায় ভূতও চাপে। একেবারে গোড়াতেই যে আমার ডাক পড়বে আমি জানতাম না। দাঁড়িয়ে উঠতেই আমার মগজের সাজানো কথাগুলো সব উল্টে গেল। --- তারপর কুরক্ষেত্র শুরু হয়ে গেল। --- তবু সেদিন আমার একটুও ভয় করেনি। তার কিছুদিনের মধ্যেই রবি ঠাকুর সম্পর্কে বাইরে থেকে আমাদের পার্টি লাইন এসে গেল। পড়ে সেদিন আমার কী যে আত্মগ্লানি হল বলার নয়।সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। আমার ভয় এ নয় যে, কমরেডরা এবার আমাকে এক হাত নেবে। ভয় আমার নিজেকে নিয়ে। আমি মার্ক্সবাদ এখনও আয়ত্ত করতে পারিনি বলে। আমি এখনও পেটি বুর্জোয়া থেকে গিয়েছি বলে। তাঁর এই চারিত্রিক দ্বন্দ্ব এসেছে জীবনের পোড়া থেকে আমি বুঝতে পারছি আমার সমস্ত ভুলের গোড়ায় আমার জন্ম।আর আমার সমস্ত দুর্বলতার মূলে আমার দাদু।

জেলের লড়াইয়ের সেনাপতি ছিল বলাই। তাকে বলা হত অনোসেনাপতি। আর যারা সৈনিক তাদের বলা হয় অনোসৈনিক। অনোসৈনিকদের মধ্যে সাতনম্বরে ছিল নিতাই সর্দার , বড় শৈল, ছোট শৈল, তার নম্বর জেলে শ্রমিক আন্দোলনের কাঞ্চন, বংশী, ছাত্র আন্দোলনের কর্ণক, অরবিন্দ, শ্রমিক নেতা শিবপুরের বাদশা, গৌরহরি, শঙ্কর, কালীপদ, আবদুল, বরুণবাবু মুরারীবাবু প্রমুখ। এঁদের আন্দোলনের প্রকৃতি লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত আন্দোলন লেখকের বর্ণনায় ছবির মতো অঙ্কনরূপ পেয়েছে। লেখকের ভাষায় আন্দোলনকারীদের সংগ্রামের অভিনব কৌশলের সুন্দর বর্ণনা আমরা এই উপন্যাসে পাই। সংগ্রামের বর্ণনা পাই। ঔপন্যাসিক সংগ্রাম জীবনের খুঁটিয়ে দেখা ছোট ছোট বিষয়কে উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সংগ্রামীদের সংগ্রামের তত্ত্বের সঙ্গে তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। কথককে বাদশা বলেন, কিন্তু সে আপনি যাই বলুন, এই না খেয়ে থাকা এ আবার কী? আপনারা পারেন। আপনাদের পেটের খোল ছোট। কষ্ট আমাদের। মাঝে মাঝে মনে হয়, ধ্যুৎ! কী দরকার এসব করার। তার চেয়ে সব ভেঙে ভেস্তে বাড়ির ছেলে বাড়ি ফিরে যাই। --- চলুক। দেখা যাক কোথায় এর শেষ। আমি বলি, পড়েছি পার্টির হাতে খানা খেতে হবে সাথে। এখন তো পেটে কিল মেরে বসে থাকি, খাবার হলে সবাই একসঙ্গে খাব। এই উক্তির মধ্যে সংগ্রামী শ্রমিক নেতা বাদশার হাংগার স্ট্রাইকে পার্টির কর্মসূচীর সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরিপাক একটি শারীরিক প্রক্রিয়া। এ সত্য বিজ্ঞানের সত্য। একে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কোন তত্ত্ব বা রাজনীতি তার উর্দ্ধে নয়। কথকের একসময় মনে হয়েছে দুনিয়ায় পেটই তো সব।হাংগার স্ট্রাইক চালানোর সময় কথক অরবিন্দর মনে হয় আমি ওদের সঙ্গে লড়িনি, লড়েছিলাম নিজের সঙ্গে একেবারে দাঁতে দাঁত

দিয়ে। মনের জোরে পেরেছিলাম। হেরে গেলাম গায়ের জোরে। বিছানায় ঠেসে ধরে নাকের ভেতর দিয়ে যখন নল চালিয়ে দিল, তখন আর করবার কিছু থাকল না। শুনেছি নাক দিয়ে ওরা যেটা খাওয়ায় তাতে দুধের সঙ্গে নাকি ডিম থাকে। আর তাতে নাকি ব্ল্যান্ডিও থাকে। চোখ বন্ধ করে ছিলাম। একটা ফিডিং কাপে করে ফানেলে দুধ ঢালবার শব্দ। তখনও মন একেবারে ফাঁকা। ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে ক্লান্ত। হঠাৎ পেটের মধ্যে একটা অনির্বচনীয় ব্যাপার ঘটছে বলে মনে হল। একটা নির্জন খাঁ খাঁ করা জায়গা হঠাৎ যেন জনকণ্ঠে প্রাণের সাড়া পেয়ে সরগরম হয়ে উঠছে। আর জিভ বঞ্চিত হলেও সারা শরীর তারিয়ে তারিয়ে তাই আস্বাদন করছে। ফোর্সফিডিং করালে অনশনকারীদের পেটের ভেতরে যে ক্রিয়া করে তা লেখকের কথায় অনির্বচনীয়। অনাহার ক্লিষ্ট শরীরে এই ফোর্স ফিডিং প্রাণের সাড়া জাগায়। এখানে রাজনৈতিক যে কোন তত্ত্বের উর্দ্ধে জীবন ও জগৎ সত্য বাস্তবরূপ পেয়েছে। এতে শরীর তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদন করে। জীবন ও জগতের বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা ঔপন্যাসিকদের লেখনীতে শিল্পরূপ পেয়েছে। এতে সংগ্রামের সঙ্গে শরীরের যান্ত্রিক ক্রিয়ার বিরোধ তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। সংগ্রামের তত্ত্বের সঙ্গে সংগ্রামীর অন্তর্দ্বন্দ্ব এখানে মাধুর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এখানে ব্যক্তির সঙ্গে তার অন্তর্সত্তার দ্বন্দ্ব। ব্যক্তির জীবনের মতাদর্শের মিল থেকে লড়াইএ অংশ গ্রহণ। পার্টির নির্দেশ ও মতাদর্শের সঙ্গে অভিন্ন বলেই কথক জেলে হাঙ্গার স্ট্রাইক করছে। এই লড়াই-এর ভেতরে ভেতরে নিজের সঙ্গে নিজেই সংগ্রামী আরও ভিন্ন এক লড়াই করে থাকেন। সেই স্বতন্ত্র লড়াই - এর স্বরূপ নির্ণয়ে লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় শিল্পীর নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন। তিনি কথকের একটি উক্তিতে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ স্পষ্ট করে তোলেন। কথক মনে মনে ভাবে --- - তার চেয়েও ঢের বিশ্রী একটা চিন্তার মধ্যে যেন পা পিছলে পড়ে গেলাম -- এই ভাবে জেলে পচে মরার কী মানে হয়? আমি যদি হাঙ্গার স্ট্রাইক ভেঙে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাই, তাহলেই যে লড়াই ভেস্তে যাবে তা তো নয়। বলাইদা আছে, বাদশা আছে ওরা ঠিক শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে নিয়ে যাবে। বাইরে গিয়ে পার্টিকে বলব আমি আন্ডার গ্রাউন্ডে যেতে চাই। যদি বলে ব্যারিকেড করে লড়াই করো, তাও করব। আমি শুধু চাই এই দম আটকানো জেলখানা থেকে বেরোতে, না খেয়ে তিলে তিলে মরবার হাত থেকে বাঁচতে। নিজে বাঁচার অর্থ পার্টির শৃঙ্খলা নষ্ট করা নয়। কথক নিজেকে বাঁচিয়ে পার্টির হয়ে লড়াই করতে প্রস্তুত। শুধু হাঙ্গার স্ট্রাইকের পথ ও মত কে বদলাবার বিরোধ নিজের অন্তর্মানসে উপলব্ধি করছেন কথক। সেই অনশন সংগ্রামের শরিক হয়েও তার মনে হয় এবার বেরিয়েই কী কী খাব। রয়ালের চাপ। আমজাদিয়ার মোরগমসল্লা। মোল্লারচকের দই। বাগবাজারের, উচ্ছ রসগোল্লা নয় -- তেলে ভাজী। বড়বাজারের হিং

দেওয়া কচুরি। নারকোলের দুধে রান্না ভাত। নারকোলের মালার ভেতর পুরে, ওপরে মাটি দিয়ে বন্ধ করে উনুনের তলায় রেখে দিয়ে গুমসো আঁচে ঝল্‌সানো চিংড়ি। জেলের ভেতরে হাঙ্গার স্ট্রাইক চালিয়ে যাওয়ার সময় খাবার প্রসঙ্গে মনে পড়ে পাইকপাড়ার কাকিমাকে। মনে পড়ে পাইকপাড়ার সেই কাকিমা, আমি জেলে আসার আগে অনেকবার খবর পাঠিয়েছিলেন যে, এক রবিবারে গিয়ে তাঁর হাতের রান্না যেন খেয়ে আসি। রান্না বলতে চিংড়িমাছের ঝোল। পাইক পাড়ার কাকিমা যে যুব ভাল রাঁধিয়ে তা নয়। কিন্তু ঐ ঝোল রান্নায় তাঁর জুড়ি নেই। জেলের ভেতর এই স্মৃতি রোমন্থনে সংগ্রামী সত্তার সঙ্গে তাঁর অর্ধচেতন মনের ও নির্জ্ঞান মনের একটা পার্থক্য রয়েছে। সংগ্রামের নীতি অনশন কিন্তু মনের গোপন রহস্য উন্মোচন করেছেন লেখক। এখানে তাঁর শিল্পী সত্তার ও ঔপন্যাসিকের নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন।

এই উপন্যাসে সুভাষ মুখোপাধ্যায় হাঙ্গার স্ট্রাইকের সংগ্রামীদের লড়াইয়ের ছবি বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষকের ন্যায় নিপুণ হাতে অঙ্কন করেছেন। হাঙ্গার স্ট্রাইকের প্রকৃতি ঔপন্যাসিক যেভাবে শিল্পরূপ দিয়েছেন তা হল - প্রথমত: হাঙ্গার স্ট্রাইকের সময়কে যেন ভুলেও কোনরকম খাবার দাবারের কথা না বলে। খাবারের কথা মনে হলে তক্ষুণি অন্য কথা ভাবতে হবে। দ্বিতীয়ত: অনশন হল লড়াই তবে খোলা ময়দান আর বন্ধ জেলখানা, এ দুটো এক নয় লড়াইয়ের অস্ত্র তো বটেই, লড়াইয়ের ধরণও আলাদা। তৃতীয়ত: হাঙ্গার স্ট্রাইকের সময় খুব ধীরে সুস্থে ওঠা হাঁটা করা দরকার। নইলে বুক ধড়ফড় করে। চতুর্থত: অনশনের সময় হালকা বই পড়া উচিত। তাস চলবে। দাবা নয়। সংগ্রামীদের বলাইদার মুখে তাদের প্রতি নির্দেশগুলি অধিকাংশ বলানো হয়েছে। বলাইয়ের মুখে এগুলি সুন্দরভাবে মানিয়েছে। এই নির্দেশগুলির মধ্যে আছে লেখকের বৈজ্ঞানিক যুক্তি নিষ্ঠার অভিজ্ঞতার পরিচয়।

এই উপন্যাসে আমরা লেখকের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ব্যক্তি জীবনের সঞ্চয়কে শিল্প রূপে পাই। এটি কারা উপন্যাস নয়। তথাপি এ উপন্যাস পরাধীন ভারতবাসীর সংগ্রাম, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম ও বুর্জোয়া সমাজের প্রতিপত্তির প্রতি আঘাত আনার সংগ্রাম। এই লড়াই উপন্যাসের শুরুতেই দেখতে পাওয়া যায় লেখক উপন্যাসের শুরুতেই লড়াইয়ের বর্ণনা দিয়ে লিখছেন - সকাল থেকে অনশন শুরু হবে, এটা আগে থেকে ঠিক হয়ে ছিল। কিন্তু অন্য জেলে গুলি চলেছে এখবরটা পরশুর আগের দিনই লোকমুখে আমাদের কানে এসেছিল। এ জেলের কর্তৃপক্ষ কাগজ বন্ধ করে খবরটা চাপতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পারেনি। পরও সালে মিটিং করে কর্তৃপক্ষকে আমরা জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, সন্ধেবেলা আমরা লক আপ করতে দেব না। লক আপ হতে না চাওয়া জেল কানুনে সংঘাতিক

অপরাধ আমরা জানতাম, ওরা জোর খাটাবে। ওরাও জানত আমরা বাধা দেব বিপ্লবীদের বাধাদান বিষয়টির মধ্যে সে সময় সাহস ও শক্তির

পরিচায়ক একটা রাতের লড়াইয়ের বর্ণনায় উপন্যাসিক লিখেছেন -- পরশু আমাদের লড়াইটা ছিল শুধু রাতটুকুর জন্যে। একটা রাত্তির যদি কোন রকমে লক আপ এড়ানো যায়, তাহলে সরকারের বোঁতা মুখ আমরা ভোঁতা করে দিতে পারব। বিপ্লবী জেলের ওর্য়াডে, ওয়ার্ডে লড়াই করছে। এই বিপ্লবের জন্য এক রাতে তারা জেলের লোহার খাটগুলি টেনে টেনে নিয়ে ব্যারিকেড তৈরী করে। এ সময় রাস্তায় কারা যেন খ্যাপা কুকুরের মত একবার এদিক একবার ওদিক করছেন আমাদের মা বাপ তুলে বিশ্রী রকমের সব মুখ খারাপ করেছে। ওরা কি ভাবছে ওদের গালাগাল শুনে রেগে খালি হাতে বেরিয়ে গিয়ে আমরা ওদের বন্দুকের সামনে বুক পেতে দেব একবার করে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের দরজায় ওরা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঘা মেরে বাজিয়ে দেখে গেল আমাদের ব্যারিকেডগুলো কতটা মজবুত। বিপ্লবীরা সরকারের সঙ্গে লড়াই ও প্রতিরোধ করার জন্য কয়েকটি দল করে নেয়। ঠিক হয় পেছন থেকে একদল হাতিয়ার যোগাবে আর একদল সামনে ওগুলো ছুঁড়বে। এভাবে একদল হাঁপিয়ে পড়লে বা জখম হলে আর একদল তাদের জায়গায় আসবে। যারা জখম হবে তাদের জায়গায় আসবে। যারা জখম হবে তাদের সেবা শুশ্রূষায় জন্য থাকবে বিশেষ টিম। সে দলের মধ্যে থাকবে দুটো টর্চ, দু-বান্ডিল তুলো, ছেঁড়া ধুতি এবং টিংচার আইডিনের শিশি। এরপর কিছুক্ষণের মধ্যেই দূর থেকে দমাদম ঠাস্-স-স করে দরজা ভাঙার শব্দ ভেসে আসে। এরপর ঝ্নঝ্ন করে দূড়দাড়িয়ে লোহার খাট উল্টে ফেলার শব্দ হয়। এরপর সাত নম্বর থেকে বাজখাঁই গলায় নিতাই সর্দার চেঁচিয়ে বলে -- কমরেড, চার নম্বরের দরজা ভেঙে ফেলেছে, হুঁশিয়ার থাকুন। আর চার নম্বরের কমরেডরা সমানে শ্লোগান দেয়। স্লোগান থেমে যাওয়ার পর ঠুঁ-ই-ঠাঁ-ই-ঠুঁ-ই-ঠাঁ-ই করে ভারী জিনিস পড়ার শব্দ। তারপর আবার স্লোগান তারপর আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। এরপরই পর পর করেকটা বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজ। এদিকে সাত নম্বর থেকে চেঁচিয়ে বলে - ওরা টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছে, কমরেড। ড্রামের জল মেঝেতে ঢেলে দিন। সঙ্গে সঙ্গে যে-কথা সেই কাজ। টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটার জন্য প্রচন্ড ঝাঁঝ বিপ্লবীদের নাকে মুখে চোখে এসে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। এর মোকাবিলার জন্য বিপ্লবীরা আগে থেকেই যে মার রুমাল ভিজিয়ে রেখেছিলেন। এমন সময় ইউটি ওয়ার্ডের ছাদ থেকে হঠাৎ জোরালো টর্চের আলো এসে পড়তেই বাদশা বলে উঠল শুয়ে পড়ুন কমরেড শুয়ে পড়ুন। ভিজে জবজবে হয়ে আছে বারান্দা । তারই ওপর উপুড় হয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। দেখতে দেখতে তিনতলার বারান্দার জলে লেগে কয়েকটা টিয়ার গ্যাসের শেল উঠোনে মুখ থুবড়ে পড়ল। দু এক

রাউন্ড ছোঁড়ার পরই ওরা বুঝেছে, ইউ-টি ওয়ার্ডের ছাদ থেকে টিয়ার গ্যাসের শেল ছুঁড়ে খুব একটা সুবিধে করা যাবে না। জুতোর আওয়াজ শুনে আমরা বুঝলাম ছাদে ওঠার ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে ওরা আস্তে আস্তে নামছে। যেটুকু টিয়ার গ্যাস ওরা ছুঁড়েছে, তার ঠেলাতেই তখন আমরা নাকের জলে চোখের জলে হয়ে আছি। সেই সঙ্গে কান খাড়া করে রয়েছি, এবার ওরা কোথা দিয়ে কোথায় যায় সেটা ওদের পায়ের শব্দে বোঝবার জন্যে। লেফ্‌ট-রাইট লেফ্‌ট রাইট করতে করতে মচ্‌ মচ্‌ শব্দে একটা দল ক্রমশ গেটের দিকে এগোচ্ছে। আস্তে আস্তে সেই শব্দ গেটের কাছে একই রকমের আরেকটা শব্দের সঙ্গে যোগ হল। তারপরে দুটোই ক্ষীণ হতে হতে একই সঙ্গে দূরে মিলিয়ে গেল। আমরা যারা কান খাড়া করে ছিলাম, সবাই প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলাম ওরা চলে গেল। আসলে আমরা সবাই কিন্তু মনে মনে বলতে চাইছিলাম -- ওরা হেরে গেল। এই লড়াইয়ের সময় বিপ্লবীদের লড়াইয়ের অন্য অস্ত্রটি ছিল অনশন। সে সময় আজ আমাদের অনশনের চারদিন। না, চার রাত তিন দিন। হিসেবের দিক দিয়ে এবার সব উল্টে পাল্টে গেছে। সাধারণত গোড়ার বাহাত্তর ঘন্টা খিদেয় ভোঁচকানি লাগে। এবার সব উল্টো। খিদে যেন দিন দিন বাড়ছে। উঠে উঠে বার বার ঢক ঢক করে জল খাচ্ছি। সেই সঙ্গে একটু করে নুন। এভাবে তারা নজের শরীরের সঙ্গে লড়াই করে। ভেতরের খিদেটাকে চাপা দিয়ে লড়াই চালায়। শিল্পে সত্য হয়ে উঠেছে।

এই অনশনের লড়াইয়ে সব বিপ্লবীরাই যে সমানভাবে চালিয়ে যেতে সক্ষম হয় তা নয়, মাঝপথে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে খান্তও দিয়েছে, তখন অন্য বিপ্লবীরা তাকে বিশেষভাবে আঘাত করে আবার উজ্জীবিত করার চেষ্টা করে। লেখকের ভাষায় -- আবার অনশন চলতে চলতে ভাঙবার লোকও থাকে। লক-আপের পর ঘরে ঘরে স্ট্রেচার এলেই বুঝতে হবে হাসপাতেলে যাচ্ছে নির্ঘাত হাঙ্গার-স্ট্রাইক ভাঙতে। আশপাশের জেল থেকে কমরেডরা তাদের দিকে থুথু ছিটোয়, মা বাপ তুলে গাল দেয়। কমরেডদের গলা শুনে শেষ পর্যন্ত মনে জোর এনে স্ট্রেচার ফিরিয়ে দিয়েছে এমনও অনেকে আছে। অনশন ভেঙে দিয়ে পরে আবার মুখ চুন করে ওয়ার্ডে ফিরে এসেছে, পরের যার বীরবিক্রমে শেষ পর্যন্ত অনশন করেছে, এ রকম হয়েছে চাষী মজুর কমরেডদের মধ্যেই বেশী। অনশন সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় আলোয় ঔপন্যাসিক পদাতিক অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন - জেলে বন্দী অনশন কারীদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের তুলনায় শ্রবনেন্দ্রিয় অধিক ক্ষমতাশীল হয়ে ওঠে। তিনি দেখিয়েছেন সে সময় সংগ্রামীরা আওয়াজ শুনে বিরোধী শক্তির গতিবিধি বুঝতে সক্ষম হন। তারা কানে অনেক বেশী শোনেন - দূরের খাঁটিনাটি আওয়াজগুলো পর্যন্ত কানে আসছে। এসময় প্রশাসন নানাভাবে অনশন ভাঙার চেষ্টা চালায়।

জীবনের প্রতি মমতাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য গামোফোনে পরিকল্পিত গান শোনায়। এ সময় সংগ্রামীরা নিজের শরীর ও মনের বিরুদ্ধে লড়াই চালায়। লড়াই চলে নিজের সঙ্গে নিজের। সেই সঙ্গে সহ সংগ্রামী কেউ সেই পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাকে লাথি মেরে নাকে খৎ দিয়ে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেবার লড়াই চালাতে হয়। প্রশাসন থেকে নাকে নল ঢুকিয়ে ফোর্স ফিডিং করাতে এলে বিপ্লবীরা তাতে প্রচন্ড বাধা দেয়। সরকার পক্ষ থেকে জেলকমিটির সঙ্গে বিপ্লবীদের শক্তি খর্ব করে দিতে চেষ্টা করে। খুঁচিয়ে আশা জাগিয়ে, আবার সে আশায় ছাই দিয়ে তাদের মনোবল ভাঙতে কৌশল করে। কিন্তু বিপ্লবীরা আত্মশক্তি বাড়ানোর কৌশল নেয়। লেখক অনশনকারীদের একটা উপমা দিয়ে সংগ্রামীশক্তি ও প্রাণশক্তির জোর সম্পর্কে এক ধরণের প্রাণীর কথা লিখেছেন যে বছরের পর বছর না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তিনি লিখেছেন - মাকড়সার দূর সম্পর্কের আত্মীয় এক রকমের খুব খুদে প্রাণী আছে, তারা বছরের পর বছর না খেয়ে থাকতে পারে। লোকে এদের অনেক সময় বলে জলভল্লুক, এদের আসল নাম টার্ডিগ্রাডা। এদের স্বভাব স্যাঁৎ স্যাঁতে জলো আবহাওযায় থাকে। কিন্তু কোনো কারণে যদি আবহাওয়া বদলে শুকনো খটখটে হয়, তাহলে এরাও একেবারে শুকিয়ে যায়। আস্তে আস্তে এদের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়, তারপর শরীর পাকিয়ে গিয়ে শুঁটকো বীচির মত দশা হয়।

এই অবস্থায় তারা বছরের পর বছর থাকবে। বাইরে থেকে দেখে সবাই ভাবে মরে গেছে। কিন্তু একবার জল পাক, অমনি কয়েক মিনিটের মধ্যে ফুলে ফেঁপে উঠবে। গায়ের মধ্যে কোথাও আর কোঁচকানো ভাব থাকবে না। পাগুলো টান টান হবে। তারপর আস্তে আস্তে ওরা চলতে আরম্ভ করবে। এক ঘন্টার মধ্যেই ওরা হয়ে যাবে আবার যে কে সেই। কাজ কর্ম, হাঁটাহাঁটি সব ঠিক সেই আগের মত। মাকড়সার দূর সম্পর্কের আত্মীয় এই খুদে প্রাণীর কাছ থেকে ঔপন্যাসিক লড়াইয়ের জীবনীশক্তি আহরণ করার কথা লিখেছেন। এই হাঙ্গার স্ট্রাইকের মধ্যে আছে মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামের ভাবনা। এই লড়াইয়ের বর্ণনায় লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের পার্টির কর্মসূচী পালনের নিষ্ঠা, আছে ব্যক্তি জীবনের জেলে থাকার বাস্তব অভিজ্ঞতা। বাস্তব সত্যের সঙ্গে হাঙ্গার স্ট্রাইকের বর্ণনায় লেখক পারস্পর্য ও সাজুয্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি জীবনের মানুষটির সঙ্গে তার শিল্পী সত্তার মেলবন্ধন ঘটেছে বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে।

হাঙ্গার স্ট্রাইকের সহ যোদ্ধা ঔপন্যাসিকের তথা কথকের সঙ্গে জেলে পরিচয় বাদশার। এই সংগ্রামের জেলজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় বাদশার জীবন অঙ্কন। বাদশার জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখার মধ্যে সমান্তরালভাবে আমার কথা শীর্ষক পরিচ্ছেদগুলিতে ঔপন্যাসিক তাঁর রাজনৈতিক জীবনের

রাজনৈতিক কর্মী। সেখানে ব্যক্তি জীবনের উর্দ্ধে, পার্টির উর্দ্ধে শিল্পকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এই প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে লেখকের জবাব -- এ পর্যন্ত বাদশা এমন কিছু বলেনি, যাতে আমার বন্ধুদের প্রতিধ্বনি করে বলা যায় - বাদশা অর্ধসত্যের বেশি কিছু বলেছে মেয়ে মানুষ একদম বাদ। কখনও কখনও মনে হয়েছে জিজ্ঞেস করি। যদি থাকেও ও কেন আমাকে বলতে যাবে? আমি ওর এমন কিছু প্রাণের বন্ধু নই। তার ওপর আগে হলেও কথা ছিল। বাদশা এখন নেতা। যারা নেতা হয় তারা কখনো নিজেদের দোষ দুর্বলতার কথা বলে না। বারে কিংবা শুঁড়ি খানায় যায় না। খারাপ জায়গায় যেতে পারে না। তাতে লোকের চোখে, শুধু নিজেরা নয়, পার্টিকেও ছোট হতে হয়। আমাদের পার্টিতে যারা গল্প কবিতা লেখে, তাদেরও তাই খাড়া গুঁজে লিখে যেতে হয় কেবল বীর বিপ্লবী আর সাধুসচ্চরিত্রদের কথা। যারা প্রতিক্রিয়াশীল, যারা বুর্জোয়া যারা মাতাল, যারা পুলিশে কাজ করে এমনকী যারা অন্য পার্টির লোক তাদের সঙ্গে মেলামেশা শুধু নিন্দনীয় হলে কথা ছিল। সেটা হবে সন্দেহ জনক। ঞ এতে শিল্পীর দায়বদ্ধতা, শিল্পধর্ম ও জীবন দর্শন একটি বন্ধনে রসমূর্তি ধারণ করে।

এই উপন্যাসের দুটি জীবন সমান্তরাল ভাবে বেড়ে উঠেছে। কথক অরবিন্দ ও বাদশার শৈশব থেকে রাজনৈতিক জীবন বেড়ে ওঠার টুকরো টুকরো ছবি নিয়ে হাংরাস। এতে দুটি চরিত্রের সামগ্রিক জীবনের পাশাপাশি নানা ঘটনার শিল্প রূপ দান করার মধ্যে ছোট ছোট আলোড়ন ধর্মী ঘটনা পাঠকের বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। কাহিনীর পরিপূরক উপকাহিনীর ন্যায় ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গের উৎগীরণ দেখা দিয়েছে। এই উপন্যাসের অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বাদশা। অরবিন্দের তেল মাখার অভ্যাস নেই। জেলের গেলে বন্দীরা যাদের গায়ে তেল মাখার অভ্যাস আছে, তারা একে অন্যের নয়তো নিজে নিজে তেল মাখছো অরবিন্দের নিজে নিজে পায়ে তেল ডলতে দেখে বাদশার আর্বিভাব। বাদশার বাড়ি শিবপুরে। সে অরবিন্দকে কোড়ন কেটে বলে নিজের পায়ে ভাল করে তেল দিন, দাদা লক্ষণ ভাল নয়। সে ভারী মজা করে কথা বলে। গোড়ায় গোড়ায় সে খুব লাজুক ছিল। ওর চলায় বলায় আড় ভেঙেছে জেল কমিটিতে যাওয়ার পর। তার এই লাজুক স্বভাবের সঙ্গে লেখকের শৈশবের স্বভাবের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাদশার ঠাকুর্দা এব্রাহিম মন্ডল। রিপুর কাজ করত। ঠাকুর্দাকে সে দেখেনি। তার বা জানের কাছে থেকে ঠাকুদার নানা গল্প শুনেছে। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেলাই করে বেড়াতেন। খুব ভালো কাজ জানতেন না। বোকাসোকা ভালমানুষ ছিলেন। তার সুযোগ নিয়ে লোকে ঠকিয়েছেও প্রচুর। বাদশার পিতার স্মৃতিচারণে শৈশবের দারিদ্র পীড়িত পরিবারের অসহায় ছবি আমরা পাই। এই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন সংগ্রাম লেখকের শিল্পী মনের দরদ দিয়ে চিত্রায়িত হয়েছে। বাদশার বাবা তারে মিঞার উক্তি -- বাবার ছিল

গোলপাতার ঘর। বর্ষার সময় জল পড়ত। ঠেলাগোঁজা করে কোনরকমে চলছিল। একবার ঝড় এসে মাথার চাল উড়িয়ে নিয়ে গেল। তখন আমাদের কী কষ্ট। তখন শীতের সময়। রাত্তিরে আমরা জেগে বসে ঠকঠক করে কাঁপতাম। বাবা আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে বসে থাকত। যাতে বাবার বুকের গরমে আমি একটু আরাম পাই। আরাম হত না ছাই। বাবা বুঝত না, টস্‌টস্‌ করে বাবার চোখ দিয়ে জল গড়াত। আর আমার গা ভিজে গিয়ে আরও বেশি গা সিরসির করত । আমার মা গোবর কুড়িয়ে এনে ঘুঁটে দিত । কখনও যেত রেললাইনে কয়লা কুড়োতে । বাছতে গিয়ে ভেতরের গরম কয়লায় প্রায়ই মার হাতে ছ্যাঁকা লেগে যেত। ফোস্কা পড়ত। পাড়ার লোকে তাই নিয়ে বাবাকে টিটকিরি দিত। এব্রাহিমের বউ এই যে বাইরে বাইরে ধিঙ্গি হয়ে বেড়ায় এটা ভাল নয়। মুসলমান পাড়ার এতে বদনাম হয়। বলত কে? না পাড়ার মোড়ল। আমাদের ঘর ভিটে ছাড়াও পূর্বপুরুষদের দু-টুকরো জমি ছিল। তা দশ বারো কাঠা হবে। বাবা জানত না। ঐ মোড়ল ব্যাটাই এতদিন তা মেরে খাচ্ছিল। বাদশাকে তিনি বলতেন,-- ছেলেবেলায় আমার সে কী কষ্টে মানুষ হয়েছি তোরা বুঝবিনে। রাত্তিরে সবাই ঘুমিয়ে মনে মনে জেকের করতাম হায় আল্লা বড় হয়ে বাপের দুক্ষু যেন ঘোচাতে পারি। এই যে আমি মুখ্যু রয়ে গেলাম, সেকি আর এমনি এমনি? আমার যখন আট ন-বছর বয়েস, তখন আমি এক রসিলে কাজ নেই। রোজ যেতে আসতে ষোল - আঠারো মাইল। এই পুরো রাস্তাটা আমাকে হাটতে হত। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় মোড়লরা অন্যায়ভাবে সাধারণের জমি-জায়গা ভোগ করত। চরম দারিদ্র্যে অস্বাভাবিক কায়িক শ্রমে দিনপাত করতে হত তাদের। বাঁচার জন্য দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করার বর্ণনায় লেখকের দরদ ও সহমর্মিতার ছোঁয়া পাওয়া যায়। সন্তানের জন্য দারিদ্র পিতার স্নেহের দুর্গ, পিতার দুক্ষু ঘোচাতে সন্তানের মুখ্যু হয়ে শৈশবে রশিকলে কাজ নেওয়ার বর্ণনায় লেখকের সমাজ বাস্তবতা ও সমাজ চেতনার নিদর্শন পাওয়া যায়।

বাদশার ঠাকুর্দা মারা যান দুঃখকষ্টের মধ্যেই। তার বুবু অর্থাৎ ঠাকুমাও মারা যান নব্বই বছর বয়সে। তাদের সংসার দুঃখকষ্টের মধ্যে চলছিল কোন রকমে ঘষটে ঘষটে। জ্ঞান হওয়া থেকে বাদশা দেখে আসছে তার বাবার রোজগার রোজ ষোল - আঠারো আনা। পুরো পাঁচ সিকেও নয়। সেই আট-ন বছর বয়স থেকে তার বাবা বহু কষ্টে কলে কাজ করে চলে। তিনি গোটা রাস্তা হেঁটে কখনও ঘুসুড়ি, কখনও খিদিরপুর যেতেন। খালি পায়ে। গরমের দিনে তার ফোস্কা পড়ে পা ফুলে যেত। পরের দিকে অবশ্য একটা সাইকেল হয়েছিল তার । সেই সাইকেল লেখকের ভাষায় - তার প্যাডেল, তার রড, সিটের নিচেকার জয়েন সব আগাপাছ তলা ঝালাই করা। ডানদিকের হ্যান্ডেলে বেল ছিল। কিন্তু

বাজাতে গেলে বাজত না। কেবল খোয়া-তোলা রাস্তায় ঝাঁকানি খেলে তা থেকে আপন মনে ঠননং করে বোল

উঠত। আর টয়ার? তার তিন-চার জায়গায় বড় বড় তালি। তালিগুলো সংখ্যায় যে-হারে বাড়ছিল, তাতে কিছুদিন পরে তালির নিচে আদর টায়ারটা আর দেখাই যেত না। মোড় ঘুরতে হত খুব সাবধানে কেননা টায়ারের দাঁতগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে বুড়োদের মাড়ির মত প্লেন হয়ে গিয়েছিল। ব্রেক ছিল না। পরে মাড়গার্ডটাও খসে যাওয়ায় সওয়ারির ডান পাটাই ব্রেকের কাজ করত। তিন-চার মাইল রাস্তার মধ্যে অমন সাইকেল দুটো ছিল না। ফলে, সে সাইকেল যেই চড়ে যাক? রাস্তার লোকে সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলত বাবরিঅলা বলত না। বলত ফকির সাহেব। সামান্য একটি সাইকেলের দীর্ণ দশা বর্ণনায় লেখকের রসবোধ ও বাস্তব বস্তুনিষ্ঠার অসামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। ফকির সাহেবের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক উপমার চমৎকারিত্বের নিদর্শন রেখেছেন। সেই সঙ্গে তাহের মিঞার নিদারুণ দারিদ্র্যের বর্ণনায় লেখকের সহমমিতার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহের মিঞার গোঁফ নেই, জুলফি নেই, থুতনির নিচে নৌকোর মতো একটু দাড়ি। সাদা হয়ে যাওয়ার পর কালো মুখের মধ্যে দাড়িটা দেখাত ঠিক ঈদের চাঁদের মত। একটা বুকখোলা হাত-কাটা সূতির কোর্ট, ছেঁড়া তেলচিটে গেঞ্জি, সেলাইকরা আটহাতি ধুতি -- বাজানের এই ছিল বরাবরের ড্রেস। বা-জান কোটটাকে একটু বেশি খাতিরযত্ন করত। বাড়ি থেকে কারখানা আর কারখানা থেকে বাড়ি -- শুধু আসা যাওয়ার এই পথটুকু কোটটা বাজানের গায়ে উঠত। কারখানায় পৌঁছেই গা থেকে কোটটা খুলে ফেলত। বাড়ি এসে কোটটা খুলে হেৎনের দেয়ালে পেরেকের গায়ে ঝুলিয়ে রাখত। নতুন অবস্থায় অবশ্য পুরো হাতার কোটই ছিল। তারপর যেমন যেমন ছিঁড়ত তেমন তেমন কাঁচি দিয়ে কোটে দেওয়া হত বলে হাতাটা ছোট হয়ে আসত। শেষের দিকে কোর্টেহাতা বলে আর কিছু থাকত না। পিঠে কলারের কাছটাতে তখন তালি পড়ত। পেছন ফিরলে তবে গোটা দেখা যেত। গেঞ্জিটা যখন একেবারে ফর্দাফাঁই হয়ে যেত, গায়ে ঝোলাবার ও আর কোনো উপায় থাকত না, একমাত্র তখনই গায়ে নতুন গেঞ্জি উঠত। বা-জানকে আমরা ক-বার নতুন গেঞ্জি পরতে দেখেছি, প্রায় আঙুলে গুণে বলে দিতে পারি। আর বা-জানের ধুতি সেলাই করতে করতেই তো দেখলাম মা-র নজরটা চলে গেল। এই বর্ণনা লেখকের শিল্পীমনের সঙ্গে জীবন অভিজ্ঞতার অভেদ সৃষ্টি বলে অনুমেয়। সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্তের পারিবারিক জীবনের প্রতি সামাজিক নিষ্ঠা এর মধ্যে নিহিত। লেখকের সমাজতান্ত্রিক জীবনাদর্শের সঙ্গে সৃজনী শক্তির অসামান্য মিশ্রণ ঘটেছে এখানে। বাদ্‌শার বড়বুবু অর্থাৎ দিদি হওয়ার পর তাহের মিঞার সত্যিগতি হঠাৎ একদম

চলে যায়। সে পীরের কাছে গিয়ে মুরীদ হয়। পীর তাকে কলমা শেখায়, দোয়াতাবিজ দিতে শেখায়, কারো গায়ে বাতাস লাগলে দাওয়াই দিতে শেখায়। সেই থেকে তার মন ঘুরে

যায়। তার মন চলে যায় রোগ ব্যামো সারাবার দিকে। তার বাড়ির চালা তুলে তৈরী হয় দরগা, মানিক পীরের দরগা। আস্তে আস্তে সে জলপড়া টলপড়া দিতে লাগল। অনেকে তার কাছে হাতও দেখাতে লাগল। এইকরে তার রুগী দেখার নেশা পেয়ে বসল। এভাবে কোবরেজি, হেকিমি, টোটকা এসব ওষুধ টষুধ ফকির সাহেব শিখে নিয়েছে। কারখানা থেকে ফিরেই ফকির সাহেব তাগাতাবজ, কোবরেজি, টোটকা বা হেকিমিতে বেড়িয়ে পড়ত। কিন্তু রোগ যেমনই হোক, সারুক আর না সারুক ফকির সাহেবকে ডাকতে কেউ ভুলত না। কেননা মানুষটা যে ভাল। রোগ যতক্ষণ না ছাড়ছে ফকিরসাহেব সেই রুগিকে ছাড়বে না। নিজের মুরোদে না কুলোলে ডাক্তার বদ্যি নিজেই সে ডেকে আনবে। এনে বলবে, দেখুন ডাক্তারবাবু, আপনিই দেখুন -- হাতুড়েদের ওপর এখন তো আর এদের বিশ্বেস নেই। বা - জান নিজের দৌড় জানত বলেই লোকে বাজানকে ডাকতে ভরসা পেত। আর বা-জান একবার যে বাড়িতে ঢুকত, সে বাড়িতে হয়ে যেত তার মৌরুসিপাট্টা। সন্ধেবেলা গল্পগাছা করার একটা জায়গা। গড়ে উঠত আত্মীয়তা বন্ধুত্বের একটা সম্পর্ক। বাদ্‌শার বা-জানের সমাজ মনস্কতা ও দায়বদ্ধতার পরিচয় পাই। এভাবে ফকির সাহবের বাড়ি একটা সামাজিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। বাদ্‌শার কথায় -- মহরমের দিন আমাদের বাড়িতেই ফাতোহা হত -- ইমাম সাহেবের ফাতেহা। ঐ দিন খুব ধুমধাম করে কলমা পড়া হত। আর খিচুড়ি ভোজ হত। এই স্মৃতি কথায় বাদশার শৈশবের একটি স্মরণীয় ঘটনা মনে পড়ে যায়। সে বলে -- আমরা শুয়ে পড়লে মাঝে মাঝে বাজান আমাদের মাথার কাছে এসে বসত। বাজান তারে ছেলেবেলার গল্প করত। বলত, -- তখন লোকের এত বাস ছিল না। জঙ্গলে শেয়াল ডাকত। আমাদের ছিল গোলপাতার ঘর। আমার যখন আট বছর বয়েস, তখন কলে কাজ করতে ঢুকেছি। নে মত ঘুমিয়ে পড়। তারপর আমার পিঠে একটা চড় এসে পড়ত, এই হারাম জাদা চোখ বোঁজ। এখনও মনে পড়ে, বাবার হাতের সেই চড়টা খাব বলে রাত্তিরে শোয়ার পরেও আমি অনেকক্ষণ ধরে চোখদুটো খুলে রেখে চেষ্টা করতাম জেগে থাকতে। এখানে শৈশবের স্মৃতিকথা বর্ণনায় উপন্যাসিক শিশুর মনস্তত্ত্বের বিষয় স্পষ্ট করে তুলেছেন।

এই উপন্যাসে লেখকের অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য সহজে নজরে আসে। বাদ্‌শা জেলের ভেতর কথকের সঙ্গে আলাপচারিতায় কারখানার যে বর্ণনা করেছেন, তা মূলতঃ লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতালব্ধ জীবন বৈচিত্র্যের একটি নিদর্শন। শৈশব পেরিয়ে বাদশা শালিমার কারখানায় কাজ নেয়। বাদশার কারখানা হল জাহাজ মেরামতের কারখানা। সেখানে সব সময় ঘ্যাস্ ঘ্যাস খ্যাড়র খ্যাড়র শব্দ।

মেশিনের সে শব্দ সর্বক্ষণের। নিজেদের ছাড়াও সেখানে সিলভার লাইন, ক্রুক লাইন, সিটি লাইন, ব্যাঙ্ক লাইন, জাভা লাইন এরকম সব জাঁদরেল জাঁদরেল লাইনের বড় বড় জাহাজ মেরামতের কাজও তারা করে । বাদশার কথায় -- ডকে যখন জাহাজ আসে প্রথমে যায় সার্ভে ইঞ্জিনিয়ার সরেজমিনে জরিপ করতে। সঙ্গে থাকে ঘাট ইঞ্জিনিয়ার। জাহাজের তলা থেকে শুরু করে ইঞ্জিন, বয়লার ডেক, মাস্তুল, ট্যাঙ্ক, ডীপ ট্যাঙ্ক সব কিছু তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। যে যে পার্টস মেরামত করা দরকার, তার ওপর দাগ দেয়, জাহাজের নক্শাকেও সেইমত চিহ্নিত করে। তারপর কেউ টেন্ডার চায়, কেউ বা তাদের কাজ দেয় আগে থেকে যাদের ঠিকা দেওয়া থাকে। আমাদের কারখানায় দু-তরফে কাজ - আউটডোর আর ইনডোর। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলে আউটডোরের ফোরম্যান তার দলবল নিয়ে যাবে জাহাজে। দাগানো জায়গায় পার্টসগুলো যদি সরিয়ে নিলে চলে তাহলে খুলবে, যদি ঝরঝরে হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কেটে বাদ দেবে। ইনডোরে সেই জিনিস, হয় সারিয়ে নয় নতুন তৈরী করে, আবার যাবে আউটডোরে। আউটডোরের মিস্ত্রি কারিগররা করবে ফিটিঙের কাজ। এ কাজের অনেক ভজকট। প্রথম থেকে শেষ অবধি অনেক হাতে নানা স্তরে কাজ হবে। কারখানার নানা স্তরে বিভিন্ন কাজের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক কানার বাস্তবতা রিয়ালিজম তত্ত্বের ওপর সৃষ্টি ধর্মের পরিচয় দিয়েছেন। ব্যক্তি জীবনে ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৫২ সাল নাগাদ বজবজ চটকলে সস্ত্রীক মজুর সংগঠনের কাজ করেন। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে দুজনেই মজুর সংগঠনের কাজ করেন। এরপর বজবজ থেকে ফিরে কলকাতায় ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করেন পোর্ট অঞ্চলে। পোর্ট অঞ্চলের কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতার চিহ্ন রয়েছে তাঁর হাংরাস উপন্যাসে। শ্রমিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সামান্য পারিশ্রমিকে কাজ করে চলে। কোন কোন শ্রমিক লোকচক্ষুর আড়ালে অকালে ঝরে যায়। এই মমার্ন্তিক বিষয়টি সংবেদনশীল শিল্পীর নজর এড়ায়নি। সমাজতান্ত্রিক কর্মী জীবনের শিল্পী হিসেবে শ্রমিক জীবন অধিকতর গুরুত্ব পাবে খুবই স্বাভাবিক। এই জীবন দৃষ্টিতে হাংরাস উপন্যাসে বাদশার কথায় ঔপন্যাসিক লেখেন -- কারখানায় ফার্নেস থেকে মাল নেওয়া আর মাল ছাঁচে ঢালা -- দুটো কাজ ই করতে হয় সাক্ষাৎ যমের মুখে দাঁড়িয়ে। একটা পা হড়কালে কিংবা একটা হাত ফস্কালে। নিশ্চিত মৃত্যু। একেকটা ফার্নেসে রোজ এক থেকে দেড় টন মাল গলানো হয়। বুঝে দেখুন তাহলে, কী ব্যাপার । ডাবুতে মাল ভরার পদ্ধতিও থেকে গেছে সেই মান্ধাতার আমালের। ফানের্সের মুখ বরাবর দুদিকে দাঁড়িয়ে থাকে দুজন কারিগর। একজনের হাতে শাবল, আরেক জনের হাতে বাঁশ। ফার্নেসের মুখ তখন বন্ধ। একতাল কাদা শুকিয়ে গিয়ে ফার্নেসের মুখ আটকে রেখেছে। শাবল মেরে ফার্নেসের মুখের সেই শুকনো মাটি যেই না ভেঙে দেওয়া, অমনি গলা

লোহা সেই খোলা মুখ দিয়ে গলগলিয়ে বেরিয়ে এসে ডাবুর মধ্যে পড়তে থাকবে। ডাবু ভরে যাওয়ার মত হলে তখন আসবে ফানের্সের মুখ বুঁজিয়ে দেওয়ার পালা। বাঁশওয়ালা তখন তাড়াতাড়ি বাঁশের আগায় এক তাল কাদা দিয়ে ফার্নেসের মুখের মধ্যে পুরে দেবে। যাতে ফার্নেসের মুখ জ্যাম হয়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ মাল পড়া বন্ধ হয়। কোনো ডাবুতে এক হন্দর, কোনটাতে এক টন অবধি মাল ধরে। এক টন ওজনের মাল ভর্তি ডাবু ক্রেনে করে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ক্রেনে করে ধরে মাল ঢালা - তাতেও হুজ্জতি অনেক। একটু বেসামাল হলে, হয় অতখানি মাল পড়ে পয়মাল হবে, নয় লোকের জান চলে যাবে। আমাদের কারখাতেই এখবার একটনের ডাবু থেকে মাল ঢালাইয়ের সময় মালভর্তি ডাবুতে একজন লোক পড়ে যায়। ডাবুতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একবার শুধু হিসেয়ে উঠল নীল আলোর একটা শিস্। ব্যস্ তারপর তার আর কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না। আপনি যদি আমাদের কারখানায় যান, তো দেখবেন ঢালাইওয়ালাদের সারা গায়ে পোড়ার দাগ। সব সময় কারো না কারোরশরীরের কোথাও না কোথাও দাগদগ করছে ঘা।ঞ এই দগদগে ক্ষত লেখকের মনে দাগ কেটেছে। শ্রমিক দরদী শিল্পী জগতের মানুষকে শ্রমিকদের এই পোড়া গা দেখায় ও উপলব্ধির আহ্বান করেছে। এবং করে শিল্পিত রূপ দিয়েছেন। এটা তার বিশেষ জীবনদর্শনের শুভ পরিণাম।

জাহাজের কাজ নানা রকমের। লন্ত্রিম্যান, বয় বাবুর্চি বার্বার ক্রু ইত্যাদি। ক্রুদের হেড হল সারেং। ঔপন্যাসিক লিখেছেন -- ক্রুদের ওপর জুলুম যেমন, তেমনি তাদের অমানুষিক খাটুনি। অনেক সময় এক নাগাড়ে চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি। ক্রু-ফায়ার ম্যানদের কাজ জাহাজের তলায় বয়লার ঘরে। কিছুদিন কাজ করলেই শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। তাই জোয়ান বয়েসের ছেলেরা টিকতে না পেরে পালিয়ে যায়। অবশ্য পোর্টে পোর্টে সারেংদের গ্যাং থাকে। অনেক সময় তাদের হাতে ধরা পড়ে যায়। দাউদ ভাইয়ের মামা হোসেন সে জাহাজ ছেড়ে কোথায় পালিয়েছেন আজ অবধি তার কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না। ধোপাপাড়ার কেউ কেউ আবার ট্যাকে মেঘ গুঁজে নিয়ে ফিরেছে। এই বর্ণনার মধ্যে রয়েছে ঔপন্যাসিকের আর্থ সামাজিক দৃষ্টি। কারখানার শ্রমিকদের সামাজিক অবস্থান লেখকের বর্ণনায় মাধুর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিকের সংবেদনশীল হৃদয়ে শ্রমিকদের সামাজিক জীবন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। পোর্টের ঘুণধরা কুৎসিৎ সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন -- মনে মনে দেশ ঘোরার ইচ্ছে হলেও আমার ভয় হত, পোর্ট এলে আমাকেও তো ঐ মদ মেয়েমানুষের পেছনে ছুটতে হবে আর তারপর বিচ্ছিরি সব ব্যামোয় অঙ্গ পড়ে যাবে, সারা গা পোকায় খাবে। সারাক্ষণ জল দেখে দেখে তারপর ডাঙ্গায় এলে মানুষ নাকি বেহুঁশ হয়ে হরিপরিদের মেকুর বনে যায়। পরে দেখেছি, শুধু দরিয়ায় কেন, উজানি জাহাজেও

ঐ মুশকিল। একবার গিয়েছিলাম এক সমস্ত উজানি জাহাজ মালতে। অনেক সময় জাহাজের কলকব্জা নিজেদের দোষে বিগড়ে গেলে সারেংরা গোপনে লোক ডেকে সারিয়ে

নেয়। সেই জাহাজে দেখেছিলাম তেরো চোদ্দ বছরের একটা ফুটফুটে ছেলেকে। মুখে ছিল বেদনা মাখানো। মাইনে নেই, শুধু পেটভাতা। সারেঙের খুপরি কেবিন হলে কেবিন ঝকঝকে তকতকে রাখা ফাইফরমাস ঘাটা আর রাত্তিরে সারেঙের বউ হওয়া। পোর্ট জীবনের বাস্তব ছবি ঔপন্যাসিক জীবনসত্যের অনুসন্ধানে নিখুঁত ভাবে এঁকেছেন।

কথক বাদশার জীবনকথার উপাদান নিয়ে উপন্যাস লেখার কাজে হাত দিয়েছেন। এতে জেলে বসে কথক বাদশার অতীত জীবনের স্মৃতি কথাকে অবলম্বন করেছেন। এতে উঠে এসেছে বাদ্শার নিজের মুসলিম জনজাতির জীবনালেখ্য। মুসলিম সমাজের - তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সীমাবদ্ধ সংস্কার। এবং অনগ্রসর সংখ্যালঘু জনজীবনের জীবনকথা। ছেলেবেলা থেকে বাদ্শা চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে এসেছে। তার কথায় -- এদিকে সংসারেও খুব টানাটানি। গেস্ট জীনের সামনে ছিল একটা ফুলুরিবেগুনির দোকান। সেখানে খাতা লেখা আর বাজার কনার কাজে লেগে গেলাম। মাইনে নেই, তবে বিনিপয়সায় ফুলুরি বেগুনি খেতে পাই। তখন আমার রোজগার বলতে ফতেভাই আর কাদের শেখকে পড়িয়ে বাসে একটাকে দুটাকা এরকম টানাপোড়েনের মাঝে তাহের মিঞা ছেলের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে -- বাজানের রাগ আমি কিছু করছি না। শুধু গিল্ছি আর বয়েসের চেয়ে মাথায় বেশি ঢ্যাঙা হয়ে যাচ্ছি। এর পর কি আর কেউ কাজ দেবে? বা-জান মুখ-ঝাড়া দিয়ে খালি বলত, ধোপাদের সঙ্গে মিশছিস গাধা হয়ে যাবি। আমাকে টিট করার জন্যে বা-জান আমাকে তার কারখানায় রিবিটম্যানের কাজে ভর্তি করে দিল। কারখানায় কাজে গিয়ে বাদশার কারখানার খোশামুদে নিয়মের প্রতি ঘৃণা বোধ হয়। তার এই উপলব্ধি থেকে বাদশা চরিত্রের আত্মমর্যাদা বোধের বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। ছোট বেলা থেকে সে শুনে এসেছে কারখানায় তার বাবা কেষ্টবিষ্টু লোক। কারখানায় তার খুব খাতির, কিন্তু কারখানায় প্রথম ঢুকে দেখে - শোনা সব কথাই উল্টো। তার ভাষায় -- একেবারে সেই গেট থেকে বাজান সবাইকে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে যাচ্ছে ছেঁড়া তালি মারা টাইম আপিসের ক্লার্ক, এমনকী যুদ্ধ ফেরতা হোঁতকা দারোয়ানটাকে পর্যন্ত। সবাই বাজানকে তুই, তুই করে কথা বলছে। ---- টিকিটটা দিয়ে এসে বা-জান পেটির কাছে কাপড় ছেড়ে জিব বার করে পান খাচ্ছে, এমন সময় বা-জানদের ফারবাবু মানে, খগেনবাবু ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে বা-জান সেলাম করে ডিবেটা বাড়িয়ে দিল। খগেনবাবুর মুখের চেহারার কোনো ভাবান্তর হল না। বা-জানকে তিনি দেখেও দেখছেন না, এই রকম ভাব। বা-জান হাত

বাড়িয়েই আছে শেষকালে খগেনবাবু যেন, খুব দয়া করে ডিবে থেকে পান নিলেন। অমনি, বা-জানের চোখে মুখে ফুটে উঠল একটা কৃতার্থ হওয়ার ভাব। খগেনবাবু বা- জানের হাঁটুর বয়সী। তাঁর মধ্যে বা-জান সম্বন্ধে এই তাচ্ছিল্যের ভাব দেখে আমার খুব রাগ হচ্ছিল। এরপর গঙ্গা নস্করকে দেখে বাদশাকে তার বা-জান ধমক দিয়ে বলে মালকোঁচা মার। এ যেন বাবুগিরি করতে এয়েচ? হাঁটুর ওপর কাপড় তোলো। এ ঘটনায় বাদশার কারখানার লোকজনদের আত্মমর্যাদা অবমাননার প্রতি ঘৃণা বোধ হয়। শ্রমিকদের এই তোশামুদে মনোভাবের প্রতি প্রচন্ড রাগ হয়। এ থেকে বাদশা চরিত্রের আত্মমর্যাদা বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তার চরিত্রের বলিষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রমিকদের ব্যক্তিত্বের মর্যাদা আদায় তার চরিত্রের ভিন্ন এক ধরনের লড়াই।

তার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য কারখানায় অনেক তুচ্ছ বিষয়েও বাদশা কখনো কখনো অসহিষ্ণু হয়ে উঠতো। কারখানায় কাজে যেতে যেতে, অথবা কোন মাল কাঁধে করে নিয়ে যাওয়ার সময় তার বা-জানের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলে সে যেন মরমে মরে যেত। এভাবে আত্মগ্লানি সহ্য করতে করতে ছোট বাদশা কখনো কখনো বিদ্রোহী হয়ে উঠত - রাগে দুঃখে অভিমানে এমনভাবে ভেতরে ভেতরে ফুলছিলাম যে, একদিন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না তুচ্ছ একটা কারণে একেবারে ফেটে পড়লাম। একদিন একটা হ্যাংলাইনে কাজ হচ্ছিল। এমন সময় তার হাতের রেঞ্চ হাত ফসকে প্রচন্ড শব্দে পড়ে যায় । সেই হ্যাংলাইনের একটা কোন ধরে ছিল গঙ্গা নস্কর। আরেকটু হলে রেঞ্জটা তার পায়ে পড়ত। পড়লেই তার পা দুখণ্ডটুকরো হয়ে যেত। তাই গঙ্গা মিস্ত্রি তাকে মা তুলে গাল দিয়েছিল। সে গাল শোনামাত্র হঠাৎ বাদশার মধ্যে সব যেন ওলটপালট হয়ে গেল। ধাঁই করে রেঞ্জটা ছুঁড়ে ফেলেদিল। মাথা সরিয়ে নেওয়ায় রেঞ্জটা সজোরে পেছনে লোহার দেয়ালে লেগে ছিটকে গঙ্গা মিস্ত্রির কাঁধে এসে লাগে। মিস্ত্রিদের মধ্যে খিস্তি, গালি বা অশালীন নোংরা ভাষা ছোট বাদশাকে ভীষণ পীড়া দিত। অন্যদিকে অনেক সহকর্মী মিস্ত্রিকে সে ভালবাসত। তার সবচেয়ে বেশী ভাল লাগত হরী মিস্ত্রিকে। কারণ সে খুব মন দিয়ে কাজ শেখাত। ধীরেন সরকার সহ অনেকেই তার সঙ্গে কাজ শিখত। এভাবে কারখানার কাজের ভেতর দিয়ে একদিকে যেমন তাদের মধ্যে একটা নতুন ধরনের আত্মীয়তা গড়ে উঠত, অন্যদিকে তেমনি তাদের মধ্যে চলত হিংসা ও বিদ্বেষ

কারখানার শ্রমিক জীবন থেকে বাদশার সমাজতান্ত্রিক মজুর আন্দোলনের পর্বটি লেখক অসাধারণ শিল্প চাতর্যের দ্বারা পাঠকের মনে বিশ্বাসযোগ্যতা ও পারম্পর্য সন্নিবেশ করেছেন । এ দুয়ের যোগ সাধনের সূত্র মসৃণ ও যৌক্তিকতার বন্ধনে নির্মিত। কারখানার পরিবেশ অনেক সময় মিস্ত্রিরা মদ

আর বেশ্যায় বুঁদ হয়ে থাকত। গঙ্গা মিস্ত্রি স্বভাব চরিত্রের খারাপ অবস্থার কারণে কারখানার শ্রমিকদের পাঁচ-ছ মাসের টাকা উড়িয়ে বেপাত্তা হয়ে যায়।এই অবস্থায় বড় সাহেব কারখানা থেকে বাদশা সহ অন্যান্য শ্রমিকদের বার করে দেয়। এ নিয়ে কোর্টে গেলে একজন উকিল শ্রমিক নেতা শ্রীনাথ বাগচীর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। বাদ্‌শা অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে শ্রীনাথ বাগচী তাদের সব আদায় করে দেবার আশ্বাস দেয়। এবং বলে -- দেখো আমাদের আসল উদ্দেশ্য তো মজুরদের দাবিদাওয়া আদায় করা নয়, ডিমের ওপর যেন শক্ত খোল থাকে এও তেমনি, আসলে চাই দেশের স্বাধীনতা, আমাদের লক্ষ্য মজুররাজ আনা। এরপর শ্রীনাথ বাবু মজুরদের ইউনিয়ন গড়ার পরমর্শ দেন। বাদ্‌শার রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষিত এই উপাদান দ্বারা সূচিত হয়।

এই সময়কালে ইউনিয়ন গড়া সম্ভব হয় না, এরপর নানা কারখানায় কাজ করতে হয় বাদশাকে। নানা কারখানার নানা অভিজ্ঞতা। বাদশা তার বাবা এবং দাদা - পরিবারের প্রত্যেককেই শ্রমিকজীবনের যারপরনাই অমানবিক বাড়তি কাজ বিনা পারিশ্রমিকে করতে বাধ্য হতে দেখে। সে তার দাদাকে দেখেছে - গণি মিস্ত্রির এপার গঙ্গায় বাঙালী বউ ও ওপর গঙ্গায় হিন্দুস্থানী বউয়ের বাজার করা ছেলেমেয়েদের কাঁথা ধোওয়া, মিস্ত্রির হাতে চড় খাওয়া, লাথি খাওয়া। মায়ের অবস্থার কথায় বাদশা বলে - রোজ তার বা-জানের আনা বলাই মিস্ত্রির তেলচিটে ময়লা জামাকাপড় কেচে কেচে তার মার নিজের হাত কালি হয়ে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে বাদশাও মিস্ত্রিদের মন পেতে হাসিমুখে টিফিন এনে দেওয়া ও ফাইফরমাশ খাটার কাজ করত । তারপর বাজগঞ্জে টানার মোর্শনে, মাকদাপুর জাহাজে ঝালাইয়ের কাজ এবং গঙ্গায় নোঙর করা বি.আই.এস.এনের একটা বড় জাহাজে সে কাজ নেয় । এখানে আমরা তার কাজের বর্ননায় লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় পাই -- জাহাজের খোলের ভেতর যেখানে তলায় সাইড প্লেট আর বটম প্লেট ধরে রাখার জন্যে ব্রিজ ব্ল্যাকেট থাকে - সেই ব্ল্যাকেটের কাজ। কোথাও দাঁড়িয়ে, কোথাও শুয়ে, কোথাও হামাগুড়ি দয়ে, কোথাও কাত হয়ে কাজ করতে হচ্ছে। সারাদিন সারারাত ধরে একা সাতখান ব্ল্যাকেট কেটে ভোর চারটে পাঁচটার সময় যখন ডেকের ওপরে উঠেছি, তখন বমি করে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। এভাবে অমানুষিক কাজ করে পাড়ায় তার ইজ্জত বেড়ে যায়। রোজ আমার একটাকা হলেও ওভারটাইম করেও কিছু হচ্ছিল। তা কোনো কোনো মাসে সব মিলিয়ে তখন ষাট টাকাও হাতে এসেছে। কাজেই পাড়ায় যে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের বুলু ছিল, সে এবার হয়ে গেল খাতিরের বাদশা । বাদশা এবার ভিন্ন এক জীবন কে দেখল। দেখল বন্ধুবান্ধবকে। দেখল পাড়ার অন্যান্য মানুষ ও কারিগরদের। এখানকার দুর্গতি দেখে তার তাকে হাড়কলে কাজ দেয় । সেখানে ছিল তার সকাল পৌনে আটটা থেকে

বিকেল ছটা পর্যন্ত ডিউটি। মাঝখানে বারোটায় টিফিন বাবদ এক ঘন্টার জিরেন। নাইট ডিউটির সময় ছিল সন্ধে ছ-টা থেকে এগারোটা আর ভোর চারটে থেকে আটটা। হাড়কলের ভেতরের কথায় বাদশা বলে -- ওঃ সে কী জায়গা! আপনারা যাকে নরক বলেন, মুসলমানরা যাকে বলে দোজখ -তার সঙ্গে সামান্যই ফারাক। কারখানায় মালগাড়ির ওয়াগন ভর্তি করে করে হাড় আসে। ওয়াগনের দরজা খুললেই ভক করে একটা হাড় পচা ভ্যাপসানো ঝাঁঝানো গন্ধ নাকে মুখে এসে এমন ভাবে ধাক্কা দেয়, যেন মাথা ঘুরে পড়ে যেতে হয়। ঐ গন্ধে প্রথম প্রথম কুলিকামিনরাও ভিরমি খেয়ে উল্টে পড়ে যায়। ওয়াগনে করে সেসব হাড় আসতো ছোটনাগপুর, হাজারিবাগের জঙ্গল থেকে। মানুষ, ঘোড়া, মোষ, গরু, ছাগল, ভেড়া কোনো বাছাবাছি নেই। হাড় আছে এমন কিছু একটা হলেই হল। সব সময় শুধু হাড় নয়। একেবারে ছাল মাংসসুদ্ধ আস্ত জানোয়ার তাতে ঢোকানো থাকত। সেই সব মাংস পচে গলে এমন ফুলে উঠত যে তার গন্ধে তখন কারখানা ছেড়ে পালাবার অবস্থা হত। শুধু কি গন্ধ? ওয়াগনের ভেতর বাসা বেঁধে থাকত এক হাত লম্বা লাল লাল তেতুঁলে বিছে। শোনা গেছে, কখনও কখনও নাকি হাড়কঙ্কালের সঙ্গে বিষধর সাপ এসে ওয়াগন থেকে নেমেছে। কিন্তু বিষের জন্যে বিছে বা সাপের দরকার নেই। সেদিক থেকে ঐ হাড়গুলোই যথেষ্ট। কেননা, যদি দৈবাৎ কারো গায়ে কোথাও ঐ হাড়ের খোঁচা লাগে তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই জায়গাটা বিষিয়ে যাবে। সেপ্টিক হয়ে আগে কুলিকামিনেরা মারাও গেছে অনেকে। এই হাড়কলের বর্ণনায় বাদশা বলে - বিভিন্নভাগে হাড় কলে কাজ হয়। ওয়াগন থেকে প্রথমে মাল খালাস করে হাড় ভেঙ্গে গুড়ো করা। গুঁড়ো হাড় বস্তাবন্দী হয়। তারপর মাংসের নিচে হাড়ের গায়ে থাকে একটা পাতলা চামড়ার পর্দা। হাড় ভাঙলে সেই পাতলা চামড়া আলদা হয়ে তৈরীর কাজে লাগে, গুড়ো করার সময় মেশিনের যে যে জায়গায় হাড় জমে যায় সেগুলো পরিষ্কার করা, মেশিন ঝাড়পুঁছ করার কাজ করে বিলাসপুরীরা। মেশিনের যেসব পার্টস্ খোলা যায় না, সেগুলো মেরামতি করে নাইট ডিউটির মিস্ত্রিরা। এছাড়া চামড়াগুলো সেদ্ধ করে রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে অথবা আগুনে ভেজে নিয়ে সেগুলো গুড়ো করে প্যাকিং করা হয়। এছাড়াও রয়েছে ওয়েল্ডিঙের কাজ। হাড়কলের এই বর্ণনায় ঔপন্যাসিক শিল্পীর জীবনদর্শনের ভূমিকা পালন করেন। শিল্পীর বৈচিত্র্যময় জীবন অভিজ্ঞতার নিদর্শন এগুলি ।

হাড়কলের কর্মজীবনের সঙ্গে ঔপন্যাসিক ইতিহাসবোধের বিস্ময়কে যুক্ত করেছেন। এ থেকে তাঁর সমকালবোধ ও বিশ্ববীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। সেসময় হাড়কলের খাবি খাওয়ার অবস্থা। কেননা -- তখন লড়াই শুরু হয়ে গেছে। ফ্রান্স যায় যায়। ক্যালে বন্দর হাতছাড়া। প্যারিসের পতন হয়েছে,

আমাদের হাড়ের বড় খদ্দের ছি বেলজিয়াম নাৎসি জার্মানি তাকে গিলে খাওয়ায় হাড়ের চালান গেল বন্ধ

হয়ে। তাছাড়া কোনো দরিয়ার অবস্থাই তো তখন ভাল নয়। বিশ্ব বাজারে তখন চরম মন্দা চলছে। বিশ্ব মহাসংগ্রামের এই আচঁ লেগেছে আমাদের দেশীয় বাজারে। চলছে কারখানায় প্রচুর কর্মী ছাঁটাই। পরিবারের চরম আর্থিক বিপর্যয় এদেশের মানুষকে চরম ভোগান্তিতে ফেলে। ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শনে বিশ্ব প্রেক্ষিত ধরা পড়েছে।

এই সময় বাদশার পরিবারে খুব খারাপ অবস্থা । কারখানায় কাজের দিন কমে গিয়ে সপ্তাহে তিন-চার দিনে গিয়ে ঠেকে। এদিকে তার এক ছোট ভাই আর এক ছোট বোন টাইফয়েডে সাতদিন আগে পরে মারা যায়। এদিকে কারখানার পরিবেশ চরম নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র, সেখানে শুধু মদ নয় সেই সঙ্গে ছিল মেয়ে মানুষের নেশা। সেসময় মজুররা পরিবারে কোন রকমে দিনযাপন করে। কারখানায় লাইনের মিস্ত্রি ও বিলাসপুরীদের গোঁসাই ছেদিলালের কথায় বাদশা বলে -- তখন লড়াই সবে লেগেছে। তখনও ছিল শস্তাগন্ডার বাজার। ছেদিলালের বাড়িতে গিয়ে দেখেছি, ওরা খায় নুন দিয়ে ফ্যানেভাত। কোনো কোনো দিন শখ করে ডাল। ব্যস্ দেড় টাকা ঘরভাড়া। মাসে পাঁচ টাকা খোরাকি। বছরে দুখানা কাপড় দুখানা গেঞ্জি। --- ছেদিলালের দুই বউ। প্রথম বউয়ের ছেলেপুলে হল না বলেই দ্বিতীয় বিয়েটা একে করতে হল। দুঃখের বিষয়, দ্বিতীয় বউয়েরও ছেলেপুলে হয়নি। ওরা তিন জনেই হাড়কলে কাজ করে। তিনজনের রোজগারে কোনরকমে সংসার চলে যায়। তিনজন একসঙ্গে থাকায় খোরাকি খরচ কম পড়ে। তার ফলে, কিছু টাকা বাঁচিয়ে বাপ মা ভাইদের জন্যে ছেদিলাল পাঠাতে পারে। শ্রমিক মিস্ত্রি ছেদিলালের বর্ণনায় সোলের শ্রমিক জীবন সম্পর্কে উপন্যাসিকের আর্থসামাজিক বোধের ও শ্রমিক জীবন সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রেম মানুষের জীবনের স্বাভাবিক জৈবিক তাড়নাজাত, জীবশক্তির ও সহজাত প্রবৃত্তির আকর্ষণ বোধ করে। মেয়েটির নাম সোনারেন, দেশ থেকে চলে এসেছিল। সোনারেনের বাপ মা ভাই বোন কেউ ছিল না। ও থাকত একা একটা ঘরে। সে ছিল সেরা সুন্দরী, ঐরকম ঘরে কী করে যে ঐ রকম মেয়ে হয়, সেটাই আশ্চর্য লাগে বাদশার। বাদশার মতে সে ছিল ডাকসাইটে সেরা সুন্দরী। ওর ছিল অনেক খেঁড়ু। ধনপত, ভিখুয়া, মাংলু, ওয়ালি খাঁ -- এই রকম অনেক। সবাই লাইন লাগিয়েছিল ওকে সাদি করবে বলে। ওকে সাদি করবার কথা বেশি বলত মাংলু। প্রত্যেকেই খুব গুমর করে বেড়াত তার সঙ্গে নাকি সোনারেনের লটঘট। এই সোনারেনের প্রতি যৌবনে আকর্ষণ বোধ করে বাদশা। সে বলে -- আমি

অনেক দিন থেকেই সোনারেনের সঙ্গে ভাব করবার তাল খুঁজছিলাম। একদিন সোনারেনকে পুকুরের ধারে ধরে ফেললাম। কথা হচ্ছে, কথা হচ্ছে, এমন সময় আমি কি বেআক্কেলের মতো ওয়ালি খাঁর কথা পাড়লাম। তখন সোনারেনকে দেখতে হয়। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রেগে মুখ ঘুরিয়ে সে যা তার চলে যাওয়া যদি দেখতেন। না সত্যি, সোনারেনকে যে দেখেছে তারই বুকের মধ্যেটা কী রকম যেন করে উঠত। কোন একজন রূপসী মেয়েকে দেখে বাদশার ভেতরে কীরকম যেন করে ওঠার উপলব্ধি প্রেমের পরিপূর্ণতা আসেনি। একদিন সোনারেনকে কেন্দ্র করে কারখানায় কৈলু সর্দার ও ভিখুয়া কুলির মধ্যে চলে ছুরি মারামারি। দুজনেই হয়ে যায় জবাব। এর পরই সোনারেন আর কৈলু এ তল্লাট ছেড়ে হাওয়া হয়ে যায়। এই হাড় কলে কাজ করার সময় বাদশার মনে প্রেম জাগলেও শেষে আর হয়ে ওঠেনি। এই কারখানায় বাদশা দেখেছে এখানকার একমাত্র ওষুধ ধানী মদ। ছেলে মেয়ে সবাই খায় মদ। ওটাতো ওদের কাছে ওষুধ। তাই মদ ওরা খায় না। ওদের গিলতে হয়। এই কারখানায় বাদসার জীবনে আরেকটি ঘটনার আবির্ভাব হয়। ছেদিলাল তার ছোট বউয়ের ছোট বোনকে আনিয়েছিল। ছেদিলালের ছোট বউয়ের ইচ্ছে ছিল তার ছোট বোনকে সাদি করে বাদশা রাখুক। ছোট বউ বলত, খিদের সময় খাওয়া উচিত -- পরে খিদে মরে গেলে সাদি করবে? হোলির সময় সারাদিন মদ ভাঙ আর হুল্লোড় করে রাত্তিরে লিট্টি, ভাঙ আর লাড্ডু খেয়ে সরারাত কাটায়। এতে বাদশার অনেক বদনাম হয়।

এরপর বাদশা হাড়কলের কাজে জবাব দিয়ে ভর্তি হয়ে যায় কোন্নগরের লক্ষ্মীনারায়ণ জুট মিলে। এই মিলে প্রচুর ওভারটাইম করে, দিনে রাতে কাজ করে বাদশা। এতে তার অবস্থা বেশ একটু ভাল হয়। পাড়ায় খাতির হয়। বাদশা হয়ে উঠল বাদশাবাবু। পাড়ার ও বাড়ির সবাই বাদশাকে ভালবাসতে লাগল। বাড়িতেও তার ওপর বাপের টানটা একটু বাড়ে। বাড়িতে ঝগড়াঝাটি কমে আসে। এ সময় পরিবারের অন্যরা তার খাতির করতে থাকে। অর্থের সঙ্গে বা রোজগারের সঙ্গে পরিবার ও সামাজিক অবস্থানের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কযুক্ত - এই জীবনসত্য ঔপন্যাসিক বাদশা চরিত্রের এই অধ্যায়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাদশা এই সময় অ্যাকুলে কারখানার ওয়েল্ডিঙের মিস্ত্রি। কারখানার মিস্ত্রিদের তুলনায় সে স্বতন্ত্র। কারখানায় যে বয়রা কাজ শিখতে আসে তাদের উদ্দেশ্যে অনেকেই বাদশাকে বলে -- অত সহজে কাজ শেখাবে না। তাহলে নাকি ওয়েল্ডিঙের কাজের ইজ্জত থাকে না। কিন্তু বাদশা সবাইকেই শেখাত। যদি গরিবের ছেলে হত, মুখটা করুণ করুণ দেখতাম -- তাহলে তো কথাই নেই। আমাকে খাওয়ানো আমার ফাইফরমাস খাটা -- আমার দিক থেকে এসব উপদ্রব তো ছিলই না, বরং আমিই তাদের

অনেককে নিজে পয়সা খরচ করে টিফিন খাওয়াতাম। এখানেই বাদশা শ্রমিক শ্রেণীকে অনেক উচুঁতে উন্নীত করে। বাদশা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে একটি মহৎ চরিত্রের মর্যাদায় উন্নীত হয়।

বাদশার কারখানা জীবনের পরিচয়ে লেখক সমকালের কালোবাজারীদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। যুদ্ধের বাজারে এক শ্রেণীর মানুষ মুনাফা করে রাতারাতি উচ্চবিত্ত হয়ে ওঠে। এ রকমই একটি চরিত্র বাদশার চোখে দেখা গোপাল দাস। গোপাল দাসের ছিল একটি লোহা লক্কড়ের ছোট্ট দোকান। লড়াই লাগার পর যখন পেরেকের খুব অভাব হল, গোপাল তখন একটা মেশিন কিনল। তারপর বাজার থেকে কট্‌পিস্, মানে ছাঁটি লোহা, কিনে জুতোয় হাফসোল লাগাবার শেয়ালকাঁটা তৈরী করতে লেগে গেল। এই কাঁটা বাজারে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ধরে গেল। দুঞ্চার মাসের মধ্যে গোপাল আর দাস থাকল না, লাল হয়ে গেল। যুদ্ধের পর এখন তার এখানে বাড়ি, সেখানে বাড়ি, নিজের মোটরে ছাড়া চড়ে না। সে এখন লাখ লাখ টাকার মালিক। যুদ্ধের বাজারে ফাটকা কারবারিতে কিভাবে পুঁজিতন্ত্র ফুলে ফেঁপে উঠেছিল সে সত্য ঔপন্যাসিক গোপাল দাস চরিত্রের দ্বারা তুলে ধরেছেন।

যুদ্ধের বাজারে চলছিল খুন, রাহাজানি জখম, গুম ইত্যাদি স্বৈরতন্ত্রের প্রভাব। গোপাল দাসের মতো চরিত্রগুলো সেদিন সাধারণ মানুষকে যখন তখন গুম করে ফেলত। এরকমই একটা চক্রান্ত জালে গোপাল দাসের গুন্ডার হাত থেকে বাদশা সনাতন নামের একজন শ্রমিকের জীবন বাঁচায় । বাদশারা পাঁচজন ছিল জুলুমের বিরুদ্ধে -- সে যখন জুলুম করত, আমরা ছিলাম তার বিরুদ্ধে।-- একদিন বলাই সনাতনকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মাগীবাড়িতে নিয়ে গিয়ে মদের সঙ্গে সিগারেটের ছাই মিশিয়ে ওকে বেহুশ করবার চেষ্টা করেছিল। এরপর সেদিন সনাতন যখন রাতে কাজে আসবে তখন মেথর পাড়ায় সনাতনকে ওরা ধরে খুন করে তার লাশ ময়লা ফেলার খালে ফেলে দেবে, জল সেখানে এত ভারী যে, সহজে ধরা পড়ার ভয় নেই। বিকেলের দিকে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। গল্প করতে করতে সনাতনকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বললাম, আজ আর রাতে কাজে আসবেন না। ক্ষতি হতে পারে। এর বেশি কিছু বলব না। সনাতন আমার হাতদুটো ধরে বাচ্চা ছেলের মতো ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল। বাদশার এই উক্তি থেকে তার চরিত্রের সহমর্মিতা ও ভালো মানুষের পরিচয় মেলে। অন্য দিকে ঔপন্যাসিক এ ঘটনা দ্বারা একটা সময় কে তুলে ধরেছেন। একটা সময়ের গোটা ধর্মকে চিহ্নিত করেছেন। যুদ্ধের বাজারে জীবনকে দেখিয়েছেন। এর পর যে ঘটনাটি ঘটল তা বাদশা চরিত্রে শ্রমিক শ্রেণীর রক্ষার ক্ষেত্রে অবদান অসামান্য হয়ে ওঠে। গোপাল দাসদের মতো লাখ লাখ টাকার ধনিক শ্রেণীর অত্যাচারীদের হাত থেকে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটানা দু-বছর ধরে আমরা পালা করে

সাইকেলের পেছনে কিংবা সামনে রডে বসিয়ে সঙ্গে ছুরি নিয়ে সনাতন মিস্ত্রিকে রাতে কাজে কারখানায় পৌছে দিয়েছি। এভাবে বাদশা মজুর থেকে শ্রমিকদের নেতৃত্বের শিখরে পৌছে যায়। এথেকে মজুর বাদশা হয়ে উঠল বাদ্‌শা বাবু। বাদশার কথায় পাড়ার লোকের চোখে একবার সেই উচুঁতে উঠে গেলাম, ব্যস্‌। তখন সব ব্যাপারে আমাকে তারা ঠেলে এগিয়ে দিতে লাগল। ফুটবল টিম হবে। বাদশা। ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি হবে। বাদশা যাত্রার দল হবে। তাও বাদ্‌শাকেই করতে হবে। এরপর বাদশা পাড়ায় ক্লাব তৈরী করে দিল। পাড়ার সবাই মিলে বাদশাকেই ক্লাবের ম্যানেজার করে দিল। বাদশা ক্লাবঘরে গিয়ে বাধ্য হয়ে উদবীর পালায় যাত্রা করে। এর পরই বাদশার জীবনের পালাবদল ঘটে। বাদশার বিয়ে হয়ে যায়।

কারখানার কর্মী জীবনে বাদশার ভাবনা ছিল মজুরদের কিসে সুবিধা আর কিসে অসুবিধা হয়। বিয়ের পরবর্তী কালে বাদশার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। এর মাঝে লেখক মানুষের ব্যক্তি জীবনে নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি একটা সহজাত নাড়ীর টান ফুটিয়ে তোলেন। জীবনের সন্ধানে ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাদশাকে দিয়ে মানুষের সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিসত্ত্বার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব তুলে ধরেছেন। বাদশার আত্মকথায় ঔপন্যাসিকের নিজের সাম্প্রদায়িক গন্ডি ছাড়িয়ে বিবেচনার দৃষ্টি দিয়ে ধর্ম করে দেখার পথ নির্দেশ করেছেন। নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি একটা টান থাকা অন্যায় নয়। তবে সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতাকে দূর করার পক্ষে ঔপন্যাসিকের শিল্পীমন ছিল সচেতন। ঠিক একই ভাবে বাদশা বলে -- কাগজে মুসলমানের উন্নতির কোনো খবর দেখলে ভাল লাগত। মুসলমানদের যেসব স্বাধীন দেশ -- তুর্কি, মিশর, ইরান, আফগানিস্থান - এসব খুব আপন মনে হত। যেখানে মুসলমান শুনলে কেউ নাক সিঁটকোবে না, বরং মুসলমান হওয়াটাই যেখানে গর্বের বিষয়। বাংলায় তখন লীগের মিনিস্ট্রি। রাজা ইংরেজ হলেও, তার উজির হচ্ছে মুসলমান। এটাও কম কথা নয়। কোথাও খেলায় মুসলমানরা জিতলে, কোনো মুসলমান ছাত্র বিলেতে গেছে শুনলে খুব ভাল লাগত। মহামেডান স্পোর্টিংসের খেলার আগের দিন পাড়ার লোকে নামাজ পড়ত, রোজা রাখত। ছোট থেকে শুনে এসেছি যে, হিন্দুরা মুসলমানদের দাবিয়ে রেখেছে। মুসলমানদের উঠতে হবে। এই ভাবটা মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। বা জানতে চাইত মুসলমানরা উঠুক, কিন্তু হিন্দুদের ধরে। সেটা আবার পাড়ার লোকে পছন্দ করত না। আস্তে আস্তে জানতে পারলাম জিন্না সাহেব আমাদের নেতা, মানে মুসলমানিদের নেতা। জিন্না মায়ের চোদ্দ দফা দাবি রেখেছেন। সে দাবি না মানলে তুলকালাম কান্ড করে ছাড়বেন। এই সব শুনে মনে খুব জোর পেতাম। যখন কারখানায় কাজ করছি তখনও হিন্দু মজুর মিস্ত্রিদের সঙ্গে লীগের হয়ে তর্ক

করতাম। হিন্দু ধর্মের মধ্যে কত দোষ অবিচার, আর ইসলাম ধর্মের কী গুণ, এই সব জোর গলায় বলতাম। আক্রমণের সুরে বললেও আসলে আমি আত্মরক্ষা করতে চাইতাম। একদিকে যেমন তর্ক করছি, অন্যদিকে এক সঙ্গে কাজ করার ভেতর দিয়ে ভাবভালবাসাও গড়ে উঠছে। একদিকে মুসলমানদের হয়ে কারখানায় তর্ক করছি, অন্যদিকে পাড়ায় করছি লীগের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তর্ক। এই ভাবে তর্ক করতে করতে দেখলাম দুদিকেই অনেক কিছু বলবার আছে। আস্তে আস্তে আমার মধ্যে বিবেচনা বোধ এল। নিজের গন্ডিটুকু ছাড়িয়ে দেখতে শিখলাম। সমাজতান্ত্রিক শিল্পীর দৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক সুভাষ সমকালীন সমাজ মানসকে ও প্রগতিশীল মানসকে ধরার চেষ্টা করেছেন বাদশা চরিত্রে। এই চরিত্রে লেখকের ধর্মীয় চেতনায় উদারতা ও মানবিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে প্রত্যয়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

এর পরেই বৃহৎ জীবনে পদচারণা হয় বাদশার। বাদশা রাজনৈতিক বোধে ও সমাজ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিল পূর্ববাংলার মেট্রিক পাশ ট্রেনি আলি আর সালে। সেসময় গেস্টকীনে প্রথম ইউনিয়ন গড়েছিল আর এস পি। লড়াই লাগার পর সে ইউনিয়নের মরনদশা হয়। আলির সঙ্গে ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক। আলি কাঁধ লাগিয়ে গেস্টকীনের ইউনিয়ন ঠেলে তোলে। আশপাশের সম কারখানায় ইউনিয়ন করে দলের প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করে আলি। কমিউনিস্ট কর্মী আলি বাদশাকে একটি বই পড়তে দেয় সাম্যবাদের ভূমিকা। আলির সঙ্গে ইউনিয়ন অফিসে যাতায়াত করে বাদশা। সেখানেই সালের সঙ্গে আলাপ হয় বাদশার। বাদশা সমস্ত মজুরের একতা চেয়ে সভায় সভায় বক্তৃতা দেয়। সারা রাত জেগে হ্যান্ডবিল লেলে। ক্রমে বাদশা লিভার হয়ে ওঠে। ক্রমে বাদশা লিভার হয়ে ওঠে।

ক্রমে বাদশা নিজের উপলব্ধি করে - রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে বুঝতে পারলাম আমি আর এখন শুধু ফকির সায়েবের ছেলে ধুলু নই। আমি বাদশা তো সত্যিই বাদশা। এপাশ থেকে ও, ওপাশ থেকে সে - ডেকে ডেকে দাঁড় করাচ্ছে। স্ট্রাইকের খবর জিগেৎস করছে। যেখানেই থামাচ্ছি সেখানেই ভিড় জমে যাচ্ছে। ভিরের মধ্যে থেকে আমার কানে আসছে ছেলে ছোকরার গলা নামিয়ে বলছে উনি কে জানিস তো? বাদশা এই স্ট্রাইকের লাড়ার। তবুও বাদশার মনে দুঃখ হয় তার বাবার কথা ভেবে। তাদের লড়াইকে বাদশার বা-জান সায় দিতে পারছিল না। কিন্তু পার্টির কাজ ও ইউনিয়নের সংগ্রামকে বাদশা মনে করে একটা বিশেষ বস্ত্র। তার কথায় - বা জানের মুশকিল বা জানের হাতে একটাই যন্ত্র। সেটা থেকে যাচ্ছে মেশিন ঘরে। আমার হাত খালি নয় মুঠো করে ধরেছি অন্য একটা যন্ত্র, মা মানুষকে

নড়ায়। এ কাজেরও খুব একটা নেশা আছে। আমি খুব মেতে গেলাম। এই ধরুন, হাঙ্গার স্ট্রাইক। এটাও অনেকটা অসুখেরই মত অন্যদিকে তখনও যুদ্ধে চলছে। বাংলাদের ওপর দিয়ে ঐ রকম ঝড় বয়ে গেল - না আমি মেদিনীপুরের সাইক্লোনের কথা বলছি না। - আমি বলছি পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথা। খিদির পুরে বোমা পড়ার কথা? আমরা তখন কারখায় । ওঃ বোমা ফাটার সে কী আওয়াজ। আমার তো ভাবলাম এবার গেলাম। কয়দিন দেখতে গেলাম খিদিরপুরে। কাগজে তো কিছুই হয়নি। লোক মরেছিল অগুন্তি। পরে খোঁজ নিতে নিতে জানলাম তার মধ্যে আমাদের চেনা পরিচিত লোকও দু- চারজন ছি লড়াই তো চললেঞ্জ

বাদশা উঠে এসেছে একেবারে নিম্নমধ্যবিত্ত অরাজনৈতি ও সাধারণ পরিবার থেকে। ক্রমে বাদশা হয়ে ওঠে হাঙ্গার স্ট্রাইকের লিডার। তথাপি বাদশার এই পরিবর্তনে ওর পিতা বিরক্ত হয়ে ওঠে। বাদশার উত্তিতে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বাজান একদিন মা কে বলল, তোমার ছেলের পাখা গজাচ্ছে আগুনে পুড়বার জন্যে। রায় পাড়ায় গিয়েছিলাম গোবিন্দবাবু বলছিলেন থানার বড়বাবু নাকি ওঁর কাছে দুক্ষু করেছেন - ফকির সাহেব এত ভাল লোককিন্তু ওর ছেলেটা এমন হল কেন? কারখানার মিস্ত্রিদেরও কেউ কেউ বলছিল সাহেবদের পেছনে লাগতে যাচ্ছে, টয়টি পাবে বাছাধন। মা মুখ শুকনো করে এসে আমাকে বলল তাহলে বুলু তোর ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভা। আমার বউ সাহস পেত না আমাকে কিছু বলার। কিন্তু সেও নিশ্চয় মনে মনে ভয় পেত পরিবারের অন্য সব সদস্যই বাদশার বিপরীত পথে চলছিলেন। অথচ বাদ্শার চরিত্রের উদারতায় তারা ক্রমে রাজনীতিতে সামিল হয়। ক্রমে বাদশার পরিবার হয়ে ওঠে একটি রাজনৈতিক পরিবার।

বাদশঅর খালু পুলিশের ভয়কে উপেক্ষা করে রাত্তিরে তার বাড়িতে থাকার কথা বলে স্ট্রাইক ফান্ডে দুটো টাকা দিয়ে আসে। বাদশার বাবা ইউনিয়ন অফিসের ডিউটি করে। বলে আমি ভেবে দেখলাম বাদশা ডুব মেরেছে, তোরা সব রাস্তায় থাকবি, আলি - সালে ওদেরও একটু সরে থাকতে হবে, কাজেই ইউনিয়ন অফিসে বসে থাকা আমার পক্ষেই সবচেয়ে সুবিধের। যদিও রাজনৈতিক কর্মীদের হঠকারিতায় মর্মান্তিক অঘটন ঘটে যায় বাদশার বা জানের। একদিন ইউনিয়ন অফিসে সারাদিন থাকার উদ্দেশ্যে তার বা জান টিফিনের বাক্স হাতে করে, পকেটে বাড়ির ডিবে পানের ডিবে নিয়ে কারখানার ড্রেসে সাইকেলে যাচ্ছিল। কারখানার ড্রেসে সাইকেলে যাচ্ছিল। কারখানার ড্রেসে যাচ্ছিল বলেই বাদশাদের ভলান্টিয়াররা তাকে লোহার রড দিয়ে মারে। গুঁযে জায়গাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার পাশেই বা - জানের সাইকেলটা কাত হয়ে পড়েছিল। একটু দূরে টিফিনের কৌটোটা ঢাকনা খোলা অবস্থায় পড়ে।

কয়েকটা রুটি ছেঁড়াছেড়ি করছিল একদল কাক। সেখানে পৌছে সাইকেলটা নিয়ে বাদশা সোজা হাসপাতালের দিকে জোরে চলতে থাকে। যেতে যেতে এক জায়গায় একজন বুড়োমত লোক বলল শূনলাম, বাবরি অলার পা-গাড়ি। একজন ছোকরা আপত্তি করে বলল, না না। ওটা তো ফকির সায়েবের পা গাড়ি। গাড়িতে বেল ছিল না, ব্রেক ছিল না। মাথা ঠান্ডা ছিল। কিন্তু যাচ্ছিলাম ঝাড়ের বেগে। তার পর বাদশার বা জানের খবর ঔপন্যাসি আর দিতে পারেন নি। সংগ্রাম জীবনের কাহিনীর সঙ্গে বাদশার বাজানের ট্র্যাজিক উপকাহিনী পাঠকের সামনে অনেক জিজ্ঞাসা ভিড় করে। ভলান্ট্রিয়াররা নিজেরা মজুর হয়ে অন্য একজন মজুরকে লোহার বড় দিয়ে খাবার সঙ্গত কিনা উপন্যাসি শ্রমিকদের দ্বারা মজুররাজ সৃষ্টির প্রতয়ী ছিলেন। চেয়েছিলেন জ্ঞসব মজুরের একতা । যে পেটের তাগিদে বাঁচার লড়াইয়ে সংগ্রামে সামিল না হয়েও কাজ করতে যায় সে শ্রমিক ও ঔপন্যাসিরে দৃষ্টির আর এক ভিন্ন সংগ্রামী। তার সংগ্রাম পরিবারকে দারিদ্রের মোচনের লড়াই। ভলান্টিয়ারদের নেতা বাদশার বা - জানের মাথায় বড় দিয়ে খারার মর্মান্তিক ঘটনা দিয়ে উপন্যাসিক যে কোন একজন শ্রমিকের মাথায় খাবার সাংঘাতিক অপরাধ উপলব্ধি করাতে চেয়েছেন।

বাদশা চরিত্র তার পরিবারের রাজনৈতিক রূপ এই উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। চরম দারিদ্রের মধ্যে মজুর ও শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে বিভিন্ন পরিবেশের প্রতি কৃলতার বিরুদ্ধে জীবন সংগ্রাম শিল্পে। উন্নীত করেছেন ঔপন্যাসি। একটি সাধারণ মজুর ও শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ মজুর ও শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ পরিবারবারকে মজুরদের স্বার্থে সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ে একটি রাজনৈতিক পরিবারের রূপদানের স্বার্থকতা অসামান্য। হৈ কাহিনী বর্ণনার ঔপন্যাসি অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। জেলে বসে কথকের সঙ্গে আপাপচারিতায় বাদশার আত্ম কথায় স্মৃতি চারণের রীতিতে ঔপন্যাসিক অভিনব পদ্ধতি অবল্বন করেছেন। জেলে বসে কথকের সঙ্গে আলাপচারিতায় বাদশার আত্ম কথায় স্মৃতিচারণের রীতিতে ঔপন্যাসি বাদশার কাহিনী তুলে ধরেছেন। স্মৃতিকথায় টুকরো টুকরো বিভিন্ন ছবি ছায়াছবির মতো উঠে এসেছে। বিভিন্ন বিন্তামালা একে একে বাদশার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। রাজনৈতির সংঘাত, জাতীয়জীবন, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত, ঐতিহাসি পটভূমি শ্রমিক বাদশার উপলব্ধি ভাল লাগা মন্দ লাগা শৈশব পারিবারিক জীবন ও সংখ্যালঘু জনজাতির নানা কথা ঔপন্যাসি অভিনব আঙ্গিক শিল্প রূপের দ্বারা রসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন।

এই উপন্যাসের একটি বড় অংশ কথক চরিত্র । কথক আমার কথা শিরোনামে তার কথা বলেছেন। উপন্যাসের কথকের নাম অরবিন্দ তার পিতা শিবকালী দেব বর্মণ প্রতিতামহ গুরুদাস দেব

শর্মন। এই কথকের বিভিন্ন উপলব্ধি ও আত্মকথার মধ্যে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি জীবনের ছায়া দেখা যায়। জীবনকে দেখার ভিন্ন কোন নিয়ে অঙ্কিত এই চরিত্র। উপন্যাসের একবারে শেষে এসে কথকের ভাবনার সঙ্গে এক হয়ে ঔপন্যাসি লিখেছেন জ্ঞজ্ঞমানুষ বাইরের প্রকৃতিক কতটা জেনেছে তার চেয়ে ঢের কম জেনেছে মানুষের অন্তঃ প্রকৃতিকে। আমি মনে করি, মানুষের জানবার ক্ষমতা সীমাহীন। কিংবা বলা যায় মানুষ তার জানার সীমানাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলেছে। মানুষের জ্ঞানগম্য তার একটা বড় নির্ভর ইন্দ্রিয় লব্ধ অনুভূতি। সেই অনুভূতির আঁচে ধরে অদৃশ্য কালিতে লেখা অনেক গুপ্ত চিঠের মর্মোদ্ধার করা সম্ভব। আমাদের শরীরে আর মনের অনেক খিল এখনও খোলা হয়নি। কোনো খিল দিয়ে আটকে রেখেছি বেরিয়ে যাবার দরজা, কোনটাতে আটকানো বাইরে চোখ মেলার জানলা। বাইরের ও অন্তঃ প্রকৃতি দিয়ে আত্মবিশ্লেষণ অনেক সময় করেছেন কথক। তার নিজেকে নিয়ে এই পর্ববেক্ষণ বিশ্লেষণ এবং জিজ্ঞাসা ঔপন্যাসিরে ব্যক্তি জীবনের নানা সংগ্রাম, সংঘাত ও জয় পরাজয় নিহিত রয়েছে। জেলে বসে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেকে জানার ও উপলব্ধির এক বিশেষ লড়াই করেছেন লেখক। ঔপন্যাসিকের জীবন জিজ্ঞাসার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে কথকের ভাবনা ফুটে উঠেছে। কথকের মধ্যে একটি রাজনৈতিক চরিত্রে ছোট ছোট দুর্বলতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শিল্পের অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

একটি বিভীষিকার রাত নিয়ে উপন্যাসের শুরু আবার কথকের কথা বলাও শুরু। মগে নিয়ে যাওয়ার আগে শেষবারের মত আমাদের বন্ধুদের লাশগুলো এনেছিল দেখাতে। তা দেখে কথক তার বন্ধুদের সঙ্গে সকাল থেকে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বারান্দায় পা ছড়িয়ে গুম হয়ে বসেছিল একে একে খাটিয়াগুলো এনে নামিয়ে রাখে এবং তুলে নিয়ে যায়। সঙ্গীদের গলা অবধি চাদরে ঢাকা। খুলো মাৎ শ্লোগানে সারা জেলখানা কাঁপিয়ে তোলে তারা। তারপর যে যার সেলে ফিরে যায়। জেলে ক্লান্তিতে শুয়ে শুয়ে তার দাদুকে মনে পড়ে। কথকের সমস্ত সত্তার সঙ্গে জুড়ে ছিল তার দাদু। দাদুও উপলব্ধি করতে পারে কথক অরবিন্দকে। অরবিন্দ হাঙ্গার স্ট্রাইকের রাজনৈতিক বন্দী। সেলের ভেতর থেকে সে উপলব্ধি করে ভয়ে মুখ শুকিয়ে খোঁড়া পায়ে দাদু আমার দেখা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন। সশস্ত্র পুলিশ জেলখানাটাকে ঘিরে রয়েছে দাদু নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছিলেন। দাদুর কথা ভেবে আমার ভয় হচ্ছিল। ধীরে ধীরে সে ভয়টাকেও অনেকটা গা-সওয়া করে নেয়। কেননা, সে বুঝেছে ভয়ের কথা যত ভাবা যায় ভয় তত পেয়ে বসে একদিন অনেক রাতে যখন একতলায় অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন চলছিল চোঙ মুখে দিয়ে বক্তৃতা। বক্তৃতা চলতে চলতেই ঝনঝনাৎ করে সামনের গেটটা খুলে যাওয়ায় একটা

আওয়াজ হয়। তারপরই আলোয় ঝলমল করে উঠল কয়েকটা লাঠি আর ঠিক সেই মুহূর্তে এদিক থেকে এক

পসলা শিলা বৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে লাঠিতে লাঠিতে ঠোকাঠুকি হয়ে পড়ি মরি করে পালানোর সে কী দৃশ্য! এদিক থেকে তখন জয়োল্লাসে স্লোগানের পর স্লোগান উঠছে। ফটকের ওপাশটা ফাঁকা হয়ে গেছে। হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ফট্-ফট্ করে একটা আওয়াজ। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল-গুলি! সামনের ভিড়টি সঙ্গে সঙ্গে ঢেউ তুলে পেছনের দিকে আছড়ে পড়ল। এবার যে যার ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে পড়োঞ্জ এরপর কথক সঙ্গী সহ পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুক্তি নেয়। একতলা থেকে সবাই জোটবদ্ধ হয়ে তিনতলায় জড়ো হয়। আর কেউ বাইরে আছে কিনা দেখে নিয়ে ওয়ার্ডের দরজা বন্ধ করে দেওয়াী হয়। ভারী ভারী লোহার খাট ফেলে দরজার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। খাট টেনে টেনে সিঁড়িটা নিচে থেকে ওপর অবধি জ্যাম করে দিয়ে একতলা দোতলা খালি করে দিয়ে সবাই চলে যায় তিনতলায়। সিঁড়ির মুখে মজুত করা হয় বোতল গোলাম আর ইটপাথর। ''ভয়ের মত সাহস জিনিসটাও যে ছোঁয়াচে'', ছুটে লোহার খাট টানতে টানতে বার বার কথাটা মনে হয়েছিল কথাকব। নাকি ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে পড়তে পেরেছিলাম এবং ঠিক সেই সময় সাক্ষাৎ ভয়ের কিছু ছিলনা বলেই নিজেকে আমার সাহসী বলে মনে হয়েছিল? নিজেকে নিয়ে নিজের সঙ্গে তর্ক করা, এই সময় থেকে শুরু হয় কথক চরিত্রে। তার মধ্যে ঘটে যায় ওলটপালট। তাই নিজেকে নিয়ে তার অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক ভয় সেবলে। ভয় আমার নিজেকে নিয়ে। এই উপন্যাসে সৃষ্ট চরিত্রের আত্মবিশ্লেষণের ভঙ্গি লেখক অরবিন্দের মধ্যে অসাধারণ শিল্প চাতুর্থে তুলে ধরেছেন। অরবিন্দ বলে আমাকে পেছন থেকে ধরে রেখেছে আমার দাদু। সষানের দড়ি দিয়ে বাঁধলেও কথা ছিল, দাদু আমাকে বেঁধেছে ভালবাসার মায়াডোরে। নইলে আমার তো আজ জেলে থাকার কথা নয়। পার্টি বলেছিল আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে। দাদু রাজি হয়নি। দাদু বলেছিল, আমি তো তোকে পার্টির কাজ করতে বারণ করছি না। ধরা পড়ে জেলে গেলেও আমার আপত্তি নেই। ইন্টারভিউ তো পাব। কিন্তু এই বার? দাদু বুঝুক, বাইরে আর ভেতরে কোনো তফাৎ নেই। যেদিন আমার লক-আপে যেতে অস্বীকার করলমা ঠিক সেই দিনই ছিল আমার ইন্টারভিউ। লুচি আর পায়েসের কৌটো হাতে নিয়ে আমাকে না দেখে কী মন নিয়ে দাদু ফিরে গিয়েছিল বেশ বুঝতে পারি। পরের দিন থেকে হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু হবে দাদু জানত। কিন্তু তার চেয়েও সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছিল পরের দিন। কারা যেন রাষ্ট্র করে দিয়েছিল যে, আমি মারা গিয়েছি। গুজবটা কি দাদুর কানে পৌঁছেছিল ? দাদু ,দাদু, দাদু! আচ্ছা দাদুকে সামনে খাড়া করে আমার নিজের দুর্বলতা কি আমি আড়াল করছি না? এই অনাবিল আত্মবিশ্লেষণ অরবিন্দ

চরিত্রটিকে পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে পথচলার ও জীবন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্যে বিকশিত হবার সুযোগ করে দেয়, শুধু জীবন নয়, জগৎ-প্রকৃতিকে দেখার মন ছিল কথকের। কথক প্রকৃতিকে ভালবাসতে জানে। কথক চরিত্রে গাম্যজীবনের স্মৃতি ও প্রকৃতি প্রেম একটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য সে মনে মনে ভাবে সকালে রোদের মধ্যে অনেকক্ষণ শুয়ে ছিলাম। খুব লোভ হচ্ছিল শুয়ে শুয়ে আকাশটাকে দেখবার। ছেলেবেলায় ঘাসে শুয়ে আকাশটাকে নিয়ে মনে মনে আমি খেলতাম। অনেকটা সিনেমা দেখার মত। চলন্ত ভেড়ার পাল, রাখল কত সব মজাদার মুখ উদ্ভট জানোয়ার। কিন্তু ন-নম্বরের মাথঅয় ছোট্ট একটা নীল ফালির মত আকাশ আর একটা চারাগাছ ছাড়া আঙুলের ফাঁক দিয়ে আর কিছু নজরে আসছিল না। মুঠোটাকে গোল করে দৃষ্টিটাকে চারা গাছে ফেলতেই বিরাট একটা গাছ হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল, কালীতলার সেই জঙ্গলের কথা। বছরে একটা দিন আমরা গাঁ সুদ্ধ সবাই সেখানে যেতাম বনভোজনে। সেই একটা দিন কোনো জাত মানামানি থাকত না। সবাই আমরা এক পঙ্‌ক্তিতে বসে খেতাম। বিল থেকে তুলে আনা হত পদ্মপাতা। পদ্মপাতার গন্ধটা নাকে এখনও লেগে আছে। বস্তুনিস্ট প্রকৃতি প্রীতি কথক চরিত্রের একটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সরাসরি প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে অনাবিল আনন্দ উপলব্ধি করেছেন। শঙ্করের মুখে অরবিন্দ একপ্রকার বা কথা শোনে ঘরে সঙ্গে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে অভিনব পদ্ধতিতে রান্না করা পক্ষর চরে মাঝিরা নাকি এক অদ্ভুত কায়দায় রান্না করে। শঙ্কর বলল টাটকা ইলিশ মাছ নেবে। তারপর কাটবে। উঁহু ছুরিবাঁটি নয়। ধারালো বাঁশপাতা দিয়ে। তারপর লঙ্কাবাটা নুন-হলুদ দিয়ে কলাপাতায় মুড়ে একটু গর্ত খুঁড়ে তার ভেতর রাখবে। ওপরে বালি চাপা দেবে। রান্না হবে রোদে তাতা বলিতে তেল তো ঐ ইলিশের গায়েই আছে। ভাতটাও ঐ বালির আঁচেই বঁধা হবে। ঐ ইলিশ দিয়ে ঐ ভাতের নাকি তুলনা নেই।

কথক অরবিন্দদের একটি গুপ্ত সমিতি ছিল। তার নাম কারখানা। তাদের মধ্যে গৌহরি সেই সমিতির নাম রাখতে চেয়েছিল খামার। কিন্তু এ নামে শেষে মার কথাটা থাকায় অরবিন্দ আপত্তি ছিল। জেলে বন্দী থাকলে বাইরের বন্ধু-বান্ধবের সম্পর্কে কি প্রতিক্রিয়া হয় অরবিন্দ চরিত্রের মধ্যে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। অরবিন্দ জেলে। সেবার হাঙ্গার স্ট্রাইক দশদিনে মেটে। বন্দী অরবিন্দ ভাবে আমার বন্ধুরা? কই তারা তো কেউ একটা চিঠি চাপাটি দিয়েও কোনদিন আমার খোঁজ নেয় না। পুলিশ পেছনে লাগবার ভয়? পুলিশ কি কচি খোকা? তারা জানে না, কোন্ কোন্ বন্ধুর বাড়িতে বসে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিতাম? ধরবার হলে এমনিতেই তাদের ধরত না? কিন্তু পরক্ষণেই তার হুঁশ হয়। বন্ধুদের প্রতি আমি অবিচার করছি। তাদের সকলেরই নিজের নিজের জীবন আছে। নিজের

নিজের সমস্যা আছে। এই দেড় বছরে আমিই কি চিঠি লিখে কখনও তাদের খবরা খবর করেছি? তাহলে? আসলে অভিমানটাও বন্দিদশা থেকে আসে। বাইরে হাসপাতালে থাকলেও ছেলেমানুষের মত এই রকমের একটা বায়না আমাদের পেয়ে বসে। আমি শহীদ। আমি গেলাম। আমাকে দেখো। এই রকমের একটা ভাব। এক কথায়, আমাকে নিয়ে আদিখ্যেতা করো। কথক নিজে বন্দী হয়েও বন্দী মনের অন্তর্লোকের কথা খোলা মনে তুলে ধরতে পেরেছেন। ঔপন্যাসিকের নিখুঁত আত্মবিশ্লেষণের শিল্পিত রূপ এখানে কথক চরিত্রের মধ্যে তুলে ধরেছেন। জেলে বন্দী একটি কয়েদি আবদুলের পকেটমারের সত্য মিথ্যা প্রসঙ্গে লেখক অকপটে কথকের নিজের কথা বলে - কয়েদিদের বলব কী, নিজের বেলাতেও তো সে জিনিস অহরহ দেখি। কোনো ঘটনা একটু দূরে গিয়ে যখন স্মৃতি হয়ে যায়, তখন আর সেটা ফটো থাকে না- অনেকটাই কল্পনায় আঁকা ছবি। সেটা আর তখন যদ্দৃষ্টং থাকে না। যখন সজ্ঞানে কিছু ঢাকবার জন্যে কিংবা জাহির করার জন্যে আমরা নয়কে হয় কিংবা হয়কে নয় করি, তখনই আসে মিথ্যের ব্যাপার। এই মিথ্যাকে বলার ও উপস্থাপনের শিল্প কুশলতায় পাঠকের মনে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে লেখক চরিত্রের স্মৃতিচারণাকে বিশ্লেষণ করেছেন। ঔপন্যাসিক পাঠকের মনে বৈচিত্র্য দানের জন্য কাহিনীর পরিপূরক হিসেবে উপকাহিনী সৃষ্টি করে থাকেন। 'হাংরাস' উপন্যাসেও একই উদ্দেশ্যে ঔপন্যাসিক বিভিন্ন ছোট ছোট গল্পের অনুসঙ্গ এনেছেন প্রাসঙ্গিক ভাবে। কথকের সঙ্গে জেলে বন্দী আবদুল। আবদুল নামের দুজন কয়েদি। দুজনই পকেটমার। এই পকেটমার চরিত্র দুটি মানুষের নানা জীবন অভিজ্ঞতার রূপ বৈচিত্র্য। প্রথম পকেটমারের গল্পে দেখা যায়আবদুলের জন্ম হিন্দু ঘরে। বাড়ি ত্রিপুরা জেলার কোনো গাঁয়ে। কথকের সামনে আবদুল তার পকেটমার হয়ে ওঠার কাহিনী বলে চলে। সে বলে, আমরা ছিলাম দু'বোন, এক ভাই। আমি বড়। আমাদের খুব ছোট রেখে বাবা মারা যায়। আমরা তিনজনেই ছিলাম পিঠোপিঠি। আমার তখনও ভাল জ্ঞান হয়নি। তাই বাবার কথা মনেই পড়ে না। মা-র কথা এখনও আমার মনে পড়ে। কিন্তু ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা আমার কাকা জ্যাঠারা মা-কে ঠকিয়ে জমি জায়গাগুলো হাত করে নেয়। মা এর ওর বাড়িতে কাজ করত। ঢেঁকিতে ধান ভানত। আর কাঁদত। মাকে কাঁদতে দেখলে আমার খুব মন খারাপ হত। না, খোদা নয়, আমি তো তখন হিন্দু ছেলে, মনে মনে ভগবানকে ডাকতাম। বলতাম, আমাকে তাড়াতাড়ি বড় করে দাও, ভগবান- গায়ে জোর দাও কাকা জ্যাঠাদের আমি মারব। শুনেছিলাম লোকে শহরে যায়। সেখান থেকে টাকা রোজগার করে বস্তা বস্তা টাকা বাড়িতে পাঠায়। মাকে বলিনি। একাই একদিন গ্রাম থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়েছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে কীভাবে কতদিনে একটা জাহাজঘাটের মত জায়গায় যে পৌঁছেছিলাম মনে নেই। এইটুকু মনে

আছে যে, রাত্তিরে ইলেকট্রিক আলোয় জায়গাটা ফুটফুটে হয়েছিল। তারপর এক ফাঁকে টুক করে একটা জাহাজে উঠে পড়েছিলাম। কী একটা যেন বড় নদী। কী বড় বড় ঢেউ। আমার খুব ভয় করছিল, কিন্তু আমি কাঁদিনি। তারপর কোথাও জাহাজ থেকে নেমে রেলগাড়িতে উঠেছিলাম। এসে নেমেছিলাম শেয়ালদায় সেটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে এর ওর বগলের তলা দিয়ে গলে প্ল্যাটফর্মের বাইরে কোনরকমে তো এলাম। রাস্তায় পা দিয়েই ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। চারপাশে সব দোকানপাট, লোকের ভিড়, গাড়িঘোড়া কেথায় যাব কিছু জানি না। বলতে গেলে তখন তো খুবই ছোট। ছয় কি সাত। আমি তো বড় রাস্তাটা ধরে সোজা হাঁটতে লাগলাম হাঁটতে হাঁটতে যখন মৌলালির মোড়ে পৌছেছি, তখন কোথাও কিছু নেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম। ঠিক সেই সময় দাড়িঅলা লুঙ্গিপরা একজন লোক এসে আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল খোকা, তোমার খিদে পেয়েছে? চলো, খাবে চলো। বলে দোকানে নিয়ে গিয়ে খাওয়াল। তারপর ওর ডেরায়। এই থেকে নাম হল আবদুল। সেই লোকটারই আবদুলকে মানুষ করল। পকেট মারতে শেখাল। সেই থেকে আবদুল শিখল কি করে পকেট মারতে হয়। পকেটমারের বিষয়টী পুরোটা ম্যাজিকের হাত-সাফাইয়ের মত। হল চোখে ধুলো দেওয়ার ব্যাপার। নজরটাকে সরিয়ে দেওয়া। এ-কাজে লোক চিনতে হয়। কার আছে কার নেই, চোখ মুখের ভাবেই বোঝা যায়। মানুষকে অন্যমনস্ক করার হাজার গন্ডা উপায় আছে। ধরুন, একজনের গলার নলী বরাবর বাঁ-হাত বাড়িয়ে দিয়ে আপনি দিব্যি বাসের রড ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার ডান হাতটা সেই ফাঁকে লোকটার বুকপকেট ফাঁক করছে। এখন তো আরও সুবিধে। ট্রামে বাসে যা ভিড়। পয়সা বার করতে গিয়ে বিশিষ্ট ভদ্দরলোকদের হাতও পরের পকেটে ঢুকে যায়। আর সুবিধে হয় কোনো লোক যখন ওঠে। প্যাসেঞ্জারদের অনেকেই তখন বেসামাল হয়ে পড়েন। আমাদেরও সেই মওকা আর একজন পকেটমারের গল্প অরবিন্দের আগের জেলে জানা। সে ছিল ও ফগজ চোর। সেই জেলে তার নাম আবদুল। খাস কলকাতায় তার নাম আবদুল। বজবজ মেটেবুরুজে তার নাম ফুলচাঁদ। একদিন হাসপাতালে একজন কমরেডকে দেখে ফেরার সময় কথক দেখে আমগাছের তলায় জুয়োখেলার দলের একজনের সঙ্গে আবদুল দাঁড়িয়ে। আবদুলই কথা বলছিল। কথক একটু এগিয়ে গেল। ইদুঁর পচা একটা বিশ্রী গন্ধ। সে যত এগোয় গন্ধটা ততই নাকে এসে লাগছিল। কথা বললে ভক্ করে কথকের নাকে এসে লাগে ইদুঁর পঁচা একটা বিশ্রী অসহ্য গন্ধ। কথা থামিয়ে দিলে গন্ধটা একটু কমে। কথকের ভাষায় এক মুহূর্তে আমার কাছে সব জল হয়ে গেল। আবদুল ওর লাইনে আবারও উঠবার চেষ্টা করছে। গলায় থলি পনাচ্ছে না। গন্ধটা কাঁচা অবস্থাতেই থাকে। পরে গলার ঘা শুকিয়ে থলি যখন তৈরী হয়ে যাবে, তখন আর বাইরে থেকে ধরাই যাবে না।

গলায় থলি থাকলে তার দাম আছে। টাকা পয়সা, সোনাদানা রাখা যায়। হাজার গা তল্লাসি করুক ধরতে পারবে না। এমন কী কেউ ঠেকায় পড়লে গুদাম ঘরের মত চড়া দামে থলিটাকে ভাড়াও দেওয়া যায়। এই দুটো চরিত্রে পকেটমারের জীবনও শিল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। সমাজ দায়বদ্ধ শিল্পীর নিষ্ঠায় গলায় থলে তৈরী মানুষটাও এক বিশেষ ধরনের মেহনন করে। মেহতন করে বিশেষ কৌশলে সাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে একটি পকেটমারও। জেলে বন্দী এই কয়েদিরা কথকের মুখে সমাজতন্ত্রের কথা শোনে, শোনে মার্কসীয় তত্ত্ব, শোনে শ্রেণী সংগ্রামের কথা। সে কথককে কথা দেয় যে, সে এবার ফিরে গিয়ে ওয়াগন ভাঙা ছেড়ে দিয়ে পার্টিতে নাম লেখাবে, অন্য পকেটমার অবদুলও এই শ্রেণী সংগ্রামের কথা শুনে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। সেকথক কে বলে - ভুখ হরতালের ওপর আপনি যে গানটা বেঁধেছিলেন সেটা আমি সাত নম্বরের মাস্টারমশাইকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছি। আমি বাইরে গিয়েই ওটা ছাদি ফেলব। লোকজনদের দেব। আরেকটা কথা, দাদাবাবু, আপনাকে বলছি, আপনি যখন বাইরে যাবেন, কাজকর্ম করতে গেলে তো টাকার দরকার হবে আপনি শুধু আমাকে একটা খবর দেবেন। এখানে পকেটমার চরিত্রদুটি অনেক উচুঁতে উন্নীত হয়। এখানে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে সমাজ বদলের প্রত্যয়। অশিক্ষিত, অর্ধ্য শিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মানুষ তার লেখনীতে হয়ে উঠে একই দলের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র। এখানে লেখকের জীবন দর্শনের প্রতিফলন। এদের জীবনের ঘটনার সত্য-মিথ্যা প্রসঙ্গে লেখক দার্শনিক ভাবনার আশ্রয় নেন। তিনি লেখেন এখন ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে, খাঁটি সত্যি বলে জীবনে কিছু নেই। প্রকৃতির কথা বলছি না। আমি বলছি মানুষের জীবনের কথা দড়িকে সাপ বলে আমি ভুল করছি। ভুল করে আমি ভয় পাচ্ছি। আমার ভয়টা যতক্ষণ সত্যি ততক্ষণ সাপটাই বা সত্যি হবে না কেন? শুধু নিজের কাছে নয়, পরের কাছেও? যে ওটাকে দড়ি হিসেবেই দেখছে, সে কেন এটাও ভাবে না যে, দড়িটাকে সাপ বলেও ধরে নেওয়া যায়? সত্যি আর মিথ্যের সম্পর্কটা বোধ হয় শুধু ঠোকাঠুকিরই নয়, দুটোর মধ্যে একটা ঠেকাঠেকি হওয়ার সম্পর্কও হয়ত থেকে যায়।ঞ লেখকের উন্নত সমাজভাবনা ও দার্শনিক চেতনায় পকেট মারের জীবন সমাজ সংগ্রামের শরিক হয়ে ওঠে।

কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশ যাই থাকুক, ছোটবেলা থেকে ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মনপ্রাণ জুড়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর কবিতা ও গানের ভক্ত ছিলেন তিনি। সেই রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রসঙ্গেও স্বাভাবিক ভাবে এসে যায় কথকের ভুখ হরতালের দিনগুলিতে। একদিন সকালে বেড়িও কিংবা গ্রামোফোনে বাজছিল রোদন ভরা এ বসন্ত, সখি কখনও আসেনি আগে। তাঁর ভাবনা হয় - এগান বাজানোর পেছনে নিশ্চয় কোনো ষড়যন্ত আছে। যাতে আমাদের মন আন চান করে।

যাতে বাঁচতে ইচ্ছে হয়। বাঁচবার জন্যে হাঙ্গার স্ট্রাইক ভাঙি।--- মনে আছে, একবার ভুল করার পর যখন নিভুলভাবে বুঝে গেলাম যে রবিঠাকুর বুর্জোয়া তাঁর লেখার বিরুদ্ধে আমাদের শ্রেণী সংগ্রাম করতে হবে, তখন ন-নম্বরের বিল্টুবাবুকে গিয়ে জিগ্যেস করেছিলাম, আচ্ছা তার মানে রবি ঠাকুরের গানুগলোও তো গাওয়া চলবে না? ভদ্রলোক মার্ক্সবাদের তত্ত্ব ভাল বোঝেন। ট্রেড ইউনিয়নের নেতা। জেল কমিটির সদস্য। কিন্তু মেকি কমিউনিস্ট নন। আমার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করেছিলেন, কেন? না গাইলে খুব কষ্ট হবে? আমার ঠিক উল্টো বরং গাইলেই বেশি কষ্ট হয়। শুনলে আরও। বিশেষ করে, যদি সেইসব গান হয় যা ছেলেবেলায় শুনেছি। বুকের মধ্যে হাঁচড় পাঁচড় করে। বুকের মধ্যে হাঁচড় পাঁচড় করে এবং মন কেমন করে? একা একা কোথাও গিয়ে বসতে ইচ্ছে করে এই মনোভাব প্রকাশে ঔপন্যাসিকের নিরপেক্ষতা শিল্পগুণের এটি একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

হাঙ্গার স্ট্রাইকের একদিন দুপুরে অরবিন্দের তন্দ্রায় একটু চোখ বুঁজে গিয়েছিল। দিনে দুপুরে দুঃস্বপ্ন দেখে। মনে পাপ বিস্তা করছে। তার নিজের ওপর ভীষণ রাগ হয়। নিজেকে শাস্তি দেবার জন্য টেবিলের ওপর প্রচন্ড জোরে ঘুষি মারে। কেননা তার ভাবনা হয় হাঙ্গার স্ট্রাইক ভেঙে বাইরে গেলে পার্টি তাকে তাড়িয়ে দিলে দিক। তাহলে সে দূরে কোন গ্রামে যাবে যেখানে কেউ তাকে চিনবে না। গ্রামে গিয়ে মাস্টারি নিবে। চাষীদের মধ্যে কাজ করবে। সমিতি গড়ে তুলবে। এ ব্যাপারে কাউকে না, এমনকি পার্টিকেও তোয়াক্কা নয়। কেবল আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিল শুধু একজন? আমার দাদু। অথচ আমি জানি, দাদু এখন দিবারাত্তির ভগবানকে ডাকছে। বলছে ঠাকুর তুমি আমার অরুকে গুলির হাত থেকে বাঁচিয়েছ, এবার ভালয় ভালয় হাঙ্গার - স্ট্রাইকটাও যেন ও পার হতে পারে। পার হতে পারে? তার মানে, মাঝরাস্তায় যেন ডুবে না যায়? ডুবে যাওয়া মানে হাঙ্গার স্ট্রাইক ছেড়ে দেওয়া? কিন্তু আমি যদি গিয়ে বলি - না দাদু, আমি ডুবিনি। হাঙ্গার-স্ট্রাইক ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। দাদু হাসবে। বলবে, রাখ রাখ। তোদের হাঙ্গার স্ট্রাইক তাহলে আজকেই মিটল? তোদের সবাইকে ছেড়ে দিল? জামাল বংশী সবাইকেই? আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দাদুর মুখ হঠাৎ কালো হয়ে গেল কেন? মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা হয়ে গেল কেন? মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বললেন - এসে ভাল করেছিস। এই শরীরে এখন আর বাইরে বেরোসনে। তাছাড়া তাছাড়া! তাছাড়া কী? আমি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি, দাদু কি তাতে খুশি নন? লোক লজ্জার কথা ভাবছেন? নিজেকে কেন আমি বাঁচালাম? দাদুর জন্যেই তো হঠাৎ গা ছাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। আর অর্ধচেতনে নিজ্ঞান মনে নিজের প্রাণের প্রতি মায়া এবং লোক লজ্জা ও দাদুর বিরোধ মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে লেখক তুলে ধরেছেন। এতে করে শিল্পচেতনা ও জীবন অভিজ্ঞতার যুক্তিনিষ্ট প্রতিক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

জেলে হাঙ্গার স্ট্রাইক করার সময় নিজের কাজের প্রতি মন থেকে জোর পাওয়ার জন্য অরবিন্দ ক্যাপিটাল পড়ে। কোন পুস্তক পাঠে পাঠকের ইচ্ছে এবং তন্ময়তার মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতার কথা বলেন ঔপন্যাসিক। এই সঙ্গে উৎপাদন ও শ্রমের পারস্পরিক সম্পর্কে ঔপন্যাসিক স্পষ্ট ধারণা দেন। তিনি লেখেন মানুষ আর প্রকৃতি, এই দুই শরিকে মিলে হয় খাটুনির ব্যাপারটা। মানুষ প্রকৃতিরই একজন হয়ে প্রকৃতির মুখোমুখি হয়, তার হাত পা মাথা - এসমস্তই প্রকৃতিদত্ত - সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতির জিনিসগুলোকে এমন করে সে বাগিয়ে নেয় যাতে তার নিজের অভাব মেটে। বাই প্রকৃতিতে হাত লাগিয়ে, তাকে বদলে সেই সঙ্গে মানুষ নিজের স্বভাবেও বদল আনে। নিজের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলে মানুষ তাকে মুঠোয় আনে।

মাকড়সাও জাল বোনে, মৌমাছিও বাসা বানায়। কিন্তু মানুষ যেটা করে সেটা আগে থেকেই তার মাথায় থাকে। তার হাতে পড়ে উপাদানগুলোর শুধু যে একটা গড়ন পায় তাই নয়? তার নিজের মতলব হাসিল হয়। তার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে যেভাবে যা করবার সে তাই করে। তার জন্য তাকে মনে প্রাণে হতে হয়। আর এই মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়ার ব্যাপারটা ক্ষণস্থায়ী হলে চলে না। কাজের সময় হাত পা তো তাকে চালাতেই হবে; কিন্তু শুধু তাতে হয় না। যতক্ষণ কাজ হবে ততক্ষণ তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রবল ইচ্ছেটাকে সমানভাবে ঠায় জুড়ে রাখতে হবে। তার মানে, রীতিমতো তন্ময়তা চাই। কাজের প্রকৃতি কিংবা কাজের ধরন মনকে যত কম টানবে খোশমেজাজে হাত পা চালাতে বা বুদ্ধি খাটাতে তত কম ইচ্ছে হবে ততই জোর করে কাজে মন বসাতে হবে। মার্ক্সের ওটাই ঠিক কথা। কাজটা কেমন, তারই ওপর মন লাগার ব্যাপারটা নির্ভর করে। বেশি জোরজার করতে গেলেই মন ভাঙে। কাজের সঙ্গে মনের সম্পর্ক বিশ্লেষণে লেখক অরবিন্দের 'ক্যাপিটাল' পাঠের প্রসঙ্গ যুক্তি দ্বারা উপস্থাপিত করেছেন। এখানে ছ-নম্বর সেলের বরুণ বাবুর সঙ্গে আলাল চারিতায় সমাজের সঙ্গে মার্কস্‌বাদের সম্পর্ক, সাহিত্যে মার্কসরাদ প্রয়োগের উদ্দেশ্য , সাহিত্যের সঙ্গে উদ্দেশ্য মূলকতা, সৃষ্টির সঙ্গে আনন্দ, আনন্দের সঙ্গে সংকল্প সম্ভাবনা, সৃষ্টি ও প্রাণের বিষয় ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। অরবিন্দের ভাবনার মধ্যে ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টি ও শিল্পবোধের পরিচয় নিহিত রয়েছে। মনের সঙ্গে বাইরের ঘটনার ও তত্ত্বের বিস্তর পার্থক্য থাকে। অরবিন্দ ফোর্সফিডিং এর সময় উপলব্ধি করে ভুখ হরতালের সময় জেলে জোর করে নলদ্বারা দুধ, ডিম ব্লান্ডি দিয়ে দেহে প্রাণের সাড়া জাগে এবং একটা অনিবর্চনীয় সত্য কিছু ঘটে যায়। ফলে আপাত দিক থেকে বন্দীরা ফোর্সফিডিং করাতে বাধা মিদলেও তাদের মন বাধা দিতে চায় না। নলের ভেতর দিয়ে পেটের মধ্যে দুধ যাওয়ার আরামের কথা বার বার মনে পড়ে অরবিন্দের নিজের ওপর নিজের রাগ হয়। সে

উপলব্ধি করে ভাল লাগাটা তার উচিত হয়নি। কেননা তাহলে সে ভেতরে ভেতরে চাইছিল যেখতে। এর জন্য ফোর্সফিডিং করার সময় তা করতে বাধা দিয়ে প্রায় কিছুত্ত করার কথা ভাবে অরবিন্দ।

অরবিন্দ হঠাৎ এক দিন জেলের মধ্যে পার্টির একটা সার্কুলার দেখে চমকে ওঠে। সার্কুলারে সোজসুজি লেখা তার এক সময়ের বিশেষ বনধ্বু সেকালের উদীয়মান কথাসাহিত্যিক মনীশ মজুমদার আর তার দলবল দালাল হয়ে গেছে। এককালের এম.এ ক্লাসের ব্লিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট, পাঠক স্কুলের সাড়া জাগানো কথাসাহিত্যিক অনেক অভাবের সময়েও পার্টি ছাড়েনি। অথচ পার্টিই একদিন হঠাৎ ওকে ছেঁটে দেয়। ওকে একা নয়, ওদের গোটা দলটাকে। ও তখন পার্টিতে গুপ্ত ধরনের কাজ করছিল। বাইরে সবাই জানত সে বসে পড়েছে। গোপন কাজে সেটাই রেওয়াজ । হঠাৎ দালাল হয়ে যাবার সার্কুলারে কথকের বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে ওঠে। তবুও বুদ্ধিজীবী মহলে সব কালে একশ্রেণীর মানুষ সমাজে দালাল হয়ে ওঠে। কথক ভাবে হয়ত মনীশ নিজে ওর মধ্যে ছিল না। তবুও দশচক্রে ভগবান ভভূত হয়। তাই কথকের বুক পরক্ষণে হিম হয়ে ওঠে - তাহলে কি কাউকেই বিশ্বাস করা যাবে না? কাউকে নয়? নিজেকেও নয়? কেননা মনীশের সঙ্গে তার অন্য সব বিষয়েই মনের খুব মিল ছিল। তাই দালাল হয়ে যাবার সার্কুলার পেয়ে অরবিন্দ মর্মে আঘাত পায়। যে কোন কারনে বুদ্ধিজীবী মহলে কেউ দালাল হয়ে গেলে তার সতীর্থদের যে প্রতিক্রিয়া হয় তার শিল্পিত রূপ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক এখানে। বর্তমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এই অনুষঙ্গ খুবই প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে ওঠে।

জেলের ভেতরের বড়মাপের বন্দী নেতা শিবশম্ভু হালদার এবং তার দিদিমাদের দেখে কথকের সত্যিকার কমিউনিষ্ট সম্পর্কে মনোভাব ও অবস্থান একটি অংশে সমম্পর্ক হয়ে ওঠে। কথক স্পষ্ট করে জানায় সন্ত্রাসবাদ আর সাম্যবাদ দুটো দু ধরনের আদর্শ। ব্যক্তিত্বের এই তফাৎ কি শুধু আদর্শ থেকে আসে? --- লোকের কাছে যেটাকে আমি মেলে ধরি, সেটা আমার বাইরের মানুষ। যতক্ষণ না পেছন ফেরা অমনি আমার ভেতরের মানুষটা বেরিয়ে আসে। সে তখন যা কিছু ভাল নিজের জন্যে তাড়াতে থাকে। পরের ছেলেকে রাস্তায় নামতে বলি, কিন্তু নিজের ছেলেকে বাড়িতে আগলে রাখি।

স্বভাবের এই একটা টান নিয়ে কেউ কথা তুললে বলব - ''সে দোষ আমার নয়। যে অবস্থায় আমি মানুষ, সেই অবস্থার দোষ। অর্থাৎ এই সমাজ ব্যবস্থার। তার মানে নিজেকে বদলাব না। তার বদলে দুনিয়াকে বদলে দেব। দুনিয়াকে বদলালে আপসে আমিও বদলাব তা হয় না। সত্যিকার কমিউনিস্ট হতে গেলে, কথায় আর কাজে এক হতে হবে। দিমিত্রিকের সেই কথাটা মনে পড়ল, কমিউনিস্ট হতে হলে চাই স্পর্ধা, চাই গোঁ, চাই নিজের বিশ্বাসের জোর জেলখানায় শিবশম্ভু হালদার

এলেন। তার আসাটাকে বলতে হয় আবির্ভাব। কেননা ,তার আসবার রাস্তার দুপাশে সেপাই কয়েদি সবাই দাঁড়িয়ে তাকে সেলাম করছিল। কায়েদিরা তাকে বলে দেবতুল্য লোক। জেলে থাকতেই সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে মার্ক্সবাদে তিনি বিশ্বসী হন। কথক তাঁকে মুগ্ধ নেত্রে দেখে। অথচ এই নেতার বাস্তব চরিত্র দেখে কথক রাগ ও স্থানীয় জর্জারিত হয়। যে জেলে কথক ও তার সঙ্গীরা সারবন্দী লোহার খাটে থাকে, সেই ঘরের এককোণে একটা চট-ঢাকা দেওয়া প্রস্রারের জায়গা। রাতিটাতে বিচ্ছিরি গন্ধ বের হয়। নিজেদের কিচেন ছিল না। স্নানের ব্যবস্থা বলতে সেই। তোল্ বাটি ঢাল মাথায়, গোছের। যেই জেলে শিবশম্ভু হালদার একজনকে সরিয়ে দখল করে একটা ভাল জায়গা। জেলে নিজেকে আলাদা করার জন্য খাটের চারপাশে খাটিয়েছেন ঘেরাটোপ। আসতে না আসতেই তার জন্য আলাদা রান্নার ব্যবস্থা। তিনি ফালতুদের দ্বারা নিজের পা টেপান। চলাফেরায় যেন জেলখানাটা তার জমিদারি। অথচ আর আগে পর্যন্ত কথক তাদের নেতা ও পার্টির সাধারণ কর্মীদের একই ভাবে থাকার কথা জানত। উভুয়ের মধ্যে কোনো তারতম্য থাকার কথা জানত না। হালদার মশাইকে দেখে কথকের বিশেষ অভিজ্ঞতা হল।

আর কথকের আমার একটি ভৎসনা কথককে ভীষণভাবে আঘাত করে। সে কালে খাওয়ার অভাবে দেশে খুব কষ্ট চলছে। তার দাদুর বাড়িতে দুটিমাত্র ছোট ছোট ঘর। কিন্তু লোক একগাছা। তার দাদুর এক বিধবা বোন, তার কাচ্চা বাচ্চা। প্রবাসী এক মাসির কলেজে পড়া ছেলে। বুড়ো বয়সে চাকরি খোয়ানো দাদুর ছেলেবেলার এক খেলার সাথী। কাজেই বাড়িতে তিল ধারনের জায়গা ছিল না। সেই বাড়ির তার দিদিমা বা আম্মার সঙ্গে বদল ও পড়ায় যত গরিব দুঃখীদের ভাব। কার ছেলের জামা নেই, তাকে তাদের পুরনো জামা দেওয়া, কারা ঠোঙা বানিয়ে সংসার চালায়। তাদের বাড়ির সমস্ত পুরনো কাগজ দেওয়া - এসব কাজ করতো সেই আম্মা। একদিন তার আম্মা মুন্সিগঞ্জের একটা ফ্যামিলিকে কালী ঘাটের রাস্তা থেকে তুলে এনেছে বাড়িতে। আম্মার কথা আমি বলে দিয়েছি বাইরের বারান্দাটায় থাকবে। নিজেদের রান্না নিজেরা করে নবে। তারপর যত তাড়াতাড়ি পারে নিজেদের একটা ব্যবস্থা করে বস্তিতে ঘর ভাড়া নেবে। কিন্তু ওদের আনার পর থেকে বাড়ির সবাই কথকের আম্মাকে কথা শোনাচ্ছিল। তার ভরসা ছিল অরু ও তার ছোট মামা। কেননা ওরা স্বদেশী করে। কিন্তু ওরা ও এটা জে দুজনে প্রায় এক সঙ্গে গলায় ঝাঁঝের সঙ্গে বলে - ''কিন্তু বারান্দাটা তো বাইরে নয়' এতে তার আম্মা গুম হয়ে বলেছিল এ বাড়িতে সব সমান। মনে মুখে কেউ এক নয়।' এই ঘটনায় কথক ও ঔপনাসিক দেখিয়েছেন প্রকৃত কমিউনিষ্টদের জীবনশৈলী ও আদর্শবোধ কেমন হওয়া আবশ্যক। যে জীবন শৈলী শিবশম্ভু হালদারের বা যে আচরণে আম্মা মর্মাহত হন তা মার্কসীয় আদর্শ নয়। সমাজ

ব্যবস্থায়, পদ্ধতিগত ত্রুটিতে মার্কসীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা এভাবে পদে পদে ব্যাহত হয় এই বিষয়টি উপন্যাসের অঙ্গ করে তুলেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

এই আম্মার কাছে কথকের ছোট মামা একদিন মারা গেল। যদিও এখনও সে বেঁচে আছে। লড়াই শেষ হতে না হতে সে কীভাবে কীভাবে যেন বিদেশ চলে গিয়েছিল সেখানে সে মেম বিয়ে করেছে সেই চিঠি আর ফটো আসার পরই চিঠিটাতে আগুন দিয়ে অরবিন্দকে তার আম্মা বলেছিল এই দ্যাখ মা হয়ে আমি মরা ছেলের মুখে আগুন দিচ্ছি। আম্মা চরিত্রের স্বদেশ প্রীতি ও জাতীয়তাবোধের গভীরতা খুব স্বল্প অবয়বে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ। অরবিন্দ সেই দাঙ্গার থেকে একটাই শান্তির জায়গা অরবিন্দ খোঁজেন সেটি শ্মশানে আম্মাকে কাঁধে নিয়ে শ্মশানে যাওয়ার সময় দেখলাম রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। মোড়ে মোড়ে পুলিশ। তারা আমাদের তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে যেতে বলল। শ্মশানে পা দিয়ে মনে হল বাঁচলাম- এতক্ষণে আমরা নিশ্চিন্ত। দেয়ালের এদিক ওদিক থেকেই গায়ে কাঁটা দিয়ে কখনও বন্দেমাতরম, কখনও আল্লাহু আকবর আওয়াজ ভেসে আসছিল। আম্মার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে দাঙ্গার প্রেক্ষিতে মানবিকতা মৃত্যু। এই মৃত্যু তাই উপন্যাসে আসামান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকময়তায় সার্থক মৃত্যু চেতনা হয়ে ওঠে।

কথকের কথায় ঔপন্যাসিক সমকাল বোধের পরিচয় দেন। শুধু জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষিত নয়। আন্তর্জাতিক বিশ্ব প্রেক্ষিত উপন্যাসে অসাধারণ শিল্পকুশলতায় পাঠকদের বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। সে সময় মার্কিন মুলুকে ধর্মঘটের ঢেউ ওঠে। বিদ্যুৎগতিতে হুড়ঘুড় করে এগিয়ে চলে নাৎসীরা। --- সেভিয়েটের একটার পর একটা জায়গা জার্মাণরা সত্যিই দখল করে নিচ্ছে। একেকটা শহর যায় আর আমাদের বুকে যেন একেকটা শেল এসে লাগে, রাস্তাঘাটে লোকে আমাদের ধরে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে নেয়। বলে কি হে লাল ফৌজ, তোমাদের বাপের দেশ তো এবার গেল। স্টালিন গ্রাড থেকে লড়াইয়ের তখন মোড় ঘুরে গেছে। একে একে জার্মাণদের হাত থেকে নিজেদের শহরগুলো কেড়ে নিচ্ছে লাল ফৌজ। সেটা ছিল ঐ ধরনের একটা জবর বিজয়ের দিন। নিশান দিয়ে চারদিক লালে লাল করে আমরা সভা করছি। সেদিন আমাদের সবাই আনন্দে নাচানাচি করছে। বিশ্ব মহা সংগ্রামের শরিক হয়ে ওঠে। সেভিয়েতের লাল ফৌজের সমেগ ভারতীয় সমাজতান্ত্রিকদের একাত্মতার শিল্পিত রূপ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। ঔপন্যাসিকের সমাজতান্ত্রিক চেতনা কথকের ভাবনার মধ্যে পরিস্ফুট হয়। কথক বলে দেশ চাইছে স্বাধীনতা। আমরা চাইছি জনযুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা। একদল বলছে, বিদেশী সরকারের কাছে আমরা নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছি। আমরা বলছি, সমাজতন্ত্র গেলে স্বাধীনতা থাকে না।

রাস্তায় মার খাচ্ছি, তবু বলছি দুনিয়ার মজুর এক হও। --- আমার তো মনে হয় শ্রেণী সংগ্রামও সেই জন্যে। যাতে শেষ পর্যন্ত সব মানুষের ভাল হয়। উৎপাদনের কলকাঠি যারা নিজেদের ট্যাঁকে পুরে রেখেছে, তারা চায় শুধু নিজেদের ভাল। দল বেঁধে জোর করে সেটা কেড়ে নিতে হবে, যাতে তার ওপর সকলের অধিকার বর্ত্তায়। একাজে সবার আগে থাকবে সঙ্ঘবদ্ধ সেই কাজের মানুষেরা, যাদের নিজের বলতে কিছু নেই। কিন্তু এতে আসবে মানুষের মুক্তি। লাভ নয়? ভোগ হবে লক্ষ্য। শুধু শরীরের সুখ নয়, মনের স্ফূর্তি। এখানে অরবিন্দ মার্কসীয় মতবাদে দিক্ষীত রাজনৈতিক কর্মী । রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে এখানে শিল্পীর সচেতন শিল্পনিষ্ঠা যুক্ত হয়েছে। লেখক রাজনৈতিক চেতনাকে এখানে শিল্পকুশলতায় উত্তীর্ণ করে তুলেছেন। অরবিন্দ ব্যক্তির গন্ডী উত্তীর্ণ করে এখানে একটি বিশেষ জীবনাদর্শের প্রতীক হয়ে ওঠেছে। এখানেই ঔপন্যাসিকের সার্থকতা। অরবিন্দের জীবনের কথা বলতে ঔপন্যাসিক তাঁর প্রেম ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসে প্রেম স্বাভাবিক নিয়মে অরবিন্দের জীবনেও দেখা যায়। কেননা সে সময় কমিউনিস্ট পার্টিতে বিয়ের একটা হুজুগ পড়ে গিয়েছিল। যদিও তার আগে পর্যন্ত পার্টিতে একটা চিরকুমার সভা বানানোর ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। বিশেষ করে যারা পার্টিতে হোল টাইমার তাদের বিয়েটা ছিল ব্রাত্য। এরপর ঠিক হয় সংসার থেকে, সমাজ থেকে সরে যাওয়া নয়, গৃহী হয়ে সমাজের সঙ্গে নিজেদের জুড়ে দেবার পালা শুরু হয়। একা পার্টির লোক হওয়া নয়, গড়তে হবে পার্টি পরিবার। ধীরে ধীরে অরবিন্দ উপলব্ধি করে তাকেও একজন জীবনসাঙ্গিনী পাওয়া দরকার। এরপর পার্টিতেই প্রতিমা নামে একটি মেয়ের প্রতি অরবিন্দ প্রেম উপলব্ধি করে। তার এই প্রেম ভাবনার গভীরতা। সেই প্রতিমাকে কয়েকদিন মিটিঙে দেখে অরবিন্দর একটু মন টলেছিল। অরবিন্দর মনে হয় মেয়েটি বেশ তো দেখতে। অরবিন্দর তখন সারা শরীরে একটা শিহরণের ভাব। সে প্রতিমাকে নিয়ে বিপ্লবের সব দুঃখ বরণ করে নেবার স্বপ্ন দেখে। প্রতিমার পাইক পাড়ার বাস আসছে দেখে হঠাৎ মরিয়া হয়ে সে বলে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। এর প্রতিক্রিয়ার কথা অরবিন্দ নিজে ব্যক্ত করেছে শেষ পর্যন্ত মুখ ফুটে বলতে পেরেছি, এতেই তখন আমি খুশিতে ডগমগ হয়ে আছি। ভিড় ঠেলে আপিসে ফিরে গেলাম যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম আচ্ছা, বিয়ে করা মানেটা কী? ঘর বাঁধা। তা মানে, ঘর ভাড়া করা। বাজার করা, রান্নাবান্না ইস, এ-সময় আম্মা বেঁচে থাকলে খুব ভাল হত। আচ্ছা, একটা সংসার চালাতে কত টাকা লাগে? পরদিন অন্যদিক তাকিয়ে তার হাতে একটি কাগজ গুঁজে দিয়ে চলে যায়। অরবিন্দ একটি বাথরুমে কাঁপা হাতে চিঠিটি খোলে। গোড়ার লাইনে চোখ পড়তেই এক ফুঁয়ে কেউ যেন তাকে নিবিয়ে দেয়। সে লেখে কমরেড, মনে কিছু করবেন না। আপনাকে পছন্দ করি

কি একজনকে ভালবাসি। আশা করি, আপনার বঞ্চিত হব না। সেই সঙ্গে কামনা করি, পাপ জীবনের যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক। বিপ্লবী অভিনন্দন সহ। এই চিঠি সম্বন্ধে অরবিন্দের মুখে ঔপন্যাসিক ব্যর্থ প্রেমিকের হতাশাকে একটি আঁচড়ে তুলে ধরেছেন। অরবিন্দর চিঠিটা পড়ে নিজের ওপর অসম্ভব রাগ হল। এভাবে বোঝে মাথায় কেন নিজেকে খাটো করতে গেলাম? মেটেটি আমার সম্বন্ধে কী বিশ্রী ধারণা করল? ভাদ্র মাসের কুকুর নাকি আমি? সে সঙ্গে একটা মজুর বিষাদ আমার মন ছেয়ে ফেলল। মধুর কেননা একটা ব্যথার জায়গা থাকলে তারও আলতো করে আঙুল বোলাতে ভাল লাগে। একটি উপমা দ্বারা ঔপন্যাসিক মধুর বিষাদের উপলব্ধি বিশ্বাস্যভাবে তুলে ধরেছেন। সেই প্রসঙ্গে প্রতিমা নামের তার বাল্য প্রেমের স্মৃতি মনে আসে। অরবিন্দ বলে ঐ প্রতিমা আমাদেরই ক্লাসে পড়ত। প্রফেসরের টেবিলের মুখোমুখি আমরা। তাঁর ডান দিকে মেয়েরা আমরা কয়েক জন বসতাম পেছনে। মেয়েদের দিয়ে তাকাতাম। তার মধ্যে বিশেষ করে একটি মেয়ে। তারই নাম প্রতিমা। যাকে হরিণ চোখ বলে, ঠিক সেই রকম। কিছু দিনের মধ্যে আমরা আবিষ্কার করে ফেললাম যে, প্রতিমাও আড় চোখে আমাকে দেখে। এটা নাকি আরও বোঝা যায়, যেদিন ক্লাসে আমি থাকি না। আস্তে আস্তে এমন হল যে, ক্লাসে আমি সারাক্ষণ প্রতিমার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতাম। প্রতিমা তো মেয়ে ওর পক্ষে সম্ভব হত না। তবে মাঝে মাঝে চোখের চাউনিতে বুঝিয়ে দিত যে, এই লুকোচুরি খেলায় তারও মজা লাগছে। নাটক ক্রমে জমতে চলেছে। আলাপ কর। অন্য মেয়েরা আমাকে আর প্রতিমাকে নিয়ে খোশগল্প জুড়েছে, এটা বুঝতাম ওদের গা টেপাটেপি করে হাসবার ধরণ দেখে প্রতিমাও ক্লাসে গিয়ে প্রথমেই আড়চোখে খোঁজে অরবিন্দকে। এরপর অরবিন্দ ক্লাসের বাইরে প্রতিমা ধরবার কথা ভাবে। কিন্তু সে রোজ গাড়িতে আসে না। তাকে একদিন আলিপুরের ট্রামে দেখে, বাস থেকে নেমে সে ও ট্রামে চাপে। এত বুঝে যায় যে প্রতিমা কোন স্টপ থেকে গাড়িতে ওঠে। এরপরে প্রতিমাকে সে সেই স্পটো পেয়ে যায় । কিন্তু তার মনের কথা আর খুলে বলা হয়ে ওঠে না। এরপর প্রতিমাকে সে আর স্টপে দেখতে পায় না। প্রতিমা ক্লাসেও আর আসে না। তারপর নাগ নাম দিয়ে টেলিফোনের বইতে আলিপুরের সমস্ত নম্বর খুঁজেও প্রতিমার হদিশ পায় না। শেষ কালে যে ভাসা ভাসা একটা খবর পায় যে প্রতিমা রাঁচির মেয়ে। আলিপুরের এক মেসোমশাইয়ের বাড়িতে থাকত। কিন্তু কলকাতায় বোমা পড়ার ভয়ে ওর বাবা নাকি ভয়ে কলকাতায় নাম কাটিয়ে রাঁচি চলে যায়। ফলে তার প্রেমের প্রতিমার ক্ষেত্রে একেবারে বোধনেরই ভাসান হয়ে যায়। কৈশোর ও যৌবনে ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার মাঝে প্রেম বিষয়কে ঔপন্যাসিক বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে শিল্পিত রূপ দেন। প্রেমের শুরু প্রেমের মাঝে ও

প্রেমের ব্যর্থতায় প্রেমিকের মনের গোপন কথা যুক্তি সহ মনস্তাত্ত্বিকের নিরিখে তুলে ধরেছেন লেখক। প্রেম ভাবনার কথায় 'হাংরাসে' উপন্যাসেক শিল্পদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

অরবিন্দ ছিলেন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। মাঝে মাঝে তার নিজেকে নিয়ে ভয় হয় মধ্যবিত্তীয় স্বভাবের জন্য। ভয় হয় হাঙ্গার স্ট্রাইক করার ক্ষেত্রে তার নিজের আত্মবিশ্বাসের প্রতি। এর মধ্যে একজন হাঙ্গার স্ট্রাইক ভেঙেছে। সে মাঝারি চাষী, কিন্তু খেতমজুর নয়। যেহেতু সেও মধ্যবিত্ত ঘরের এজন্য তার নিজেকে নিয়ে সন্দেহ। কেননা, যে শ্রেণীতে সে জন্মেছে সে শ্রেণীর দোষ আছে, না এদিক, না ওদিক। সব সময় একটা দোটানা ভাব। এরা পাহাড়ে একটা জায়গা থেকে ঢাল বেয়ে ক্রমাগত চেষ্টা করছে ওপরে উঠতে। দু-চারজন ঠেলাঠেলি করে এর ওর ঘাড়ে পা দিয়ে উঠেও যাচ্ছি। কিন্তু বেশির ভাগই পা জড়কে একেবারে নিচে পড়ে যাচ্ছে। সমাজের মধ্যেবিত্ত শ্রেণীর সমাজ মানসিকতা নিখুঁত পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক এখানে তুলে ধরেছেন। অরবিন্দর দাদুও ওপরে উঠতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাউকে ঠেলতে কিংবা কারো ঘাড়ে পা দিতে রুচি হয়নি তাঁর। তাই যেখানে ছিলেন, সেখানেই থেকে যান। সে বাজারে একই বাজারে থাকার অর্থ নিচে নেমে যাওয়া।

অরবিন্দ তার মা-বাবার চেয়ে দাদু দিদা ও আম্মার কথা বেশি করে বলে। কেননা সে বলে যে জন্মের দিক থেকে সে একজন হতভাগ্য। সে বলে আমার জন্মের পরই আমার মা মারা যায়। আমাকে মানুষ করেছে দিদিমা। দিদিমা আমার কাছে ঠিক মা-র মত। ছোটমামা আমার চেয়ে বেশি বড় নয়। দিদিমার কোলের ছেলে বলেই বোধ হয় ছোটমামার সঙ্গে আমার হিংসেহিং সিটা একটু বেশি ছিল। আমার মা আমার মা বলতে বলতে ছোটমামা আমি-দিদিমা হয়ে গিয়েছিল আমাদের দুজনেরই আম্মা। --- আমার বাবা ছিলেন রেলের গার্ড। জ্ঞান হয়ে মা-কে দেখিনি। গোড়ার ক-বছর বাবা মাঝে মধ্যে মামার বাড়িতে আসতেন। আমার জন্যে নানা রকম খেলনা আনতেন।

বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল জিনিস বাগানোর আমার কাছে বাবা ছিলেন কিছুটা দূরের মানুষ। বাবাকে পছন্দ করতাম। কিন্তু ভালবাসতাম দাদু কে। --- বাবা যে পরেবিএ করেছিলেন, সেটা দাদু দিদিমারই মত নিয়ে। বিয়ে করেছিলে এক অবস্থায় বাপের একমাত্র মেয়েকে। কিন্তু এবার আর ছেলে হয়ে নয়, ছেলে পেটে নিয়েই ছোট মা মারা গেলেন এরপর বাবা নাকি খুব মদ খেতে শুরু করে দিলে এমন খাওয়া যে, মদ খেয়ে চুর হওয়া অবস্থায় অ্যাকসিডেন্টে গলাকাটা বাবার দেহটা নাকি দূরের এক রেললাইনে পাওয়া যায়। এই বিষয়টায় তার মনে একটা সন্দেহ ছিলই । তার বাবার মৃত্যুটা কি সত্তাস্থায় রেলে কাটা পড়ে? না আত্মহত্যা? না তার পেছনে ছিল কোন বিষয়লোভী খুনীর হাত ছেলে বেলা থেকে সে এবিষয়ে নানা জনের নানা কথা শুনে এসেছে, তার আম্মা বলত সব কিছুতেই ওর

ছিল বাড়াবাড়ি বেহিসেবির চূড়ান্ত। রেলের গার্ড আর তুই নিজেকে একটু গার্ড করে চলতে পরলি নে? তার দাদু বলত যদি অ্যাকসিডেন্টই হবে, তাহলে বলতে হয় নেশার ঘোরে রেল লাইনে ও গলা দিয়ে শুয়ে ছিল। তা কখনও হয়?'' তার দাদুর এক উকিল বন্ধু বলেছিল, ব্যাপারটা অত সহজ সরল নাও হতে পারে। ওর এ বউ তো শুনেছি বাপের এক মেয়ে ছিল। বাপের নাকি যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি। কাজেই বিষয়ের লোভে জামাই বাবাজিকে কেউ পথের কাঁটা বলেও তো মনে করতে পারে? সে যে কারণই হোক গর্ভধারিণী মা ও জন্মদাতা পিতার থেকেও তার দাদু আম্মা ছোট মামা চরিত্র তিনটি তুলনায় তার জীবনের ও বোধের সঙ্গে অধিক প্রভাব যুক্ত চরিত্র। তার চরিত্রের দর্শন, মূলত দাদু ও আম্মাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যাদের কাছে যে পরিবেশে অরবিন্দ বেড়ে উঠেছে তাদের প্রভাব তার কাছে অনেক খানি।

এক সময় অরবিন্দ খিদিরপুর ডকে যাতায়াত শুরু করে। সে কাজ করে লেবার পার্টিতে কিন্তু মজুরদের মিছিলে থাকে। পাশ দিয়েছাত্ররা মিছিল করে গেলে কমিউনিস্ট পার্টির চেনা বন্ধুদের দিকে সে তাকায় করুণার চোখে। এবং সে মনে মনে ভাবে ওরা সব মজুর শ্রেণীর কথা বলে। কিন্তু ওদের পার্টিতে মজুর নেই। পেটি-বুর্জোয়ায় ঠাসা। এটা প্রথম বলে কমরেড তেওয়ারি। তিওয়ারি বলে,কমিউনিস্ট পার্টির সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে আসলে ওরা চালাচ্ছে ভেজাল মার্ক্সবাদের কারবার। আসল বলশেভিক আমরা। ওরা বুর্জোয়াদের হাতধরা হয়ে চলতে চায়। তাই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ওদের মানে না। কোথাও ভারতীয় পার্টির নাম পর্যন্ত করে না। আমরা বসে নেই। পোর্টফোলিওতে করে থিসিস নিয়ে আমাদের লোক বিলেতে গেছে। এবার এখানকার গোটা ব্যাপারটা ওরা জানতে পারবে। আমরা মামলা রুজ করে দিয়েছি। রায় আমাদের পক্ষে যাবে। তখন ঐ সাইনবোর্ড আমরা পাব।' এই অংশে ঔপন্যাসিক ভেজাল মাক্সবাদ পেটি বুর্জোয়া ও পার্টির অন্তকোন্দলকে উপন্যাসের অঙ্গ করে তুলেছেন। এবং সমকালীন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় কমিউনিষ্টদের ধারণাকে এখানে তুলে ঔপন্যাসিক পার্টির অবস্থানের সত্য ছবি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। লেবার পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃত্বের কলহ ঔপন্যাসি ব্যক্তিজীবনেও দেখেছেন। সেটাকে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করে তুলেছেন।

সে সময় কমিউনিস্ট পার্টিতে এক শ্রেণীর উগ্র-জাতীয়তাবাদী কর্মকান্ড চলেছে। এই দলে ছিল উমা। সে আন্দামান বন্দীমুক্তি আন্দোলনে পুলিশের লাঠি খেয়েছিল। সে লোক বসে সিগারেট খায়, রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে যায় শালা হারামি বলে গালিগালাজ করে। একদিন অরবিন্দের পেটে আঙুল দিয়ে খোঁচা মেরে উমা বলে -গরু খেয়েছেন? সে খায়নি শুনে উমা তেওয়ারিকে বলে ওকে এক্ষুনি শিককাববা খাইয়ে দাও গরুর কথা শুনে অরবিন্দ তাড়াতাড়ি বলে - আজ আমার পেটটা খুব খারাপ।

উত্তর শুনে উমা হো হো করে হেসে বলে গরু শুনলে সব হিন্দু কমরেডেরই পেট খারাপ হয়ে যায়। সে সময়ে ভারতীয় বামপন্থায় উগ্র নীতির এক সার্থক দৃষ্টান্ত উমা। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক দল বদলের দল ছাড়ার আত্মপক্ষ সমর্থন অরবিন্দের মুখে প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে লেখকের আত্মবিশ্লেষণ জাত প্রতিক্রিয়া এই অংশে পাই। পুরনো দল ছাড়ার পেছনে কি আমার ছোট দল থেকে বড় দলে যাবার লোভ একেবারেই ছিল না? আর দল ছেড়েছিল কি নিছক মতে মিলল না বলে -- দল যত ছোটই হোক, ছাড়া সহজ নয়। বড় দল যত ছোট হয়, ছাড়াটাও হয় তত কঠিন দলবদলের ব্যাপারটাও ঘটে ঠিক হয় উল্টো। যে পার্টি যত বড়, তার সঙ্গে নতুন করে নিজেকে মানানো ব্যাপারটাও হয় তত শক্ত।

হাঙ্গার স্ট্রাইএ কারণে জেলে গিয়ে অরবিন্দের জীবনে নানা অভিজ্ঞতা হয়। কমল নামে ব্যক্তির সঙ্গে অরবিন্দের প্রথম দেখা হয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। কমল ছিল মহাপেটুক। সে ছিল প্রেসিডেন্সির নামকরা ছাত্র। সে ম্যাট্রিকে প্রথম দশ জনের মধ্যে ছিল। সে ইউনিয়ন করে। বাইরে কাউকে কাউকে অরবিন্দ বলতে শোনে,পার্টি করলেও ভেতরে ভেতরে কমল পুলিশের মানুষ। একথা শুনে অরবিন্দের ভেতরে ওলট পালট হয়ে যায়। সে ভাবে কমল যদি পুলিশের লোক হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তো দুনিয়ায় কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। বংশী তো ছার এমনকী নিজেকেও নয়। কথকের সঙ্গে পরিচয় হয় এক বুড়ো কয়েদির। তার নাম শেখ বাঙাল। এই শেখ বাঙালের সঙ্গে সংযুক্ত হয় জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশবন্ধুর বন্ধীকাহিনী দেশবন্ধুর জেলে বন্দী বিষয়টি প্রথম যুক্ত হয় একটা সময়কে বোঝাবার জন্য। কথকের কথায় দেশবন্ধু যখন জেলে ছিলেন ওর জেলখাটা তখন থেকেই শুরু হয়েছে। সেই যে জেলে আসা ধরেছে আর ছাড়েনি। সেই যে পকেট মার হয়ে জীবন শুরু করেছিল, আজও সেই পকেট মারই থেকে গেছে। কথক জেলে গল্প শোনে হামিদের মুখেই তার গল্প। হামিদ ছোকরা ধরনের ভিন্ন প্রকৃতির চোর। যারা হজ করতে যায়, তাদের টাকা পয়সা হাতানোর ব্যাপারে একদল বিশেষ চোর থাকে, হামিদ সেই দলের একজন বড় চোর আরওই দলে ছিল হরি। তার সম্পর্কে কথক বলে হরি আসলে আরও বড় চোর। আমাদের মন গুলোকে চুরি করে নিয়েছিল। আমরা জানতাম রেলে বিনা টিকিটে ধরা পড়ে হরি জেলে এসেছে। হরি শুধু যে অমায়িক সজ্জন চটপটে তাই নয়, হরি সব সময় আমাদের সবাইকে যেন বুকে করে আগলে রাখত। নইলে কোনো ফালতুকে কি ডেটিনিউ বাবুরা ঘটা করে ফেয়ারওয়েল দেয়। যার মা আছে উজাড় করে উপহার দেয়? এমনকী চোখ পর্যন্ত ছলছল করে? হরি ছিল আমাদের কাছে এ সমাজের অবিচারে একজন নিরীহ ভালমানুষের সাজা পাওয়ার দৃষ্টান্ত।

জেলে ফোর্সফিডিংসের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় অরবিন্দর। নাকে নল ঢোকানের বিষয়ে তার কখনো কখনো ডাক্তারের ওপর রাগ হয়। আসলে কাজটা ডাক্তারবাবু তেমন মন দিয়ে করছিলেন না, তার আসা বসা যাওয়ার মধ্যে ছিল একটা দায়সারা ভাব। আজ এই প্রথম ফোর্সফেডিংয়ের সময় আমার ভয় হল। নল ঢোকাতে গিয়ে ফুসফুস ফুটো হয়ে, শ্বাসনালি বন্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিংবা ভুল জায়গায় দুধ গিয়ে নিউমোনিয়া হয়ে অতীতে কম বন্দী মারা যায়নি। ---- কাজেই ব্যথা পেয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ভয় পেয়েছিলাম। লাকি এর সবটাই জেল কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাকৃত? যখন ওরা দেখছে, না খাওয়ার দরুণ যে ভয়, সে ভয় দেখিয়ে আর কাজ হচ্ছে না। তখন এবার দেখাতে শুরু করেছে খাওয়ানোর ভয়। --- মরে গেলেও নিজের কাছে একথা স্বীকার করতে পারব না যে, আমি মরতে ভয় পাই। সেটা হবে মাথা নিচু করার, হেরে যাওয়ার ব্যাপার। আমি ভয় পাই, এ-দুটো এক নয়। প্রথমটার মধ্যে আছে একটা তাৎক্ষণিকতা আর দ্বিতীয়টার মধ্যে আছে পরিণাম। কিন্তু যখন বাঁচার কথা ওঠে? যখন বলি, আমি বাঁচতে চাই? এই খানেই মজা মরতে ভয় না পেয়েও বাঁচতে চাওয়া যায়। ফোর্সফিডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের জীবন মৃত্যু ও ভয় ভাবনা। লড়াই পরিস্থিতিতে কিভাবে সংগ্রামীদের লড়াইটা একটা নিছক পরিণত হয় ঔপন্যাসিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্বাস্য করে তুলেছেন এখানে।

অরবিন্দর লড়াই করতে করতে মনে হয় এই লড়াই কেন কিসের জন্য তার মনে হয় আমাদের দেশ স্বাধীন হয়নি। সাম্রাজ্যবাদ ভোল বদল করেছে মাত্র। --- এ দেশের বুর্জোয়ার বরাবরের মত সাম্রাজ্যবাদের দলে ভিড়ে গেছে। তা তো হবেই, ওরা যে দেশের সর্বহারাদের অনেক বেশি ডরায়। এই একই ভয় থেকে ওরা বিপ্লবীদের অন্য কোথাও পাঠাতে চায়। কোনো দূরের জায়গায় আত্মীয় বন্ধুদের থেকে ছিনিয়ে রাখতে চায়। বক্সার জেলে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা হয়। ব্যক্তি জীবনের জেলের অভিজ্ঞতা প্রাসঙ্গিক রূপে উপন্যাসের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। বিপ্লবীরা সংগ্রামী জনতার কাছাকাছি থাকার প্রয়োজনে দূরের জেলে না যাওয়ার জন্য লড়াই করে। কিন্তু সরকার উপলব্ধি করে বিপ্লবীদের জনবিচ্ছিন্ন করার। সর্বহারার লড়াইয়ে বিপ্লবী নেতাদের সর্বহারা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সরকারের এই কৌশল। এই সর্বহারাদের শ্রেরী বিন্যাসে ঔপন্যাসিকের সমাজতাত্ত্বিক যুক্তিনিষ্ঠার নিখুঁত বিশ্লেষণ লক্ষণীয় বিষয়।

অরবিন্দ যখন বাদশার পারিবারিক দৈন্য দশার সঙ্গে তার দাদুর আর্থিক অবস্থার তুলনা করে বলে- বাদশা শ্রমিক বটে কিন্তু নিঃস্ব নয়। ওদের নিজেদের ঘরভিটে আছে। সেদিক দিয়ে বড়াই করতে পারি আমি। বিষয়সম্পত্তির বালাই নেই। মাসোহারা পেন্সনটা বাদ দিলে আমার দাদুও সর্বহারা।

আমাদের নিজেদের ঘরভিটে বলেও কিছু নেই। কিন্তু মাথার কাজ। আর হাতের কাজ। ঐখানেই হয়ে যায় শ্রেণীর তফাত। ভিটেমাটি শুণ্য সর্বহারাদের শ্রেণী বিন্যাস ঔপন্যাসিক যুক্তিসহ নির্ণয় করে তাঁর সমাজ সচেতনতার দৃষ্টান্ত রেখেছেন। জেলে বন্দী অরবিন্দর কাছে পার্টির লাইন নির্ভুল বলে মনে হয়। আর পার্টির লাইন ঠিক আছে বলেই ইংরেজ চলে যাবার পর এখন আমরা আর পরের দিকে তাকিয়ে নেই। এখন আমরা নিজেদের দিকে তাকাতে শিখেছি, নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছি। এখন আমরা শুধু বর্তমান নয়, অতীতকে বিশ্লেষণ করে খুঁড়ে খুঁড়ে যা গ্রহণ করার করছি এবং যা ছুড়ে ফেলার ফেলছি। অরবিন্দ ভাবে পার্টির সংস্কারবাদ ত্যাগ করে আমরা যদি পার্টির লাইন মতো চলতে পারতাম তাহলে হয়তো স্বাধীনতা জিনিসটা ভিক্ষের দান হিসেবে পেতাম না ঞ্চআমরা পেতাম সশস্ত্র লড়াই করে বীরের ভোগ্য স্বাধীনতা । ইংরেজকে তাড়িয়ে তাহলে আমাদেরই হাতে ক্ষমতা আসত। দেশের পুরো চেহারাটাই যেত বদলে। দেশ ভাগ হত না। হিন্দু মুসলমানে কাটাকাটি হত না এই উক্তি দ্বারা অরবিন্দের প্রকৃত স্বদেশ প্রীতি ও জাতীয় বোধের পরিচয় পাই অরবিন্দ ধর্মীয় বিভেদ নীতিকে ঘৃণা করত এই সত্যের পরিচয় আমরা এখানে পাই।

অরবিন্দ চরিত্রে সত্যনিষ্ঠা একটি বড় গুণ। সে যে নিজেকে উল্টে পাল্টে দেখে। এর মধ্যে তার কোন অপরাধবোধ নেই। সে জানে যে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে। তাই খাওয়া বন্ধ করলে মানুষ তার মুখে অনেক লাফঝাঁপ, কিন্তু তার সমস্ত তড়পানি মনে মনে। সে বসে বসে জেলের ভেতরে ডাইরি লেখে। সে বলে লেখার একটা ধর্ম আছে। ঞ্চমনে মনে যা হয়, লেখবার সময় তা হুবহু এক হয় না। শুধু যে কাটছাঁট হয় তা নয়, লিখতে গিয়ে মনের ভাব বদলে যায়।

জেলে আসার আগে খাবার এবং পেটের বাড়তি গুরুত্বে তার খুব বিচ্ছিরি লাগত, কিন্তু জেলে হাঙ্গার স্ট্রাইকে এসে সে মানুষের জীবনে পেটের গুরুত্ব কতটা উপলব্ধি করতে পারে। তার সত্যি কথা বলেই মনে হয় যে দুনিয়ায় পেটই সব। মনে হয় সবাই যদি পেটে কিল মেরে বসে থাকে তাহলে কী দশা হবে এই দুনিয়ার? হাঙ্গার স্ট্রাইক মালিক হয়ে মনে মনে সে ভাবে জেল থেকে বেরিয়ে সে অনেক কিছু খাবে। সে ভাবে জেলের বাইরে গিয়ে খাবে বখালের চাপ, আমজাদিয়ার বোঝা মসল্লা, মোল্লারচকের দই, বাগবাজেরের তেলেভাজা, বড়বাজারের হিং দেওয়া কচুরি, নারকেলের দুধে রান্না ভাত, নারকেলের মালার ভেতর পুরে ওপরে মাটি দিয়ে বন্ধ করে উনুনের তলায় রেখে দিয়ে গমসের আঁচে ঝলসানো বিড় চি, মনে হয় পাইকপাড়ার কাকিমার হাতে চিংড়ি মাছের ঝাল খাবে সে। মনে হয় দাজিলিং-এ কনফারেন্সে গিয়ে জীবনের প্রথম ডালমুট খাবার কথা। হাঙ্গার স্ট্রাইকের সময় খাবার কথা ভাবাটা নিয়ম বিরুদ্ধ । পার্টির নিয়ম অগ্রাহ্য করে জীবন ও জগতের সত্যকে উপলব্ধি করে অরবিন্দ।

জেলের ভেতরে অরবিন্দর মনে হয় পার্টির দলাদলির কথা। কমরেড চৌধুরীর সঙ্গে হরেনবাবু ও জিতেনবাবুর দলাদলির বিষয় অরবিন্দ বুঝতে পারে। পার্টিতে দলাদলি আছে, প্রথম যেদিন সেটা সে ধরতে পারে সেদিন খুব মন খারাপ হয় তার। জেলে বসে পাটির কাগজের জন্য তার মন খারাপ হয়। পার্টির কাগজ তার জীবনের কতখানি তা তার একটি উক্তিতে স্পষ্ট হয়। সে বলে পার্টিতে কাগজ আর আমি এক সঙ্গে বেড়ে উঠেছি। চৌধুরী আমার পেটিবুর্জোয়া অভিমানকে মেরে মেরে কাগজের কাজ শিখিয়েছেন। আপিসঘর ঝাঁট দেওয়ার কাজ এমন কিছু নয়। নেতারাও দিয়েছেন। কিংবা কাগজ ভাঁজ, বান্ডিল করা, ঠিকানা মারা, টিকিট সাঁটা এসব করেছি সবাই একসঙ্গে। কিন্তু ছাপা খানা? প্রুফ দেখা, মেকআপ করা, বাদ দেওয়া, ঢোকানো ছবি তোলানো, ব্লক আনা, গ্যালি সরানো, প্রুফ টানা, নিজে হাতে স্টিক ধরে হেডিং কম্পো ব্লকে চিপি দেওয়া, কাতুরি দিয়ে বুল কাটা, চিৎপুরে গিয়ে কাঠের হরফ করানো - তখন আমার কত বয়েস? তারপর সেই কাগজ কত বড় হল। নিজেদের প্রকান্ড প্রেস। প্রত্যেকটা কাজের জন্যে আলাদা আলাদা লোক -- পার্টির সেই কাগজটার জন্যে আমার এখনও মন কেমন করে। পার্টির কাগজের সঙ্গে অরবিন্দর সম্পর্ক লেখকের ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে পার্টির কাগজের সম্পর্ক সমান গুরুত্বপূর্ণ। অরবিন্দের জীবনে পার্টির কাগজের সম্পর্ক মূলত ঔপন্যাসিকেরই জীবনের কথার রূপান্তার।

অরবিন্দ চরিত্রের সঙ্গে ঔপন্যাসিকে ব্যক্তি মানুষের সাধারণ বৈশিষ্টের অসাধারণ মিল দেখা যায়। এক শুক্রবারের ডায়েরিতে অরবিন্দ তার নিজের কথায় বলে - আমার মুশকিল, আমি আদৌ তর্ক করতে পারি না। পরের পর যুক্তি দাঁড় করিয়ে কোনো জিনিস কাউকে বোঝাতে পারি না। আমি নিজেও কোনো জিনিস বুঝতে পারি না। কিন্তু কমল যেন অনুভব করতে পারি। লোকের মন কখন কোন দিকে ফিরছে, এটা আমি ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে উঠে, লোকের ভিড়ে হাঁটতে হাঁটতে, গালির মধ্যে চায়ের দোকানে বসে তাদের চলাবলার ধরণ থেকে কেমন যেন ধরতে পারি। আমার মধ্যে কখন চাঙ্গা, কখনও মিসোনো ভাব দেখে কোনো কোনো চটে যায় ঔপন্যাসিকের বাহ্যিক আচরণ ও অন্তমনের ভাব অরবিন্দ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে এখানে প্রকাশ পায়।

অরবিন্দ লড়াই করছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। বুজোয়া রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অরবিন্দ হাঙ্গার স্ট্রাইক করছে। এই অরবিন্দের শৈশবের স্মৃতিতে তার নিঃসহায় শ্রেণীর প্রতি দরদভরা হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। দরিদ্রদের প্রতি মিথ্যাচারিতার প্রতিবাদ জানায় ক্ষুদে শিশু অরবিন্দ। দাদুর সঙ্গে পথ চলার একদিনের স্মৃতিতে সে বলে একবার, তখন আমি খুবই ছোট, তোমার হাত ধরে হাঁটছি। একজন ভিখিরি পয়সা চেয়েছিল। তুমি নেই মাপ করো বলতেই আমি

তোমার পকেটে আঙুল দেখিয়ে বলেছিলাম, ব্যাগটা খোলো, ওতে পয়সা আছে। নেই বলতে তুমি তো ইচ্ছে নেই নয়, তুমি বোঝাতে চেয়েছিলে পয়সা নেই। আমি তোমাকে আদৌ মিথ্যেবাদী বলতে চাইনি। শিশুর সরলচিত্তে আমি শুধু আছে কি নেই বলার ভুলটা ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। এই স্মৃতিচারণা থেকে অরবিন্দ চরিত্রের মিথ্যেচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। মানুষ কতগুলি ধর্ম নিয়েই জন্ম নেয়। অনেকের চরিত্রে স্বতঃগুণের প্রাধান্য বেশি থাকে। কারো চরিত্রে রজ গুণের প্রাধান্য আবার কেউ কেউ সহজাত তম গুণের অধিকারী অরবিন্দ জন্ম থেকে স্বতঃগুণের অধিকারী ছিল। একবার ছেলেবেলায় তার দাদু এক দুঃস্থ ভাইয়ের চাকরির জন্যে আগে থেকে এক বন্ধুর কাছ থেকে প্রশ্নপত্র আউট করে এনে তাকে মুখস্থ করিয়েছিল। দাদুর এই কাজকে ভালভাবে সেদিনের শিশু অরবিন্দ মেনে নিতে পারেনি। সরকারি উকিল তারকবাবু সন্ত্রাসবাদীদের ডাইরি থেকে পাতার পর পাতা মুখস্থ করে তথ্য সংগ্রহ করতেন আবার সন্ত্রাসবাদীদের হীরের টুকরো ছেলে বলে বাহবা দিতেন। এভাবে সন্ত্রাসবাদীদের বিপথে চালিত করে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে ওদের ফাঁসিতে ঝোলানোর ব্যবস্থা করেন। তারকবাবুর এই জঘন্য আচরণের প্রতিবাদ করে শিশু অরবিন্দ। সেই সব শৈশবের কথা মনে করে অরবিন্দ সেই সব কুচক্রীর ছদ্মবেশ টেনে হিঁচড়ে খসিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা নেয় । আশৈশব অরবিন্দ চরিত্রে প্রতিবাদী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় শৈশব থেকে অরবিন্দকে তার দাদুই নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা ও জগৎ সত্যের শিক্ষা দিয়েছেন। শৈশবে তার দাদু দোহাবলী বাংলা করে করে শেখাতেন। সে তার দাদুর কাছ থেকে জানতে পারে - ''পথে চলতে গিয়ে যে পড়ে যায় তার দোষ নেই, সে বসে থাকে তার মাথায় চাপে কোটি ক্রোশ রাস্তা।'' পন্ডিত আর মশালচি, এই দুজন দেখতে পায় না। অন্যদের আলো দিয়ে এরা নিজেরা অন্ধকারে থাকে। যেমন করকরে জিনিসের মধ্যে বালি, উজ্জ্বলের মধ্যে রোদ, তেমনি চুপ করে থাকার চেয়ে মিষ্টি আর কিছু নয়। ক্ষুধার কুকুর বিঘ্ন আনে, তাকে একটা টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে সাধনা করো। প্রাণ যাক, প্রতিজ্ঞা থাক। যারা প্রাণ রেখে প্রতিজ্ঞা ছাড়ে, তাদের জীবনে ধিক। সবার সঙ্গে মিলেজুলে সবাইকে জী আজ্ঞে বলে নিজের ঠাঁইতে ঠিক থাকো। মালা জপে শালা, কর জপে ভাই। যে মনে মনে জপে তাকে বলিহারি যাই। শৈশবে দাদুর মুখে এসব নৈতিকজীবন, কর্মজীবন ধর্মীয় ভাবনা ও জীবন দর্শনের কথায় কথকের জীবনের ভিত গড়ে ওঠে। পরে বড় হয়ে সে লাওৎসু-র তাও তে চিং গ্রন্থ ইংরেজিতে পড়ে সে শেখে যে অন্যদের জানে সে চতুর, যে নিজের জানে সে চক্ষুমান। যে অন্যদের পরাস্ত করে, তার জোর আছে।

যে নিজেকে জয় করে, সে শক্তিমান। জ্যান্ত থাকতে মানুষের থাকে নরম ঢিলে ভাব, মরে গেলে হয় শক্ত টান-টান। ঘাস আর গাছ জ্যান্ত অবস্থায় সহজে হেলে, সহজে ভাঙে - ঝরে গেলে শুকিয়ে পাকিয়ে যায়। এইভাবে মৃত্যুর সঙ্গীসাথী হচ্ছে শক্ত আর কড়া, জীবনের সঙ্গীসাথী হল নরম আর দুর্বল। কাজেই শক্ত হাতিয়ারে জেতা যায় না। দুনিয়ায় সবচেয়ে দুর্বল বশংবদ হল জল। কিন্তু তবু শক্ত আর কঠিনের ওপর চড়াও হওয়ার ব্যাপারে জলের জুড়ি নেই। তার কারণ জলের জায়গা জুড়ে বসার কারো সাধ্য নেই। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মশক্তি বৃদ্ধির উপকরণ এই গ্রন্থ থেকে পেয়ে যায় অরবিন্দ। নিজের মনের গড়ন তৈরী করে নেবার উপায় এ থেকে পেয়ে যায় অরবিন্দ।

জেলে বিভিন্ন কয়েদির সঙ্গে মেলামেশা করে জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে অরবিন্দ। সে নানা জীবনের নানা কথা থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করে। নিজের আত্মশক্তি বৃদ্ধি ও নিজের চেতনার ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটে জেলের কয়েদিদের জীবন কথা থেকে। ঔপন্যাসিকও ব্যক্তি জীবনে জেলে বন্দী হয়ে জীবনকাটানোয় নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। ঔপন্যাসিক তাঁর পদাতি (১৯৪০) কাব্য গ্রন্থের বিশ বাইশ বছর পর উপন্যাস রচনা শুরু করেন। এই উপন্যাসের কথাও বাদশার জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখার কথা ভাবেন। এই পরিকল্পনায় বাদশার সঙ্গে বসে তার জীবনের নানা নোট নেয় অরবিন্দ। কিন্তু কথক মনে মনে ভাবে যে তাকে নিয়ো উপন্যাস রচনা সম্ভব নয়। কেননা সে আসলে হচ্ছে হাড়ে হাড়ে সাংবাদিক। ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও ছিলেন একজন পেশাদারি সাংবাদিক। তিনিও মনে মনে ভাবতেন যে তাঁকে নিয়ে কারা উপন্যাস সৃষ্টি অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে কথক তার উপন্যাস সৃষ্টির অক্ষমতার বিভিন্ন কারণ লিপিবদ্ধ করে। সেই সঙ্গে উপন্যাসের শিল্পগুণ আত্মজীবনীর সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য এই অংশে কথক বিবৃত করে। এ থেকে ঔপন্যাসিকের কথা সাহিত্যের সম্যক ধারণার পরিচয় মেলে।

উপন্যাস লেখার প্রসঙ্গে কথকের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বৈশিষ্ট্যের গুনাগুণ চেতনার স্তরে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বুদ্ধিজীবী পার্টি নেতৃত্বর স্বাধীনতা ও সামাজিক অবস্থান কথকের বিশ্লেষ বক্তৃতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং লড়াইয়ের গূঢ় দর্শন এতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে বলে আমাদের কাগজে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে বড় সুন্দর কূরে এ কথা বলা হয়েছে তাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর তাঁবুতে পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু মাথাগুলো রেখে এসেছেন বুর্জোয়াদের তাঁবুতে। খুব ঠিক কথা। তবে আমার আশা আছে, মাথা কাটা যাবার আগে নিশ্চয়ই তাঁরা মাথাগুলো বাঁচাবার চেষ্টা করবেন। একেই বলে একাধারে শ্রমিক শ্রেণী এবং পার্টির নেতৃত্ব। এই যে আমরা এতদিন পরে নিজেদের নিয়ে পড়েছি, এবারকার পার্টি লাইনের এটাই বিশেষত্ব। তার জন্যে অমন যে বড় নেতা মাও সে তুং তাকেও আমাদের পার্টি রেয়াত

করেনি। এ দেশের অবস্থাটা কী সেটা আমাদের বুঝে নিতে হবে। তারপর সেইমত ব্যবস্থা আমাদের যে বুর্জোয়া, তারা যেমন জোরদার তেমনি টেঁটিয়া। জমিদারদের দলে নিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রটা বাগিয়ে বসে আছে। আসলে এরা সাদা সায়েবদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে স্বাধীনতার ভেখ পরে হয়েছে কালো সাহেব।ঞ্জ এই অংশে অরবিন্দ চরিত্রে পরাধীন দেশমাতার প্রতি তার দেশাত্মবোধ, দেশীয় জমিদারদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের গোপন আঁতাত এবং পার্টির লাইনের প্রতি লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতা এই অংশে ফুটে উঠেছে। এখানে লেখক কথক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এদেশের মুখোশ পরা দেশীয় জমিদার দের ভৎসনা করেছেন ঔপন্যাসিক। জেলের ছ-নম্বর সেলের কমরেড তপন সান্যালের সঙ্গে একই ক্লাসে অরবিন্দ মার্ক্সবাদ লেলিনবাদ পড়ে। পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে। গড়ে তোলে কৃষক আন্দোলন। খেত মজুরদের আলদা সংগঠন শ্রমিক আন্দোলন। রাজনীতিতে একটু একটু করে অরবিন্দের মাথা খুলতে থাকে। সে রাজনীতিতে সাবালক হতে থাকে। সমাজের নীচু তলা থেকে উদ্যোগ গড়ে তোলার প্রথায় চালায় যে ভাবে সে নেতাদের মুখ চেয়ে বসে থাকলে চলবে না। দক্ষিণ দেশের খবর পেয়ে অরবিন্দ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। সেখানে আড়াই হাজার গ্রাম জমিদার জায়গিরদার দের কবল থেকে মুক্ত হয়। এই খবরে অরবিন্দ যেন চোখ বুঝে দেখতে পায় গাছের মাথায়, পাহাড়ের চূড়ায় পত্ পত্ করে উড়ছিল লাল নিশান।

অরবিন্দদের হাঙ্গার স্ট্রাইক দলের মধ্যে আসলে অনেক ঘাত প্রতিঘাত। ওরা লড়াই করে নিজের বিরুদ্ধে নিজেই। এক সময় সাত নম্বর সেলের বন্দী প্রণবকে পাঠান হয় হাসপাতালে। মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এক সময়ে সে গ্যাস্ট্রিক আলসারের রুগী ছিল বলে জেল কমিটি থেকে হাঙ্গার-স্ট্রাইক থেকে ওকে বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু প্রণব পাল্টা জানিয়েদেয় যে জেলে তাকে হাঙ্গার স্ট্রাইক করতে না দেওয়া হলে সে আলাদা হয়ে হাঙ্গার স্ট্রাইক করবে। কেউ কেউ নিজেদের দলের বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তিদেয়। দীর্ঘকাল লড়াই চলে। এবং কোম্পানী সংগ্রামীদের মধ্যে ফাটল ধরায়। তবুও ভয়ঙ্করের আঘাত এড়িয়ে দল নিজেকে রক্ষা করে। সংগ্রাম চলে।

ঔপন্যাসিক ব্যক্তি জীবনে বাংলার মাঠ-ঘাট-খেত চষে বেড়িয়েছিলেন । ঘুরে ঘুরে কাগজের সংবাদ সংগ্রহ করতেন। অরবিন্দও একজন সংবাদিক। সে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করে। নিজের কথায় সে বলে একবার আমি কাজের রিপোর্ট করতে ত্রিপুরার পাহাড় এলাকায় পায়ে হেঁটে ঘুরেছিলাম। তখন ছিল নভেম্বরের ঠান্ডা সকালে রওনা হয়ে দুপুরে মাঝপথে কোনো গ্রামে খেয়ে সন্ধে পর্যন্ত হেঁটেছি। এইভাবে সাত দিন হেঁটেছিলাম একশো মাইল রাস্তা। কেবল শরীর টিকিয়ে সংগ্রামে বিশ্বাসী অরবিন্দ। এ সম্পর্কে সে বলে শরীরটা থাকলেই আমি খুশি। এই পৃথিবীর রূপ রস

শব্দ গন্ধ স্পর্শ আমি এই শরীর দিয়ে বুঝি। আমার অনুভূতিগুলো আমার দেহরক্ষী। তারা জানিয়ে দেয় এটা মন্দ ওটা ভাল। ---- জীবন রক্ষা, বংশ রক্ষা যখন যে কাজেই লাগুক, এই শরীরের চেয়ে প্রিয় আমার কাছে আর কিছুই নেই।ঞ অরবিন্দ আত্মবিশ্লেষণ করে অনেক সময় সে ভাবে তার শরীর শরীরের বাইরের প্রকৃতি, শরীরের ভেতরের অন্তঃপ্রকৃতি নিয়ে। মানুষের বোধগম্যতা, জানা আজানার সীমা ক্ষমতা সম্পর্কে সে নিজে নিজেকে বলে মানুষ বাইরের প্রকৃতিকে যতটা জেনেছে তার চেয়ে ঢের কম জেনেছে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে। আমি মনে করি, মানুষের জানবার ক্ষমতা সীমাহীন। কিংবা বলা যায়,মানুষ তার জানার সীমানাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলেছে। মানুষের জ্ঞানগম্যতার একটা বড় নির্ভর ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি। সেই অনুভূতির আঁচে ধরে অদৃশ্য কালিতে লেখা অনেক গুপ্ত চিঠির মর্মোদ্ধার করা সম্ভব। আমাদের শরীরের আর মনের অনেক খিল এখনও খোলা হয়নি। কোন খিল দিয়ে আটকে রেখেছি বেরিয়ে যাবার দরজা, কোনটাতে আটকানো বাইরে চোখ মেলার জানলা মনের খিল দেওয়া কোন পথ আকস্মিক খুলে যায় একটি ঘটনায়। সব জেলের বন্দীদের অবস্থা বুঝে সকলে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় হাঙ্গার স্ট্রাইক তুলে নেবার। ধর্মঘদ্ধীদের একটু লেবুর রস ও গরম হরলিক্স্ দিয়ে প্রথম দিন অনশন ভাঙা হয়। পরের দিন গলাভাত। শহীদ স্মরণসভা করে জেলে জেলে অনশন ভঙ্গ করা হয়। এই অনশন ভাঙার দিনটিই ছিল অরবিন্দর জন্ম দিন। এই দিনটি রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনে তার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ। অনশন ভাঙার দিনের সঙ্গে অরবিন্দর জন্মদিন প্রসঙ্গ যুক্ত করার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তার ব্যক্তি জীবনের বিশেষ দিক চিহ্নিত করেছেন। অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের পূর্ণজন্ম।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে হাংরাস অভিনব। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু কল্পনাশ্রয়ী বর্ণবতুল ছবি নয়। সাধারণ ও তুচ্ছ কয়েদি, বন্দী, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মী জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি এই উপন্যাসের উপকরণ। সাধারণের সামান্য শল্পিত রূপ 'হাংরাস'। রোম্যান্টিক ভাববিলাসী ও স্বপ্নাবিষ্ট প্রেমের উপাখ্যান রচনায় আবিষ্ট হয়ে রচিত 'হাংরাস' নয়। গতানুগতিক ছকে বাঁধা উপন্যাসের ধারায় হাংরাস অভিনব। উপন্যাসের উপকরণ ও বিষয়বস্তুর বন্ধন মুক্তি ঘটেছে এই উপন্যাসে। এই উপন্যাসের পটভূমি অতীত জীবনের বর্তমানের জীবনসংগ্রামকে ত্বরান্বিত করে ভবিষ্যৎ জীবনের নির্দেশ করে। এই উপন্যাসের সমকাল বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সে সময়ে যুগধর্ম সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক গোপিকা নাথ রায়চৌধুরী লিখেছেন, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের পর থেকে মার্কস্বাদ বাঙালার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলে প্রসার লাভ করে। --- এর আগে পর্যন্ত অর্থাৎ বিশের দশক এবং ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে বাঙলা সাহিত্যে রুশ বিপ্লব ও সাম্যবাদী ও সমাজ তান্ত্রিক মনোভাবের প্রত্যক্ষ বা

পরোক্ষ প্রভাব কেবল এক ধরনের মানবতাধর্মী গণ চেতনারূপ নিয়েছে। তখনকার সব লেখকই যে রুশ বিপ্লব চেতনা বা সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় প্রভাবিত হয়েই গণজীবনের কাহিনী লিখতে শুরু করেছেন, তা হয়ত নয়। কিন্তু তখনকার আলো হাওয়ায় এসব ভাবনা ভেসে বেড়াত, লেখকদের উজ্জীবিত করত। এর ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। বাঙলা কথা সাহিত্যকে নিছক মধ্যবিত্ত সুলভ রোম্যান্টিক শ্রয়িকথা কিংবা মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিয়ে এক ধরনের গর্ণচেতনা সাহিত্যে জীবনের প্রসারিত রূপটিকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হল। অখ্যাত অনভিজাত অবজ্ঞাত নরনারী ভিড় করে এল বাঙালী লেখকের কল্পনার আঙিনায়। এই দুিই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য পৃঃ ১৮৬)। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু ঔপন্যাসিকের বিশেষ জীবনদর্শনের সঙ্গে অন্বিষ্ঠ। একটি বিশেষ সময়ের সাধারণের জীবনের স্বপ্ন যন্ত্রণা, স্বদেশ চেতনা, সামাজিক অবস্থান ও ব্যক্তিমানসের টানাপেড়েন হাংরাসের বিষয়বস্তু। সমাজের পুঁজিবাদী শাসক শ্রেণীর শোষণ অত্যাচার নিপীড়ন ও বঞ্চনার হাত থেকে সাধারণ এর মুক্তিই হাংরাস উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের জীবন দর্শন। চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জীবন প্রত্যয় নিয়ে রচিত হাংরাস। এই জীবন প্রত্যয় উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে অন্বিষ্ট। এই জীবন প্রত্যয় কে শিল্পিত রূপদানের জন্য উপন্যাসিক বিষয় বস্তু বর্ণনার স্বতন্ত্র আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন। ঔপন্যাসিক বিষয় বস্তু বর্ণনা করেছেন নিরপেক্ষ ও সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে অরবিন্দ ও বাদশার কথার সাহায্যে। সেই হিসেবে এই চরিত্র দুটির আত্মকথন রীতি হাংরাস উপন্যাসে প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু লেখকের ব্যক্তি জীবনের নানা অভিজ্ঞতা অরবিন্দ চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। তথাপি গোরা, সত্যকরণ শ্রীকান্ত প্রভৃতি চরিত্রগুলির মতো অরবিন্দ চরিত্রে ঔপন্যাসিকের সম্পূর্ণ আত্মজীবনী মূলক উপাদান সম্পূর্ণ নয়। তাই এই উপন্যাসের রীতিতে মিশ্র রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এতে লেখকের ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও ভাবনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। হাংরাস উপন্যাসের ভাষারীতি চরিত্র ও বিষয়বস্তু অনুগামী। এই উপন্যাসের চলিত আটপৌরে গদ্যভাষা ও কথ্য বাংলা চরিত্র সৃষ্টিতে বিস্ময়কর শিল্প প্রতিভার পরিচায়ক। উপন্যাসের শিল্প গুণ অনন্য সাধারণ। হাংরাসে উদ্দেশ্য মূলকতা অনুধাবন যোগ্য তথাপি লেখকের শিল্প প্রতিভার জন্য তা পাঠকের হৃদয়ে ভাবের বিগলন ঘটায়। হাংরাস পাঠকের অন্তরের সঙ্গে একাত্মীকরণ ঘটায়। উপন্যাসের সংকল্প সৃষ্টির আনন্দ রসের সঙ্গে তঞ্চিত। হাংরাস বাংলা উপন্যাসের ধারায় একটি মাইল স্টোন।

ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় উপন্যাস 'কে কোথায় যায়'। এই উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৭৬ সালে, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা ৯ থেকে। সংখ্যা চিহ্নিত ১৮টি পরিচ্ছেদে উপন্যাসটি বিন্যস্ত। এই উপন্যাসটি লেখক গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছেন। এই

উপন্যাসটিতে লেখক কাহিনী বিন্যাসের একটি অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এই উপন্যাসে চা বাগানে শ্রমিক সংগঠনের কাজ করে তেত্রিশ বছর মাটি কামড়ে পড়েছিলেন — এমন একটি চরিত্র উপেন মজুমদারকে প্রধান চরিত্র হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এই চরিত্রটিকে চিকিৎসার জন্য সোভিয়েত দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এরই সুবাদে তিনি জীবনে প্রথম ট্রেনের ফার্স্টক্লাস কামড়ায় বসে যাত্রা করেন। এই উপন্যাসে আমরা তাঁকে একজন খাঁটি মানুষ ও খাঁটি কমিউনিস্ট রূপে দেখতে পাই। উপন্যাসে তাঁর জীবনকথার সঙ্গে পাঠকের বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে সহদেব ও তাতিয়ার জীবনালেখ্য। কোনো এক সময়ের নকশালপন্থী সহদেবকে আমরা দেখি সোভিয়েত বিরোধী প্রচারে ব্যবহৃত পশ্চিম জার্মানীর বেতারে চাকরী করতে। ট্রেন যাত্রায় সেও একই কামড়ায় হাওড়া থেকে নববিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে উপেন মজুমদারের সঙ্গে চলতে থাকে। ক্লেদাক্ত পারিবারিক জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে তাতিয়া বিদেশের উদ্দেশ্যে স্বামীর সঙ্গ নেয়। উপন্যাসে এই আখ্যানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গিরিজার গল্প। এবং সেই গল্পের সঙ্গে গিরিজার স্মৃতিকথায় আরও তিনটি টুকরো গল্প পাই আমরা। প্রথম গল্পে — একবার ট্রেনে একজন সংসার ত্যাগী, কামিনী-কাঞ্চন বিমুখ ও বিধর্মী সাধুর হাতে গ্রামের লজ্জাশীলা এক গৃহবধূ ঘরভর্তি লোকের সামনে পরম আশ্বাসে তার গর্ভের সন্তানকে সপে দেয়। দ্বিতীয় গল্পে — একটি উদ্বাস্তু মেয়েকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে নারী পাচারকারী দালালের হাতে সপে দেওয়ার চক্রান্ত। অবশ্য সামান্যর জন্য সে রক্ষা পায়। উপন্যাসের তৃতীয় গল্পে — এক মুমূর্ষ গুর্খা টিবি রোগী একদিন একটি সাপের কামড় থেকে আত্মরক্ষা করতে লাফ দিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যায়। এই উপন্যাসের ঔপন্যাসিক সর্বত্যাগী উপেন মজুমদার চরিত্রের মধ্যে কমিউনিস্টের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপণ করেছেন। সেই উপেন মজুমদারকে দেখে তাতিয়ারও মনে হয় — ভয় নেই, আছে ভালোবাসা। এবং সেই ভালোবাসার জোরেই সে দুনিয়া বদলাবে। উপন্যাসটিতে লেখক উপেন মজুমদার চরিত্রটিকে নিছক একটি প্লট নির্মাণের লক্ষ্যে সৃষ্টি করেন নি।

এঁর মধ্যে লেখক দেখিয়েছেন একটি সহায়-সম্বলহীন মানুষ কিভাবে মানুষের মঙ্গলের স্বার্থে জীবনের অধিকাংশ সময় বিলিয়ে দিতে পারেন। শুধু মুখে বড়বড় বক্তৃতা দিলেই কোন পার্টির নেতা হিসেবে জনমানসে নেতা জায়গা পাওয়া যায় না ; কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার উপায়কে লেখক উপেন মজুমদারের মধ্যে দেখিয়েছেন। সারাজীবন না

উঠলেও ট্রেনের ফার্স্টক্লাস কামড়ায় জায়গা দিয়ে উপেন মজুমদারকে লেখক এইবার নতুন পোষাকে সাজিয়েছেন। নতুন পোশাক পড়ে উপেন মজুমদার একটি সুটকেস হাতে নিয়ে , হ্যারিসন রোডের মোড় থেকে কিনে আনা কাঁধে ঝোলান ব্যাগ নিয়ে ঘটকবাবুর বাড়ির গাড়ি করে ট্রেনের উদ্দেশ্যে রওনাহয়। সেই যাত্রাপথের একটি পথিকের কথায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন —''বার বার নিজের ধোপদুরস্ত জামাকাপড়ের দিকে তাঁর চোখ গিয়ে পড়ছিল । এমন চোস্ত পোশাক কখন তাঁর গায়ে ওঠেনি বলে নিজেকে কেমন যেন অচেনা - অচেনা মনে হচ্ছিল। সামনে একটা রিক্সা রাস্তা আটকানোয় হঠাৎ তাঁর খুব রাগ হল। মুখ ফস্‌কে ' এই ইস্টুপিট ' বলতে গিয়ে নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিলেন।'' সেই যাত্রাকালীন উপেনবাবু দেশ-বিদেশের গন্ডী ঘুঁচিয়ে একটি বৃহত্তর ও উদার রাজনৈতিক সত্ত্বায় নিজেকে উন্নীত করে নেন। সেই বৃহত্তর জগৎ লেখকের ভাষায় '' তাছাড়া কমরেডদের বার বার বিদেশ বিদেশ বলাটা তাঁর ঠিক বরদাস্ত হচ্ছিল না। বিদেশ কোথায় ? বলতে গেলে নিজেরই তো দেশ। সত্যি বলতে কী, তাঁর তো পাসপোর্ট ভিসা এসব লাগাই উচিত নয়। শুধু একটু দূর। এখানে গরম, ওখানে ঠান্ডা। ওদের গায়ের রংগুলো ফর্সা । এই যা । নইলে ওরাও তো সেই কমরেড । নয় কি ? '' এখানে একজন যাত্রীর উপলব্ধিতে লেখক রাজনৈতিক সমাজের পরিধি প্রসারিত করে তুলেছেন । অসুস্থ্য পার্টিকর্মীর চরিত্রের মধ্যে লেখক দেখিয়েছেন — দেশ-বিদেশ নির্বিশেষে ও বিভিন্ন অবস্থান নির্বিশেষে মানুষের পার্টিসত্ত্বা তাকে এক বৃহত্তর চেতনা উন্নীত করে ও ঐক্যবদ্ধকরে তোলে । সেই ঘটকবাবু ড্রাইভারের কথায় উপেন মজুমদার ভাবেন —''তাছাড়া এটা তিনি হাড়ে হাড়ে বোঝেন যে , ঘটকবাবু তো আর তাঁকে খাতির করছেন না । আসলে খাতির করছেন পার্টিকে । সেটাই হওয়া উচিত । এ তো আর ব্যক্তিরব্যাপার নয় । তাছাড়া উপেনবাবু কী আর এমন ব্যক্তি । এম.পি নন, এম-এল-এ নন উচ্চপদস্থ নেতা-টেতা হলেও বা কথা ছিল । নিতান্তই ঝান্ডা-বওয়া লোক । তাও মফস্বলের । '' বাইরে যাবার প্রক্কালে উপেনবাবু একবার পার্টি অফিস ঘুরে আসেন — এর মধ্যে লেখক পার্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন , পার্টির অবদানকে স্বীকার ও সমকালের ধর্মকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন।

এই উপন্যাসের প্লটের সঙ্গে লেখকের স্বদেশপ্রেম সংযুক্ত হয়েছে শিল্পধর্ম অটুট রেখেই। নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব , কালের পরিবর্তনে নাগরীকের জীবনশৈলীর রূপান্তর ও স্বদেশীদের প্রকৃতি উপন্যাসের স্বল্প বয়সের দুজন পার্টি কর্মী চরিত্রে রূপদান করেছেন লেখক । তাদের কথায় লেখক লিখেছেন—' 'তবে যে আজকালকার ছেলেদের লোকে এত গালাগাল দেয় ! তারা নাকি বয়সের সম্মান দেয় না , রাস্তায় কেউ পড়ে গেলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় , দামি জামাকাপড় পরে , নেশা ভাঙ করে — এই রকম কত সব আ-কথা কুকথাশোনা যায় । হঠাৎ ছোকরা দুজনের দিকে চোখ

পড়তেই উপেনবাবু সভয়ে দেখলেন দুজনেরই পরনে টেরিলিনের জামা। তবু ওদের ওপর ঠিক চটতে পারলেন না ।মনে মনে বললেন , এটা উচিত নয় । স্বদেশী করবে তো বাবুগিরি করবে কেন ! অবশ্য দেখাচ্ছে বেশ । .....কমরেডকে গুরুজন বলা কি ঠিক? তাছাড়া ওদের এই সিগারেট খাওয়ার মধ্যে তাঁকে অবজ্ঞা করার ভাব আছে বলে তো মনে হল না। পার্টির কাজ করে জেল খেটেছেন উপেনবাবু । তিনি জেল থেকে বের হয়ে তেত্রিশ বছর ধরে চা- বাগানের শ্রমিক সংগঠনের কাজ করেছেন । সেখানকার পার্টির সঙ্গে তিনি শহর কলকাতার পার্টির একাধিক বৈসম্য উপলব্ধি করেন । তাঁর অনুভবের কথায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন —''তাছাড়া এত বড় শহরে এসে তাঁর কেমন যেন জলছাড়া মাছের মত অবস্থা হয় । আরও একটা কথা কখনও মুখ ফুটেতিনি বলতে পারবেন না কাউকে । মানে , শহরের কমরেডরা যেন কেমন । পার্টি-অফিসে দু চার বার এসে দেখেছেন সবাই নিজের কাজ নিয়ে তাও ঠিক নয় , কেমন যেন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ।তাদের মধ্যে আঠা-আঠা ভাবটা ঠিক নেই ।'' এখানে লেখক একজন নিষ্ঠাবান পার্টি-কর্মীর চেতনায় শহর -গ্রামের পার্টির নেতা কমরেডদের অনৈক্যের বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা দিয়েছেন লেখক । একজন পার্টি-কর্মী তাঁর অসুস্থতার সময় বা অন্যকোন সঙ্কটকালে পার্টির সাহচর্যে একাকীত্বের হতাশায় ডোবেন না ডড সেটাই এখানে দেখিয়েছেন লেখক । একটা সংগঠনের ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজনীয় দিকটি অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে লেখক এখানে উপন্যাসের উপাদানের সঙ্গে যুক্ত করেছেন । সার্থকতার সঙ্গে শৈল্পিক চেতনায় লেখক দেখিয়েছেন যে , ''সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় উপেনবাবুর চোখে জল এসে গিয়েছিল ।পার্টির ছেলেরা কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগটা অবধি তাঁকে বইতে দিল না । পার্টির টান নাড়ির টানের চেয়েও বেশি । একথাটা তিনি অনেককে অনেকবার বলেছেন । এটাই হওয়া উচিত - এই বোধ থেকে বলেছেন । কিন্তু আজ তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে কথাটা উঠে আসছে । মনের সমস্ত তার ঝন ঝন করে বাজছে ।'' ভেতরের অন্তস্তলে অবগাহন করে উপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাংগঠনিক ব্যক্তিসমূহসের বিশেষ দিক নির্দেশ করেছেন । এখানে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র উপেনবাবুর জীবনের শেষ অদ্যায় থেকে ফ্ল্যাসব্যাক রীতিতে চরিত্র ক্রমবিকাশের ধারা বজায় রেখেছেন ।

এই উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক যুক্ত করেছেন একটি অরাজনৈতিক পারিবারিক জীবনসূত্র। এই আধ্যায়ে বাইরে ভ্রমণরত এক দম্পতিকে এঁকেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় । তারা বিদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন বিক্রমের গাড়িতে । পারিবারিক জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে তাতিয়া বিদেশে যাবার আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে । গাড়িতে যাওয়ার পথে নববধূ তাতিয়া একটাও কথা না বলে রাস্তাঘাটগুলো যেন গিলতে গিলতে যাচ্ছিল । ''বিদেশে যাওয়ার রোমাঞ্চে রাত্রে তার ঘুম

হচ্ছিল না ।'' সহদেব বিদেশে চাকরি করে । বছর দুই আগে তার বাবা মারা গেছেন । বাড়ি ছেড়ে বিদেশে যাবার পথে অন্যদের মতো এর আগে সহদেবেরও কষ্ট হতো । লেখকের কথায় ''এর আগেরবার যখন সহদেব এসেছিল , সেবার তার যাওয়ার সময় খুব কষ্ট হয়েছিল । কেননা ফিরে গেলে অনাত্মীয় শহরে আবার সেই একা ।'' বাবার মৃত্যুর পর সে বিলেতে চলে যায় । এখন কোলম (কলম্ব)-এ রেডিওতে একটা চাকরী করে পশ্চিম জার্মানীতে । সেখানে এবারে তার যাওয়ার পথে নতুন বউকে নিয়ে আনন্দি হচ্ছে । এই পরিচ্ছেদে লেখক সুখের পরিবারের সাংসারিক জীবনের ছবি এঁকেছেন । তাতিয়ার পরিবার এবং সহদেবের পরিবারকে নিয়ে লেখক উপন্যাসের আলোচ্য অংশের পুষ্টি জুগিয়েছেন । তাতিয়া ও সহদেবের বাবা-মা-ভাই-বোনের যৌথ প্রয়াসে সুখী সংসারের ছবি । সেখানে যুক্ত হয়েছে পরিচিত বন্ধু মহলের রোমাঞ্চকর পরিবেশ । সেই পরিবেশে যুক্ত হয় অরূপকুমার নামের এক যাত্রা-শিল্পীর চরিত্র ।

এই চরিত্রগুলোর সঙ্গে সহদেবের বন্ধু বিক্রমের উচ্চমধ্যবিত্ত ব্যাঙ্কে চাকুরী জীবনকে এই অধ্যায়ে যুক্ত করেছেন । বন্ধু অরূপকুমারের মুখে বাঙালী-মানসিকতার অসম্ভব ও অকম্পনীয় অথচ সত্য জীবনযাত্রার কথা শুনে সহদেব বিস্মিত হয় । লেখক এ কথায় বলেন ড্ড'' সহদেব সত্যিই ভাবতে পারছিল না । এটা কি করে সম্ভব হয় ? তুরুপের মত ধারালো ছেলে , ইংরিজিতে যার মুখে খই ফুটত , স্ট্রেচলনের প্যান্ট ছাড়া যে পরত না , সে কিনা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে যাত্রা করছে ? ভাবা যায় ?''এ যে বাংলে ; সেকারণেই এখানে সব কিছু সম্ভব । বিক্রম ও সহদেবের এই আলোচনা তাতিয়ার বিদেশের প্রতি অধীর আগ্রহে একটি আঘাত নিয়ে আসে । কলকাতায় ফিরে আসার প্রসঙ্গে তাতিয়া ক্রূর হয়ে ওঠে । এখানে নববধূর কাঁচা বয়সের আবেগের আধিক্য ও ভেসে বেড়ানোর মানসিক অবস্থানকে ফুটিয়ে তুলেছেন ।

এই উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা উপেনবাবুর সঙ্গী ও পার্টিকর্মী অনুকূল চরিত্রটি পাই । সে উপেনবাবুকে দিল্লির ট্রেনে তুলে দিতে এসেছে । সে ট্রেনে উঠে উপেনবাবুর শোবার জায়গা করে দেয় । অতীব দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের সঙ্গে অনুকূল একজন সহকর্মীর যথোচিত যত্ন নিয়েছিলেন । অথচ তাদের পূর্ব পরিচয় ছিল না । এমনকি কোনো আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল না । সেই অনুকূলই তাকে ট্রেনের টিকিট হাতে দিয়ে দেয় । বাইরে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় হেল্‌থ্‌ সার্টিফিকেট হাতে দিয়ে দেয় । প্লেনের টিকিট হাতে দিয়ে যত্ন করে রাখার পরামর্শ দেয় । অনুকূল তাকে বলে ড্ড''তবে দিল্লিতে পৌছুতে পারলে আর চিন্তা নেই । পার্টির লোকজনেরা থাকবে । আপনাকে ঘাড়ে করে নিয়ে যথাসময়ে জায়গামত ঠিক পৌছে দিয়ে আসবে । আর এই খামটা রাখুন । সেক্রেটারি দিয়েছেন

আপনার রাস্তার খরচ-খরচার জন্যে ।'' ট্রেন সিগনালের মুহূর্তে উপেনবাবুকে ফুল দিয়ে যাত্রার শুভেচ্ছা জানায় উত্তরবঙ্গের অসংখ্য মানুষ । তারা সবাই কলকাতায় কাজকর্ম করে । কেউ ব্যাঙ্কে মাঝারি কাজ করে , কেউ কলেজে পড়ায় , কেউবা ব্যবসা করে । জেল থেকে বেরোনোর পর তিনি সটান ডুয়ার্সে গিয়েছিলেন শ্রমিক সংগঠনের কাজে । তাঁর সঙ্কটকালে বিদেশে চিকিৎসার যাত্রা পথে ডুয়ার্সের সেই চেনামুখগুলি আজ এগিয়ে এসেছে ।

'কে কোথায় যায়' উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায় থেকে আরেকটি মজার চরিত্র পাওয়া যায় ড্ড 'ঢ্যাঙা গির্জা' । উপন্যাসিক এ ধরণের নামকরণের যথার্থতাও উল্লেখ করেছেন । সেই ঢ্যাঙা গির্জা সেই রেলের কয়েকটি কামরার কণ্ডাক্টর-গার্ড । এই অধ্যায়ে যাত্রীদের টিকিট নিয়েও বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় উপেনবাবুর । যাত্রীরা বিভিন্ন ট্রাভ্‌ল এজেন্সির কাছ থেকে টিকিট কেনার পর যাত্রা পথে বিভিন্ন কারণে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয় । কিভাবে তারা এই টিকিটের ব্যবসা চালান -তার নানা তুচ্ছাতিতুচ্ছ সরস বর্ণনাও আমরা এখানে পাই । ট্রেন যাত্রার বিভিন্ন ঘটনার পরিচয় আলোচ্য উপন্যাসে আমরা পাই । কোথায় কিভাবে কে যাচ্ছে , সেই জীবন যাত্রার আলেখ্য এই উপন্যাস । আনুপূর্বিক কোনো প্লটকে টেনে নিয়ে পাঠকের মনের রসাস্বাদন লেখকের অভিপ্রায় এই উপন্যাস সৃষ্টিতে ছিল না । যার ফলে কাহিনী বর্ণনার আদল এই উপন্যাসে স্বতন্ত্র্য । ঢ্যাঙা গির্জা এক যাত্রী সম্পর্কে বলে ড্ড''রাজুর অ্যাটাচিতে তাঁর পুরো নাম ; চন্দ্রশেখর রাজু । তার নিচে কোম্পানির নামটা সাঁটা ড্ড এন . বি . জি . টি কোং । তার নিচে গুন্টুর' এ . পি । নি:সন্দেহে তামাক ব্যবসায়ী । জি . টি. সম্ভবত গোল্ডেন টোব্যাকো গুন্টুর তো তামাকেরই জায়গা । গুপ্তর ব্যাপারটা তার মুখ দেখে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললেন ঢ্যাঙা গির্জা । গুপ্তর টিকিটে যে-ব্যক্তি যাচ্ছে , তার বয়েস খুব বেশি হলে তিরিশ-বত্রিশ । বিয়াল্লিশ তো কিছুতেই নয় । ঢ্যাঙা গির্জা ইচ্ছে করেই একবার কাগজের দিকে একবার তার মুকের দিকে সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন । স্রেফ মজা দেখার জন্যে । যার টিকিট সে তাড়াতাড়ি মুখটাকে অন্যমনস্ক করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল । ভেতরে ভেতরে যে নার্ভাস হয়েছে এটা বোঝা যাচ্ছিল এক হাতে তাস ধরে তারপর অন্য হাত রেখে তার আঙুল নাচানো থেকে ।'' (৪ - কে কোথায় যায়) । এই অধ্যায়ে লেখক আর একজন বৃদ্ধের কথায় বলেন ড্ড'' ঢ্যাঙা গির্জা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দেখলেন একেবারে শেষদিকের কুপেটা থেকে এক বুড়ো ভদ্রলোক বোধ হয় বাথরুম যাবেন বলে ট্রেনের গা ধরে নিজেকে সামলে সামলে এদিকে আসছেন । ভদ্রলোকের বোধ হয় খেয়াল নেই ওদিকে বাথরুম আছে । খেয়াল থাকলে নিশ্চয় এতটা রাস্তা টলমল করতে করতে হেঁটে আসতেন না।

উনি উঠেছিলেন এই দরজা দিয়ে । তখন নিশ্চয় এই দিকে বাথরুম লক্ষ করেছিলেন । ওঁর মুখ দেখে কীরকম কীরকম মেনে হয় । উনি কি অসুস্থ ? '' (৪/ কে কোথায় যায়) ।

উপন্যাসের পঞ্চম অধ্যায়ে সদ্য বিবাহিত দম্পতির ট্রেন যাত্রার কথা আমজরা পাই । এই অনুসঙ্গ - উপন্যাসের বৈচিত্র সৃষ্টি করেছে । উপেনবাবুর খোঁজ নেবার প্রসঙ্গে সহদেব ও তাতিয়ার কথোপকথনে আমরা দেখি - '' ডিনারের অর্ডারটা দিয়েই ওঁর কামরায় চলে যাব । আমার তো খিদের কোন লক্ষণই নেই । দুপুরে তোমাদের বাড়িতে যা সাঁটিয়েছি । ভুলে গেলাম , বোতল কয়েক বীয়ার আনলে ঠিক হত । আর ভুলেই যখন গিয়েছি , তখন অভাবে - ' বলে আচমকা তাতিয়ার গালে একটা চুম্বন দিয়েই এক ছুটে গেল তোড়াগুলো গুছিয়ে কামড়ার এক কোনে রাখতে । সহদেব হাতের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় তাতিয়া মারার ভঙ্গিতে হাত উঠিয়েই থেমে গেল । শুধু গলাটা তুলে বলল, ' দুষ্টু - । '' (৫/ কে কোথায় যায়) । এর পর '' রাত্তিরে সহদেবের কানে কানে তাতিয়া বলেছিল , ' ইস , গুণতিতে একটা দিন ভুল করে ফেলেছি । আজকের রাতটা , প্লিজ , মাপ করে দিও । ' তারপর নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে ওর ঠোঁটে ঠোঁট রেখেছিল। '' (৫/ কে কোথায় যায়) এখানে লেকক সহদেব ও তাতিয়ার দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে স্বাভাবিক প্রেমভাবনার পরিচয় দিয়েছেন ।

উপন্যাসের ষষ্ট অধ্যায়ে আমরা দুটি পৃথক শ্রেণীর রাজনৈতিক চরিত্রের স্বাক্ষাৎ পাই। এদের মধ্যে একজন সত্য নিষ্ঠ পার্টি প্রেমিক উপেনবাবু অন্যজন দল ত্যাগী স্বার্থবাজ ও বর্তমানের এম . পি. যদুবাবু । লেখক অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যে এবং স্বল্প কথায় চবিত্র দুটি ফুটিয়ে তুলেছেন । আমরা দেখি যদুবাবুকে উদ্দেশ্য করে উপেনবাবু বলেন -- '' দল বেঁধে দীক্ষা নেব কেন ? দীক্ষা নিয়ে দল বেঁধে ছিলাম । দীক্ষা নিয়েও সবাই কি আর ভক্তিনিষ্ঠা রাখতে পারল । না পেরে তখন ভেঙে বেরিয়ে গেল । তাতেও শেষ হল না । শেষে নিজেরাই ভেঙে চৌচির হল । '' (৬/ কে কোথায় যায়) । এই উপেনবাবুর সর্ম্পকে লেখক বলেছেন - '' তবে সত্যিই উপেনদার রান্নার হাত খুব ভাল ছিল । আন্ডার গ্রাউন্ডে থাকার সময় তাই । তবে উপেনদা রাজনীতিতে বরাবরই কাঁচা । পাবলিক মিটিঙে বক্তৃতা দেওয়া দূরের কথা , পার্টি ক্লাস নেওয়ার ভারও ওঁকে ঠিক দেওয়া যেত না । ফলে , যেখানে ছিলেন সেখানেই থেকে গেলেন । পার্টিতে বাড়লেন না । তাছাড়া কোনরকম প্যাঁচ পয়জারের মধ্যে থাকবেন না । ওতে কি হয় ? রাজনীতি তো আর ধুনি জ্বালানোর জায়গা নয় , খেলার মাঠও নয় । তার আসল ব্যাপারই হল ক্ষমতা । শুধু পথ বলাই যথেষ্ট নয় । পথ কাটার ক্ষমতা চাই । '' (৬/ কে কোথায় যায়)। উপেনবাবু চরিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা দান করেছেন উপন্যাসের যদুবাবু চরিত্রটি ।

তার সম্পর্কে যদুবাবু বলেন - " উপেনদার মতন লোকের যাওয়া উচিত ছিল রাষকৃষ্ণ মিশনেও নয় , ভারত সেবাশ্রম সংঘে । পরোপকার আর বিপ্লব এক নয় । অনেকে গালাগাল দিয়ে আমাদের বলে , আমাদের আজ এক কথা কাল আরেক কথা । আর উপেনদার দলবলের পিঠ চাপড়ে বলে - দেখো , এরা ভদ্দর লোক ; এদের এক কথা । লোকগুলো তো ঠিকই বলে । অবস্থার নড়চড় হলে আমাদের কথারও নড়চর হয় । আমরা সত্যিই কোঁচা-হাতে-করা ভদ্দরলোক নই আমরা হলাম দলবাঁধা সর্বহারা । " (৬/ কে কোথায় যায়) । উপন্যাসিক এখানে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্যের বিশ্লেষণ করেছেন ।

ট্রেনের একটি স্বাভাবিক ও সাবলীল বর্ণনার মধ্যে অসাধারণ শিল্পগউনের সমাবেশে রাজনৈতিক সচেতনতা ও রাজনৈতিক দর্শন উপস্থাপন করেছেন । এখানে লেখকের উপন্যাস রচনায় শিল্পগুণের সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলকতার ভারসাম্য বজায় রেখেছেন । রাজনৈতিক জীবনের হাতিয়ার হয়েও তাঁর লেখা এখানে শিল্পগুণের উৎকর্ষতাকে অধিক সৌন্দর্য দান করেছে । এই উপন্যাসের সপ্তম অধ্যায়ে আমরা আবার সহদেব ও তাতিয়ার দেখা পাই । তাদের জীবনের কথা অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে জীবনের গূঢ়সত্যকে লেখক একানে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন । বর্তমানে গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় গণমাধ্যমগুলো বেশীর ভাগই পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে থাকে । সহদেবের ঘনিষ্ঠ প্রফুল্লদার স্মরণ প্রসঙ্গে উপন্যাসে গনমাধ্যমের বাস্তব সত্যটিকে লেখক এখানে সন্নিহিত করেছেন । সহদেবের প্রফুল্লদা একসময় একটি নামকরা ইংরেজী কাগজে কাজ করতেন । সহদেব কে তার প্রফুল্লদা একদিন বলেছিলেন -- " দ্যাখ , আমি কখনও কাগজ পড়িনা । ময়রা মিষ্ট খায় না এই কথা ভাবছিস তো ? কিন্তু তা নয় । আমি পড়ি না অন্য কারণে । খবরের ভেতরকার খবর আমি জানি বলে । খবর পড়িনা বটে , কিন্তু খবর রাখি । যতটা খবর দেয় তার চেয়ে ঢের বেশি খবর ওরা চেপে রাখে । আর দরকারমত খবর বানায় । খবর মানেই হল প্রচার । অর্থাৎ ঢ্যাঁড়া পেটানো । কোনটা স্থূল , কোনটা সূক্ষ্ম । কোন্ পক্ষে ? আসল প্রশ্ন সেইখানে ? " । (৭/ কে কোথায় যায়) । সহদেব কে তিনি আরো বলেছেন -- " শোনা যায় , কুলি মেয়েরা নাকি কাজে বেরোবার সময় দুধের বাচ্চাদের মুখে একটু করে আফিম ছুঁইয়ে যায় । কাগজ ওয়ালারাও তাই করে । লোকের মগজগুলো খুলে নিজেদের ভাবনার কলগুলো বসিয়ে দেয় । তার ফলে , লোকে সারাদিন ওদের ভাবনাগুলোই নিজের বলে ভেবে যায় । " (৭/ কে কোথায় যায়) । এখানে লেখক সমাজ সচেতন দায়বদ্ধ শিল্পী হিসেবে শিল্পের সৌন্দর্যবোধ ও জন জাগরণী সুর এক সঙ্গে বেধেঁছেন । এখানে সহদেবের দেশের বাইরে থাকার অভিজ্ঞতাকে লেখক যুক্তকরে ছেন । পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে এদেশের বৈষম্য সহদেব অনেকদিন থেকে

দেখে আসছেন --" সেই সঙ্গে পুবে-পশ্চিমে দ্বিখন্ডিত একটা জেতের উত্থানপতনও সে চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছে । এপারে কাজ কমে গিয়ে কাজের লোকে টান পড়ছে। এর মধ্যে সে বারকয়েক পুবে ঘুরে এসেছেব , জিনিসপত্তর কিনে সে আসা-যাওয়ার ভাড়া তুলে নিয়েছে। এপারে আগুন দাম । কিন্তু ব্যাপারটা শুধু অর্থনীতির মধ্যে আটকে নেই । মানুষের মূল্যবোধ , মনের স্ফুর্তি, গুণের সম্মান, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ, শিশুর যত্ন - কোন দিক দিয়েই পুবের পাশে পশ্চিম দাঁড়াতে পারে না । " (৭/ কে কোথায় যায়)।

ঔপন্যাসিক একটি সাধারণ যাত্রার মধ্যে জগৎ,জীবন, দেশের রাজনৈতিক , সামাজিক ও আর্থসামাজিক গূঢ় তাত্ত্বিক বিষয়কে এখানে নিহীত করেছেন । সদ্য বিবাহিত সহদেব ও তাতিয়ার দাম্পত্ত লীলার যৌনক্রীড়া ও লঘু হাস্যরসাত্বক যাত্রায় ঘন ও বৈচিত্রপূর্ণ জীবনের রহস্য উন্মোচন করেছেন । বন্ধু প্রফুল্লর জীবনের নানা কথা প্রসঙ্গে লেখক সহদেব সম্পর্কে বলেন -- " লেখাপড়ায় ভাল ছেলেরা ভেতরে ভেতরে যে এরকম শুকনো বারুদ হয়েছিল , তারা নিজেরাও সেটা বোঝেনি । সহদেব সেই দলের । তার বনবাসের বয়স চোদ্দ বছর না হয়ে কেঁদে - ককিয়ে চোদ্দ মাস ।

কিন্তু প্রত্যেকটা দিনই ছিল ঝড়ে-ঠাসা । . . . সহদেবের ধারণা , এই ঝোড়ো দিনগুলোকে নিয়ে যা কিছু বলা - লেখা হয়েছে তার সবই অন্ধের হস্তি - দর্শন । হয়তো সব সাপ্টে দেখার মতো দূরত্বে না গেলে এখন এর বেশি সম্ভবও নয় । সে শুধু এটুকু বলতে পারে যে , এর পেছনে কেবল দেশ নেই -- আছে দুনিয়া । " (৭/ কে কোথায় যায়) । সহদেব বাইরে থেকে তার বাবর কতা স্মরণ করে । তার বাবা বলতেন -- " দ্যাখ, অত বড় একটা যুদ্ধ হয়ে গেল -- তার পুরোটাই রয়ে গেল তোদের চোখের আড়ালে । আজ পৃথিবীকে তোরা ঢেলে সাজাতে চাইছিস কীসের ভরসায় ? একটা ঠোকাঠুকিতেই তো দুনিয়া ফৌথ । নদীতে বাঁধ না দিয়ে কি কেউ শুধু চাষ-আবাদের কতা ভাবে ? " (৭ / কে কোথায় জায়)। একানে সহদেবের বাবার উক্তিতে জগৎ সংসারের বৃহত্তর সত্যকে লেখক উন্মোচন করেছেন ।

এই উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদ যাত্রীদের বৈচিত্রে পূর্ণ । সেখানে যাত্রীরা ট্রেনে তাস খেলে । সেখানে ছিল মিষ্টার লতিফ , মিষ্টার ব্রাউন, ব্রাউনের স্ত্রী গ্লেন, অবাঙালী মেয়ে মিস মীরা খান্না, মিষ্টার মুখার্জী, সোম সুন্দর , মিষ্টার বড়ুয়া ও ভূ-তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞের দল। এদের মধ্যে ব্রাউন ও তার স্ত্রী গ্লেন ছিলেন সমবয়সী। এরা সম্ভবত এদেশে গবেষণা করতে আসে । অবাঙালী মিস মীরা খান্নার চেহাড়ায় খুব ব্যক্তিত্ব আছে। লেখক বলেছেন এর গড়ন ছিপছিপে লম্বা । লেখকের কথায় সে খুব

সপ্রতিভ । ট্রেনে তারা খেলার সময় গানও করছিল। তাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত গান পাগল ছিলেন মিষ্টার মুখার্জী । তার গান ----------

" ও মন , উড়োজাহাজ উড়ছে
দেখ রে আশমানে
তিন রঙের তিনটে আলো
জ্বলছে নিভছে সমানে । ... "

জাত বাউল নাহলেও তার এই গানটি তাদের যাত্রাপথে ভিন্নস্বাদ এনেছে এবং উপন্যাসে বৈচিত্র্য দান করেছে ।

এই উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে আমরা উপেনবাবুর মূল্যবান আত্মবিশ্লেষণ পাই । চরিত্রের নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখার মধ্যে যাত্রার গতিপথ ক্রমশ অগ্রসর হতে দেখি । সেখানে উপেনবাবু ভাবে -- " বড় বড় কথা মুখে বলি , ছোট ছোট কাজ গুলোও নিজেরা করতে ভুলে যাই । আসলে এর পেছনে রয়েছে আত্মপর ভেদ । এটা আমার , ওটা আমার নয় । এক সময়ে সমাজে আমি-তুমির ভেদ ছিল না সবাইকে নিয়ে ছিল একটা বড় যূথবদ্ধ আমরা । মানুষে মানুষে তফাত তারপরে এল । এর আছে ওর নেই -- এই ভাবে । " (৯/ কে কোথায় যায়) । এখানে সমাজ মানুষের মানসিকতাকে নিপুণভাবে বিশ্লেষন করেছেন লেখক । উপেনবাবু আরো ভাবে -- " দেশ আমার । ইংরেজ থাকতেও আমার ছিল , চলে যাওয়ার পর তো আরও বেশি করে আমার । মালিক বলে নিজেকে জোর করে কেউ কায়েম করলেই তো আর তার মালিকানা পাকা হয়ে যায় না । ইংরেজের বেলাতেও তা হয়নি , এখনও তা হবে না । " (৯ / কে কোথায় যায়)। যাত্রাপথে যাত্রীদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় ও আত্মীয়তা সৃষ্টি হয় । এই অধ্যায়েই আমরা তাতিয়া - সহদেবের সঙ্গে উপেনবাবুর অনাবিল হৃদ্যতা দেখতে পাই।

'কে কোথায় যায়' - উপন্যাসে যাত্রীদের নানা পেশার , নানা শ্রেণীর মানুষের আশ্রয়স্থল একটাই পাই । সেই সঙ্গে পাই নানা জায়গায় যাত্রার নানা অভিজ্ঞতা । এই উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে লেখক লিখেছেন -- " ঈশ্বরদি পেরিয়ে ট্রেন হু হু করে চলেছে সান্তাহারের দিকে । লালমণির হাট হয়ে গাড়ি যাবে আমির গাঁও । ট্রেনে মিলিটারির কড়া পাহাড়া ।" (১০ / কে কোথায় যায়)। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকেও এক সূত্রে বেঁধেছিল উপন্যাসিক । সেখানে লেখক বলেন -- " ট্রেনের কামরায় অল্প কিছু সংখ্যক হিন্দু । সবাই প্রায় বুড়ো বুড়ি । যাত্রীদের বাদবাকি সকলেই মুসলমান। হিন্দুযাত্রীদের মধ্যে একজন ছিলেন কোন মিশনের সাধু । মুন্ডিত মস্তক ।

পরনে গেরুয়া । রং ময়লা । মাথা বেশ লম্বা । হাড়গুলো চ্যাটালো । আপন মনে গীতার শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে চলেছেন । '' (১০ / কে কোথায় যায়) । এই অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন জীবন যন্ত্রণা, বয় ও বাঁচার তীব্র লড়াই । সেখানে শেষ অবস্থার একটি গুর্খা টি-বি রোগী ও তার স্ত্রী । লেখক বলেন -- '' বউটিকে দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল । কাঁদছিল না বটে , কিন্তু মুমুর্ষ স্বামীর শিয়রে কেমন যেন গন্ধ লাগা অবস্থায় সে বসেছিল। তাকে দেখে সত্যিই মনে হচ্ছল সে যেন বিষাদের প্রতিমা ।'' (১০ / কে কোথায় যায়) -- যাত্রাপথে ট্রেনে উঠেছিল একটি সাপ । একজন সেই সাপদেখে চিৎকার করে উঠেছিল । '' তাঁর চিৎকার শুনে গুর্খার বউ ব্যাপার দেখার জন্য দৌড়ে এল । আমি পেছনে একবার তাকিয়ে দেখলাম সেই গুর্খা রুগীটি আতঙ্কে উঠে বসেছে । তার সারা মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে । '' (১০ / কে কোথায় যায়) । ফণা তোলা সেই সাপের কামড়ের থেকে বাঁচার জন্য সেই গুর্খা রোগিটি ট্রনের নঈচে ঝাঁপ দিয়ে মারা যায় । '' বন্ধ দরজা খুলে সে নিজেই ঝাঁপ দিয়েছিল । আত্মহত্যা করবে বলে নয় । সাপের হাত থেকে বাঁচবার জন্য । কখন ? না যখন দুরন্ত টি-বি রোগ তার গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দিয়েছিল । ছিল শুধু টান দেবার অপেক্ষায় । লড়াইতে কিংবা রোগে মৃত্যুবরণ করাটা তার কাছে ছিল স্বাভাবিক । তাতে সে কখনও সাহস হারায়নি । কিন্তু সাপের কামড়ে ? সেটা তার কাছে একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু । তাই সে ভয় পেয়েছিল । (১০ / কে কোথায় যায়) । জীবন , মৃত্যু ও ভয়ের একটি করুণতম কাহিনী এখানে উপন্যাসের বিষয় সয়ে উঠেছে। উপন্যাসের এক একটি চরিত্র ও ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ঘটনা উপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনার দক্ষতায় এবং সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম পারম্পর্যে পাঠকের মনে আর বিচ্ছন্ন হয়ে থাকে না । এই উপন্যাসে এই ছোট ঘটনাগুলি একটি অন্তঃগূঢ় আকর্ষনে আবদ্ধ । ঠিক এভাবে উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র উপেনবাবু ক্রমশ: চলতে চলতে ১১ শ তম পরিচ্ছেদে সহদেব তাতিয়ার সম্পর্ক বৃত্তে অন্তভুক্ত হয় । ক্রমশ একটি বিস্তৃত পরিধী যুক্ত বৃত্তে উপেনবাবু-সহদেব-তাতিয়া অনুকুল আবর্তিত হয় । আসাধারন শিল্প সার্থকতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় উপন্যাসের ছোট ছোট কাহিনীগুলি একটি অভেদ্য বেষ্টনীযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন । উপন্যাসের ১১ শ তম অনুচ্ছেদের প্রথমেই আমরা দেখি সহদেবের '' সব কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে সন্দে হ আর অবিশ্বাস । নিজের ভেতর জোর পায় না । ওর বেশিরকম জোর খাটানোর ইচ্ছের মধ্যেও আছে ওর এই জোর না - পাওয়ার ব্যাপারটা । এখন একটা জিনিসও বুঝে উঠতে পারছিনা । উপেনদাকে ও মুঠোয় পুরেছে , না উপেনদা ওকে ট্যাঁকে গুঁজেছেন । '' (১১/ কে কোথায় যায়) । তারা অনুকূলকে শেষ মুহুর্তে পেয়েছে। অনুকুলের সঙ্গে তাদের তর্কের শেষ সুযোগ আজকের এই রাত — ''গতবার এসে একচোট হয়েছিল। অনুকুল তর্কে

সহদেবের সঙ্গে পারেনি। কিন্তু সেই সঙ্গে সহদেব যে ঠিক, এটাও সে মানেনি। অনুকুল খোলাখুলি বলল, 'তোমাদের যুক্তিতর্ক আর সুক্ষ্মবিচার নিয়ে তোমরা থাকো — আমি জীবন আঁকড়ে নিজেকে ধরে থাকব।'' (১১/ কে কোথায় যায়)

এই অধ্যায়ে ঔপন্যাসিকের প্রধান চরিত্র নির্বাচনের এবং উপেনবাবুর প্রতি লেখকের গুরুত্ব প্রদানের কারণ আমরা অনুধাবন করতে পারি। জীবনকে যে দার্শনিক চেতনায় তিনি দেখেছেন তার ব্যাখাও আমরা এই অধ্যায়ে পাই। এখানে তাতিয়ার উপেনবাবুকে শ্রদ্ধার মধ্যে, তাঁকে সেবা করার মধ্যে এবং ভালোবাসার মধ্যে। এখানে প্রধান চরিত্রের প্রতি স্রষ্ঠার শিল্পীসত্ত্বার নমনীয়তার অর্ন্তনিহিত কারণটিও আমরা মুপলব্ধি করতে পারি। উপেনের কয়েকটি উক্তির সাহায্যে আমরা এই বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে পারি — অ) ''জানো, তাতিয়া — জানো, সহদেব — যদি তোমরা জিগ্যেস কর, স্বদেশীতে কেন আমি এলাম — তাহলে আমি ইংরেজদের সামনে রেখে এখুনি দশ কথা শুনিয়ে দিতে পারি, তার জন্যে আমাকে কিছু ভাবতে হবে না।..... দেশ আর মানুষ। বন্ধন আর মুক্তি। আমার ভেতরে থেকে সে-ই সব চিনিয়ে দেয়। (১১/ কে কোথায় যায়) আ) ''সব যদি আগেভাগে জেনে নেওয়া যায়, বাঁচার আনন্দটাই তো তাহলে মাটি হয়ে যাবে। তারপর কী? জীবনে যদি তারপরটাই না থাকে, তাহলে সে — জীবনে কোনো স্বাদ কিংবা আহ্লাদ থাকে? এক পা করে এগোব আর মন বিস্ময়ে ভরে উঠবে।'' (১১/ কে কোথায় যায়) ই) ''একেবারে নির্ভূল ব্যাপার আমরা যন্ত্রের কাছ থেকে চাই। ঠিক আর ভুল, দোষ আর গুণ মিশিয়ে হবে মানুষ। ভুল না থাকলে কোথায় থাকত উদ্ভাবন? কোথায় থাকত আবিষ্কারের বিস্ময়?''

একটি ট্রেন যাত্রার সঙ্গে অনায়াসে লেখক সূক্ষ্ম শিল্পচাতুর্যের মধ্যে দেশপ্রেম ও জীবনসত্যের নিগুঢ় তত্ত্বকে তুলে এনেছেন উপন্যাসের দ্বাদশ অধ্যায়ে — ''গোটা দেশটা যেন উল্টোপাল্টা ট্রেনে বসে আছে। ভয়ের কথা এই, ভুলটা যে ধরিয়ে দেবে ধরিয়ে দেবে সেই চেকার কোথায়?(১২/ কে কোথায় যায়) এই উপন্যাসের ত্রয়োদশ সংখ্যক পরিচ্ছেদেও আমরা লেখকের জীবনদর্শন ও চরিত্র অঙ্কণের দক্ষতার পরিচয় পাই। সেখানে একবার উপেনবাবু সম্পর্কে সহদেব বলে — ''তত্ত্বের চেয়েও ঢের বড় জিনিস হল জীবন। উপেনদাকে দেখো, যতক্ষণ আমরা পাড়ে দাঁড়িয়ে হিসেব করব, উনি তার মধ্যে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে হয় ডুবন্তকে তুলবেন নয় মরবেন।''(১৩/ কে কোথায় যায়)

এই উপন্যাসের চতুর্দশ সংখ্যক পরিচ্ছেদে তাতিয়ার অভিশপ্ত পরিবারে বেড়ে ওঠার কথা আমরা জানতে পারি। যে পরিবারে মানুষগুলো নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসতে শেখেনি। তাতিয়া আশৈশব

দেখেছে তার মা-বাবা উভয়েরই অস্বাভাবিক সম্পর্কের কুৎসিত চিত্র। সমাজের মানুষের কাছে সে ভয়ে ভয়ে সর্বদা মুখ লুকিয়ে রাখত। তার মা-বাবার কথায় সে আমাদের জানায় — বাবা বোধহয় বিয়ের আগেই বেশি লোভ করতে গিয়ে নিজেকে ফুরিয়ে ফেলেছিলেন।মা-র লোভ ছিল পরিচয় দেওয়ার মত স্বমীর, মা-র মন ছিল না, শরীর ছিল।''(১৫/কে কোথায় যায়) ছেলেবেলা থেকেই সে কারো ভালোবাসা তেমনভাবে পায়নি। সেজন্য সে এখন মানুষের ভালোবাসার কাঙাল। এই কাঙালিপনা থেকে এবং উপেনবাবুর সাহচর্যে সে এখন চা-বাগানের সামান্য শ্রমিক-মা-বাবা-সমাজের অন্য সবার সবকিছু বদলাবার কথা ভাবে। এভাবে একটি সাধরণ চরিত্রকে উন্নীত করে অসাধারণ করে তোলেন ঔপন্যাসিক। তার ক্রমোন্নতি আমার এর আগের আধ্যেয়েই দেখি। সেখানে সে নিজের আত্মবিশ্লেষণের সঙ্গে উপেনবাবু সম্পর্কে বলে — ''অমন করে এ-পর্যন্ত আমি কারো ভেতর দেখতে পাইনি। তুমি আমি আমরা সবাই নিজেদের ঢেকে রেখেছি। নইলে যে ফাঁস হয়ে যাব। এই একজন লোক দেখলাম যার ভয় নেই। ভয় নেই বলেই আছে ভালোবাসা। কাকুতিমিনতি নেই। তার ভালোবাসায় আছে জোর। সেই জোরেই পৃথিবীকে সে বদলাতে চাইছে।''(১৫/ কে কোথায় যায়)

এই উপন্যাসের বিশেষ এক আদর্শের চেতণায় উপেনবাবু চা-বাগানের বঞ্চিত দুখন্তি, সোনিয়া, সোনিয়ার-মা এমনকি তার ছোট্ট বাচ্চাটিকেও ক্রমশ: দীপ্ত হয়ে জয়ীরূপে দেখেন। এই উপন্যাসে পরাধীন ভারতের স্বদেশীদের আন্দোলন, জেলে যাওয়া, ফাঁসী, তাঁদের বন্দেমাতরম্ ধ্বনি প্রভৃতি অনুষঙ্গ পাই আমরা। সংগ্রামী মানুষের ওপর পাশবিক অত্যাচার এবং সংগ্রামী মানুষের মাহাত্ম্য ঔপন্যাসিকের ভাষায় উচ্চমানের মাত্রা যুক্ত করেছে — ''সেই জানোয়াররা লড়াই করে মানুষ হয়েছে। আর তাদের শুষতে শুষতে একদলমানুষ জানোয়ার হয়ে গেছে।'' (১৫/ কে কোথায় যায়) এই উপন্যাসটির ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে আমরা ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক চেতণা, সমাজভাবনা ও জাতীয়তাবোধের পরিচয় পাই। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র উপেন মজুমদারের মধ্যে লেখকের রাজনৈতিক সত্ত্বার উৎকর্ষতার পরিচয় নিহিত রয়েছে। উপন্যাসটির শেষ পরিচ্ছেদে উপেন মজুমদারকে পার্টির মানুষজন ফুল দিয়ে বরণ করে মিছিল ধরে স্বাগত জানায়। এভাবে একজন নি:স্বার্থ পার্টিকর্মীকে সম্মান জ্ঞাপন এবং কৃতজ্ঞতা বশত: তার চিকিৎসার ব্যাবস্থা নেবার দিক নির্দেশ করেছেন ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে। কাহিনী বর্ণনা, চরিত্র সৃষ্টি, গদ্য ভাষার অভিনব বয়ন, মহৎ জীবনদর্শন ও পাঠকের হৃদয়ের রস সৃষ্টির সার্থকরূপ এই উপন্যাসে আমরা পাই।

ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় উপন্যাস ''অন্তরীপ বা হ্যান সেনের অসুখ'' (১৯৮৩)। লেখক এই উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন সুকুমার সেনগুপ্ত ও শেফালী সেনগুপ্তকে। উপন্যাসটি

পান্ডুলিপি ভূমিকা অংশ ছাড়া সংখ্যা ছাড়া সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত ছয়টি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন লেখক। অসামান্য উপলব্ধি ও উচ্চ জীবনদর্শন এই উপন্যাসে পাই আমরা। সমাজ মানুষের স্বাভাবিক জীবনে কারো 'কুষ্ঠ' রোগ হলে সেই রোগীর জীবন ভাবনা এবং সেই রোগী সম্পর্কে সমাজ-পরিবার-জগতের কেমন প্রতিক্রিয়া ও ভাবনা আসে নিপুণ প্রজ্ঞা ও সমাজ সচেতন দৃষ্টিকে শৈল্পিক রূপদানের প্রয়াস এই উপন্যাস। এতে আমরা সাম্প্রদায়িক বৈসম্যহীন শুদ্ধ মানব সমাজ গঠনের উৎকর্ষ জীবন চেতনা ঔপন্যাসিকের কাছ থেকে পাই। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও ভোট পদ্ধতি সমাজে কিভাবে মানুষকে স্বার্থপর ও সংকীর্ণ করে তোলে সেই ত্রুটিপূর্ণ সিস্টেমকে প্রত্যক্ষ করি আমরা আলোচ্য উপন্যাসে। এই উপন্যাসের কাহিনী অভিনব পদ্ধতিতে লেখক উপস্থাপন করেছেন। পট বিন্যাসের স্টাইল ও কাহিনী বর্ণনার পদ্ধতিও অভিনব।

'অন্তরীপ বা হ্যান সেনের অসুখ' উপন্যাসের কাহিনী প্রত্য জীবন অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। অথচ কাল্পনিক কোনো কাহিনীও নয়। এতে রয়েছে একটি ছোট্ট ইতিহাস। কোনো একদিন কোনো একজন ট্রেনযাত্রী এই উপন্যাসের কাহিনী সম্বলিত পান্ডুলিপি লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাম-ঠিকানা লেখা একটি বড় খামে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেটি পুরোপুরি ইংরেজি লেখা পান্ডুলিপি।

সেই অজ্ঞাত পরিচয় ট্রেনযাত্রী সেই পান্ডুলিপিটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজিতে লেখা সেই বড় পান্ডুলিপিতে লেখক ও প্রেরকের পরিচয়ের হদিশ নেই। অবশ্য লেখকের এই নাম প্রকাশে অনীহার কারণ নির্দেশ করেছেন সম্ভাব্যরূপে। সেই সম্ভাব্য কারণ গুলির মধ্যে আমরা একজন নিষ্কাম ও নির্মোহ লেখকের পরিচয় পাই। এতে নিজের সৃষ্টির প্রতি লেখক নিজের স্বত্ব আরোপ করেন নি। একজন স্রষ্টার পূর্বের দুরবস্থার কথা ব্যক্ত করেছেন লেখক। তিনি বলেন - ''আগে বিয়েবাড়িতে হাতমোছার কাগুজে রুমালে পদ্য লেখার জন্যে কবিদের ডাক পড়ত।'' সেকালে নবজাতকের নামকরণে ও শখের কাগজে কেবল লেখকদের প্রয়োজন ও আগ্রহ প্রকাশ করতেন প্রকাশকগণ।

লেখার জগতে প্রকাশকদের সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিক উপলব্ধি আমরা এই উপন্যাসের ভূমিকা অংশে পাই। লেখক বলেছেন - ''আমাদের প্রকাশকেরাও চিজ বটে। মাইনে দিয়ে সম্পাদক না রেখে তাঁরা শুধু বাঘা বাঘা পত্রিকার সম্পাদকদের পেছনে লাইন দিয়ে দাঁড়াবেন। তাঁরা চান বড় জোর চেনাজানা লেখকদের সুপারিশ। বই লেগে গেলে প্রকাশকের হাতযশ, না লাগলে লেখকদের মুন্ডুপাত। এইভাবে কত পান্ডুলিপি নিয়ে যে প্রকাশকদের দোরে দোরে ফেরি করে বেড়িয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। বেশির ভাগটাই হয়েছে 'ভস্মে ঘি ঢালা'। দু-চারটি ক্ষেত্রে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লেও পরে

প্রকাশক আর গ্রন্থকারই কৃতিত্বটা নিজেদের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে নিয়েছে যে আমাকে তার একটু খুদকুঁড়োও ছুঁড়ে দেয়নি।'' (ভূমিকা/ অন্তরীপ বা হ্যান সেনের অসুখ) সেই পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে লেখক তাঁর জীবনের আর্থিক সংকট ও প্রকাশকগণের ব্যবসায়িক উপেক্ষা এখানে অত্যন্ত শৈল্পিক চেতনায় বিন্যস্ত করেছেন। এখানে নাম ভাঁড়িয়ে, কোথাও ছদ্মনামে আবার বেনামীতে লিখে লেখক অনেক সময় মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েছেন। জীবনের এই অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসে পাণ্ডুলিপি নিয়ে ভূমিকা অংশ যুক্ত করার সার্থকতা।

উপন্যাসের লেখকের স্বত্ব নিয়ে দাবি করা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন। সাহিত্য দৃষ্টিতে বেনামীতে, নাম ভাঁড়িয়ে বা ছদ্মনামে লেখার আঙ্গিককে এখানে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছেন। এখানে উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির অভিজ্ঞতাকেও যুক্ত করেছেন। এই উপন্যাসে লেখক স্বার্থশুণ্য, সাম্প্রদায়িক বৈসম্যহীন, সাম্যতান্ত্রিক সুস্থ সমাজ ও সুস্থ্য জীবন ভাবনার উন্নত, জীবন দর্শনের শিল্প সৃষ্টির নিদর্শন রেখেছেন।

এই উপন্যাসে লেখক মহৎ জীবন দর্শন ও কাহিনী বিন্যাস একটি রোগকে আশ্রয় করে শিল্পরূপ দিয়েছেন। রোগটি হল কুষ্ট। কুষ্ট রোগটির লেখক পোষাকি নাম দিয়েছেন 'হ্যানসেনের অসুখ'। এই রোগের ওপর ভিত্তি করে এই উপন্যাসে শৈল্পিক নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন ঔপন্যাসিক সুভাষ। হাসপাতালে এই রোগীদের অবস্থা সম্পর্কে লেখক লিখেছেন - ''তুমি সেরে গেছ, তোমার আর অসুখ নেই। শুনে শুনে কান পচে গেছে।'' (১ - অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। এই রোগের ভয়ঙ্করতা ও সামাজিক উন্নাসিকতাপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে লেখক লিখেছেন - ''কিন্তু এই রোগে সেরে যাওয়ার চেয়ে বড় অসুখ আর নেই। তুমি জান না, না ? ন্যাকা। তুমি হাড়ে হাড়ে জান, সেরেছ কি মরেছ। এখান থেকে গেলে দুনিয়ার কোথাও তোমার ঠাঁই হবে না। নরকেও নয়।'' (১ - অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। লেখক নিখুঁত পর্যবেক্ষণী দক্ষতায় এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন যে, প্রথম প্রথম এই ধরনের রোগীর বাড়ির লোকজন যখন হাসপাতালে দিয়ে যায়, তখন তাদের 'হাপুস' নয়নে বুক ভেজানো কান্না। যেন 'মাটি অবধি ভিজে কাদা হয়ে যায়।' হাসপাতালে রোগী রেখে এই সমস্ত রোগীর বাড়ির লোকেরা বাড়িতে ফেরে। 'যাবার সময় ঝুড়ি ঝুড়ি সান্ত্বনা আর পিপে পিপে আশ্বাস। প্রথম দিকে বাইরে থেকে একটা দুটো চিঠি দিয়ে, কেউ কেউ হাসপাতালে এসে এক আধবার দেখাশুনা করে যান। তারপর রোগী যত ভাল হতে থাকে, ততই রোগীর খবর নেওয়ায় ভাঁটা পড়তে থাকে। ধীরে ধীরে রোগীও উপলব্ধি করে যে তার সেই পরম নিকট আত্মীয়েরা তাকে তার আগের মতো কাছে পেতে চায় না। এই বিষয়টি ঔপন্যাসিকের ভাষায় - ''দিনে দিনে রুগিরও জ্ঞানচক্ষু খোলে। নতুন পরিবেশে

গোড়ায় তার যতটা অসহ্য লেগেছিল, আস্তে আস্তে সেটা সয়ে যেতে থাকে। স্নেহমমতার ঘনবদ্ধ খাপি ভাবটা কীরকম জ্যালজেলে হতে হতে ফর্দা ফাঁই হয়ে যায়। পুরনো মুখগুলো সব দোকানের মুখোশের মত স্মৃতির দেয়ালে সার বেঁধে ঝুলতে।

তারপর একদিন হাসপাতাল থেকে ছুটি হওয়ার সেই চরম দিনটা এসে যায়। আগেই বাড়িতে নিয়ম মত খবর যায়। কেউ নিতে আসবে না সবাই জানে। তবু অপেক্ষা করাটা একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে। সবাই জানে এ-রোগে হাসপাতালে গছিয়ে দেওয়া মানেই সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দেওয়া।'' (১-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। এই শ্রেণীর সামাজিক ও পারিবারিক দুর্বিসহ অবস্থা নিখুঁত পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে পাঠককে নির্দেশ করেছেন ঔপন্যাসিক সুভাষ। সমাজের মানুষ এই শ্রেণীর মানুষকে রুগ্ন অবস্থায় ভয় পায়। সেকারণে সেই রোগীর বাড়ির লোকজন ছুটোছুটি শুরু করে হাসপাতালে দেওয়ার জন্যে। কেননা হাসপাতালের নিরাপদ জায়গায় দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টার ত্রুটি হলে পাড়ার লোকের চাপ পড়ে। অগত্যা সেই রোগীকে নিরুপায় হয়ে রাস্তায় এসে বসতে হয়। জনমতের প্রচন্ড চাপে সেই রোগী বাধ্য হয়ে হাসপাতালে পৌঁছে যায়। কেননা রাস্তায় পড়ে থাকলে সুস্থ্য মানুষের ভয় আবার দেখায়ও খারাপ। তাই লেখক বলেন - ''মরে গেলে আপদ যেত, কিন্তু সেরে গেলে ?'' অতিবাস্তবতার দৃষ্টিতে লেখক সেইসব রোগীর অবস্থা সম্পর্কে বলেন - ''ভালবাসা, নাড়ির টান, রক্তের সম্পর্ক - সবই কিছুদূর অবধি।''

লেখক আলোচ্য উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়েই দেখিয়েছেন স্বাভাবিক মানুষের সমাজ জীবন এবং কোষ্ঠী রোগীর অন্তর্ভেদী মর্মবেদনার স্বরূপ। কুষ্ঠ রোগীদের উপলব্ধির জায়গাটিতে তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়ের একাত্ম হয়ে তাদের কথাকে শিল্পিত রূপে নির্মাণ করেছেন। ফলে তাঁর ভাবপ্রকাশ খুবই স্বাভাবিক, সাবলীল ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন - ''শুনি নাকি মরার বাড়া গাল নেই। আছে। তার প্রমাণ আমরা। আমাদের মধ্যে যাদের নাকগুলো রোগে খেয়ে নেয়, তারা ভূত আর শাঁকচুন্নির মত খোলা গলায় কথা বলে। রাতবিরেতে আমাদের কাউকে আচমকা দেখলে লোক ভূতের ভয়ে মূর্ছা যাবে। অথচ ভূতদের যে সুবিধে আছে আমাদের তা নেই। ভূতে মারে ঢেলা। আর আমাদের উল্টে ঢিল খেতে হয়। ভূতকে ঢিল যদি মারাও হয়, ভূতের লাগে না। আমাদের ঢিল মারলে লাগে। ভীষণ লাগে। রক্ত বেরোয়।'' (১-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। সমাজের চোখে বোঝার মতো উপেক্ষিত সেই সব মানুষের হৃদয়ের যন্ত্রণার সঙ্গে একাত্ম হয়ে লেখক সুভাষ তাঁর সমাজ সচেতন, সংবেদনশীল, উচ্চ অনুভূতির শিল্পীসত্তার পরিচয় দিয়েছেন এখানে। আলোচ্য

উপন্যাসের ১ম অধ্যায়ে আমরা কুষ্ঠ রোগীর সামাজিক অবস্থানের শৈল্পিকরূপ আমরা পাই। এই অধ্যায়ের বিষয়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে লেখকের মহৎ জীবন দর্শনের জলছবি।

উপন্যাসের ২ অধ্যায়ে আমরা দেখি একটি চরিত্র চার্টার্ড অ্যাকুন্ট্যান্ট জমিদারদের বড়বাবু। চলমান উচ্চবিত্ত জীবনে এই কুষ্ঠ তামাশাচ্ছলে কোনোক্রমে এলে জীবনের অন্তঃসারশূণ্য, নিঃস্ব, একেবারেই অস্তিত্বহীন ও পৃথিবীর দরিদ্রতম অবস্থার উপলব্ধি যে হয় ; তার জীবন্ত ছবি সেই বড়বাবু। অসামান্য নিখুঁত শিল্প সৃজনের বিন্যাসে এই অধ্যায়ে সেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের দেহে এই রোগের চিহ্ন দেখিয়েছেন লেখক। এখানে কুষ্ঠ রোগীর স্বাভাবিক লক্ষণগুলির সম্যক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন লেখক। আকাশ পথে প্লেন যাত্রায় এই বড়বাবু ফাইলপত্র নিয়ে অফিসের কাজে বেড়িয়েছেন। প্লেনে সিগারেটের আগুনে সেদিন তার হাতের আঙুল পুড়ে গেলেও টের না পাওয়া ও পরে সিটের যাত্রীর তামাশা তারপর সেই আঙুলগুলো ভালোকরে নখ দিয়ে টিপে ও চেপে ধরলেও টের না পাওয়ায় কুষ্ঠের আন্দাজ হয়। তারপর সেই সহযাত্রীর পরামর্শে বড়বাবু ডাক্তারের কাছে গিয়ে নিশ্চিত হয়ে যে, তার কুষ্ঠ হয়েছে। কুষ্ঠ হওয়ার পর একজন সমাজের মানুষের যে যন্ত্রনাকাতর উপলব্ধি আসে তার জীবন্ত ছবি এঁকেছেন লেখক এই অধ্যায়ে। কুষ্ঠ রোগ শরীরে হলে মানুষের যে মাসিক প্রতিক্রিয়া হয় তার বাস্তব ও শিল্পসম্মত রূপ এখানে পাই। বড়বাবু ডাক্তারের মুকে তার কুষ্ঠ হয়েছে শুনে ভাবে ''কুষ্ঠ । ছোট্ট একটা শব্দের মধ্যে যে এত জোরে ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে পারে, আগে কখনও ভাবিনি।'' (২-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। এই অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন যে কুষ্ঠ তলে একজন মানুসের মনের ভেতরে কিরকম প্রতিক্রিয়ার ঝড় হতে পারে। নিপুণ হাতে বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে লেখক সেই প্রতিক্রিয়ার পরিচয় আমরা পাই সেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জমিদারদের বড়বাবু চরিত্রে। বড়বাবু তার সদ্য কুষ্ঠ হয়েছে জেনে ভাবে - ''একটু আগেও আমি যা ছিলাম এখন আর তা নই।'' সে বলে - ''রাস্তার কোনো সুস্থ লোককেই আমি সহ্য করতে পারছি না। নিজেকে যতই অসুখী মনে হচ্ছে, ততই সুক সম্ভোগের জন্যে একটা হন্যে হওয়া ভাব মাথা চাড়া দিচ্ছে। '' (২-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। বড়বাবু এই অধ্যায়ে নিজেই বলে - '' আমার ভেতরে ফুঁসছে একটা অন্ধ রাগ। ঘৃণা ছাড়া তখন আমার শরীরে আর কিছুই নেই।'' (২-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। বড়বাবুর সংসারের প্রতি আর কোন টানই থাকল না। উড়তে উড়তে একটা ঘুড়ি হঠাৎ উপড়ে গেলে যে অবস্থা হয় বড়বাবুর বর্তমান মানসিক অবস্থা সেরকমই। লেখক বড়বাবুর কুষ্ঠ হয়েছে নিশ্চিত হবার পর যেরকম মানসিক টানাপোড়েন আসে এই অবস্থাটা সুন্দর উপমায় শিল্পরূপ দিয়েছেন। নিজের অবস্থা সম্পর্কে সে বলে, - ''বাইরে এসে দেখি সারা পৃথিবীটা আমার পায়ের নীচে টলছে। এরোপ্লেন থেকে

ঝাঁপ দিয়ে প্যারাসুট না খোলা অবধি যে অবস্থাটা হয় আমারও হল সেই রকম হাল। সোঁ সোঁ করে নামতে নামতে হঠাৎ এক সময়ে প্যারাসুটটা ছাতার মত খুলে যায়। পায়ের নিচে জমি না পেলেও শূণ্যের মধ্যেই ভাসতে ভাসতে একটু করে ক্ষণস্থায়ী ঠাঁই মেলে। শেষ পর্যন্ত ধপাস করে মাটিতে পড়া - একমাত্র তখনই যা একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়।'' (২- অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। এরকম অবস্থায় বড়বাবু আত্মহত্যার কথা ভাবে।

সে ডাক্তারের কাছে নিশ্চিত হয়ে বাড়ইতে ফিরে বলে যে তার কুষ্ঠ হয়েছে। এরপর তার বাড়িতে তার ছোট্ট ছেলে যতবারই তার কোলে আসার জন্য হাত বাড়ায়, সে কায়দা করে ততবারই এড়িয়ে যায়। বাড়ির ভেতরের চেয়ার, টেবিল, সোফা কোনোটাকেই আর নিজের বলে মনে হয় না। নিজেকে মনে হয় বাইরের লোক। এমত অবস্থায় তার স্মৃতিতে আসে সারা জীবনের নানা কথা। মা-বাবা ও শৈশবের কথা। বাড়ির কথায় সে বলে - ''বাড়িতে এসেই বলে দিয়েছিলাম আমি আর মাছ-মাংস খাব না। রোগের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা জানি না - তবে আমার কেমন যেন গন্ধের একটা বাতিক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আঁশটে গন্ধটা কিছুতেই আমার সহ্য হচ্ছিল না। বসার ঘরে গোছা গোছা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে অনেক রাত অবধি পড়েছি। বাবার কিছু ধর্মগ্রন্থ ছিল ; এই প্রথম ধুলো ঝেড়ে সেগুলো টেনে বার করলাম।'' (৩-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। মানুষের বিপদের একমাত্র আশ্রয় - পরম শক্তিময় কোনো অধ্যাত্ম শক্তি। এখানে বিজ্ঞান মনস্ক যুক্তিতে লেখক বড়বাবু চরিত্রে দেখিয়েছেন সেটি।

এখান থেকেই বড়বাবুর জীবনের আর একটি পালাবদলের অধ্যায় শুরু হয়। তার কথায় - ''অসুখটা যখন ধরা পড়ল, তখন প্রথমেই আমার আত্মহত্যার কথা মেন হয়েছিল। কিন্তু ভাবতে গিয়ে বয় হল।.....কিছু নেই, শুধু শূন্যতা - এমন একটা অন্তহীন একঘেয়ে অবস্থার কথা ভেবেই আমি পিছিয়ে গিয়েছিলাম। জীবনকে নাকচ না করে আমি বেছে নিয়েছিলাম দ্বিতীয় এক জীবন।'' (৩-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। আগের জীবনের সঙ্গে এই দ্বিতীয় জীবনের কোনো মিল নেই। নিজেরই শরীর সম্পর্কে তার এক স্বতন্ত্র্য অনুভূতি হয়। সে বলে - ''একই আমি দুই হয়ে গিয়েছি। জেগে থাকার প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমি যেন আর কেউ হয়ে নিজেকে দেখছি। শরীরটা যেন আমার হয়েও আমার নয়।'' (৩-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। সে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে সেই ভয়াবহ অসুখের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাতে নিঃশব্দে নিজেকে বাড়ির বাইরে আত্মগোপন করে। রাস্তায় রাস্তায় তীর্থ-তীর্থ, আমুক পীর, তমুক পীর, বিভিন্ন দরগা, দেবস্থান, হিমালয়ের সব দুর্গম গুহাগুম্ফা ও সব তীর্থস্থান ঘুরতে ঘুরতে তার ঠাঁই হয় এক হাসপাতালের বারান্দা।

আলোচ্য উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতেই সে বলে - '' হাসপাতালে না এসে পড়লে আমার হাত দুটোকে কিছুতেই আর রক্ষা করা যেত না। বসে যাওয়া নাকের ডগা আর ফোলা -ফোলা কানের জন্যে আমার মুখ সে কী বীভৎস দেখতে হয়েছিল, বলার নয়।'' (৪ -অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। এরপর সে হাসপাতালে সেরে উঠলে হাসপাতাল থেকে ছোট্ট একটা পুঁটুলি হাতে বেরিয়ে পড়ে। হাসপাতালের গেট পার হয়ে সে পৃথিবীতে নিকট আত্মীয় পরিজনহীন একাকী জীবনকে উপলব্ধি করে। রাস্তায় পা দিয়ে এই প্রথম তার মনে হয়, তার সামনে এখন আর কেউ নেই কিছু নেই। জীবনের যে এক ভিন্ন অনুভূতি। তার স্মৃতি পুরনো জীবনের সব স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যায়। তার আপনজনের মুখ গুলো ঝাপসা ও অপরিচিত মনে হয়।

এরপর একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে তার চোখ বুজে আসে। হঠাৎ আঙুলখসা একটা হাত ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে ডাকে। ঘুমের ঘোর কাটতে না কাটতে সে দেখে, 'বিশ-তিরিশটা লোকের একটা দঙ্গল। সবার কাধে একটা করে ভিক্ষের ঝুলি।' সেদিনের তার জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটি ভিন্ন উপলব্ধি হয়। সে বলে - '' আমার কোথাও যাবার ছিল না। ওরা আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। আমি সেই বাতিল মানুষগুলোর হাতে নিজেকে নিশ্চিন্তে সঁপে দিলাম। শুরু হল আমার অন্য এক জীবন। বাড়ি ছাড়ার পর থেকে আমি শুধু ভেসে ভেসে বেরিয়েছি। এবার আমি পায়ের নিচে পেলাম থিতু হওয়ার মাটি আর সঙ্গী হিসেবে পেলাম সমান সমান মানুষ। একসঙ্গে এত ভাঙাচোরা আর তেড়াবাঁকা মানুষকে আকাশের নিচে মাথা উঁচু করে থাকতে আগে কখনও আমি দেখিনি।'' (৪-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)।

বড়বাবুর এই উদ্ধৃতিতে লেখকের শব্দ ব্যবহারে - 'বাতিল মানুষ', 'সমান মানুষ' সমাজতান্ত্রিক সাম্যভাবনার মানবতাবাদী সাহিত্য স্রষ্টার পরিচয় পাই। বড়বাবু চরিত্রটির বিভিন্ন সময়ের উপলব্ধি প্রকাশ ও চরিত্র নির্মাণে লেখকের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সাহিত্য স্রষ্টার নিদর্শন পাই। কুষ্ঠের মতো একটি রোগে আক্রান্ত বড় বাবু চরিত্রের মধ্যে লেখক জগৎ জীবনের কঠিন সত্য সাহিত্যের বিষয় করে সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সফল স্রষ্টার পরিচয় দিয়েছেন। ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ, চরিত্র নির্মাণ, জীবন দর্শন ও সামাজিক দায়বদ্ধ শিল্পীর সার্থক নিদর্শন এখানে পাই।

এরপর কুষ্ঠরোগী বড়বাবু সেই রোগীরই এক খোলা বস্তির জীবনে মিশে যায়। সেই বস্তি যে গ্রাম তার নাম তালবেতালিয়া। এই তালবেতালিয়ার সমস্ত বিকলাঙ্গ মানুষগুলো হৈ হৈ করে শহরে গিয়ে বর্গীর মতো হানা দিয়ে ভিক্ষে আদায় করে নিয়ে আসে। এখানে কতগুলি বিকলাঙ্গ মানুষের উচ্চবিত্ত ধনিক শ্রেণির কাছ থেকে বাঁচার অধিকার একপ্রকার ছিনিয়ে নেয়। জীবন সংগ্রামে ও অধিকার

অর্জনের লড়াইয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, এরা শহরে গিয়ে বিকলাঙ্গ ও কুষ্ঠ রোগটাকে অবলম্বন করে সামাজিক ও স্বাভাবিক মানুষের কাছ থেকে বাঁচার রসদ অভিনব ভিক্ষে পদ্ধতির মধ্যে লেখক সুভাষ বিকলাঙ্গ ও বস্তিবাসী মানুষ গুলোকে দায়বদ্ধ শিল্পীসত্ত্বায় জীবন যুদ্ধে জয়ী করে তুলেছেন।

তাদের সেই বিস্ময়কর ভিক্ষে পদ্ধতি সম্পর্কে লেখক সুভাষ বড়বাবুর জবানীতে বলেন - ''যে ক-জনের নাক খসে গিয়ে দাঁতগুলো ঠেলে বেড়িয়ে এসেছে, সেই গলাকাটা, আঙুল -খসা, খোনা লোকগুলো গলা দিয়ে গোঙানের আওয়াজ বার করে আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে এমনভাবে তান্ডবনৃত্য জুড়ে দিল যে আমি তো একেবারে হতভম্ব।.....আমার মনে হচ্ছিল আমরা যেন কোনো বর্গীর দল। হা রে রে রে বলে হানা দিয়েছি এক ভিনদেশী রাজত্বে।'' (৪-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। এই অধ্যায়ের শেষে সেই বিষয়ে বড়বাবু আবার বলে - ''যারা চোখ খামচে জল বার করে ভিক্ষে চায়, তাদের সঙ্গে এদের এক ফোটা মিল নেই। বিকলাঙ্গ বটে, কিন্তু ভাবখানা হল পাইক পেয়াদার। ভিক্ষে নয়, একেবারে যাকে বলে গলায় রসুড়ি দিয়ে আদায়।.....তারপরই নাকি বাপু বাছা করে ভিক্ষে দেওয়ার ধূম পড়ে গেল।'' (৪-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে তারা শহরে হৈ হৈ রৈ রৈ করে আতঙ্ক ও কঠিন রোগের ছোঁয়াকে আশ্রয় করে। নিজেদের বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। এখানে স্বাভাবিক সমাজের অবজ্ঞার ও ঘৃণার প্রাণী গুলিকে লেখক বিশেষ জীবন দর্শনে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন। সেখানে লেখক এও দেখিয়েছেন সভ্য শিক্ষিত নাগরিক সভ্যতা কতকগুলি অসুস্থ্য মানুষের প্রতি কতটা অমানবিক ও নিষ্ঠুর হতে পারে। তাদের কথায় লেখক বলেন - ''গোড়ায় গোড়ায় গেরস্থরা নাকি ভারি হুজ্জতি করত। ভেতর থেকে হবে-না হবে-না বলে খেদিয়ে দিত। এমনও হয়েছে যে, ছাদে উঠে গিয়ে ফুটন্ত জল ঢেলে দিয়েছে।'' - সেই সব অসহায় মানুষগুলিকে লেখক সংঘবদ্ধ সংগ্রামী জীবনে দীক্ষিত করেন। তারা ক্রমশঃ সংঘবদ্ধ হয়ে একটি নতুন সমাজ গড়ে তোলে। লেখক বলেন - ''হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাদের যাওয়ার আর কোনো জায়গা জোটেনি, তারাই মাঠ-রাস্তার ধারে এই প'ড়ো ডাঙা জমিটাতে পাতার ছাউনি বানিয়ে জলরোদে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই করে নেয়। আস্তে আস্তে এই জবরদখল জমিতে পত্তন হয়েছে সেরে যাওয়া কুষ্ঠ রোগীদের গাঁ। এখন মাঠের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পরের পর সারবন্দী ঝুপড়ী।'' (৪-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। বড় বাবুও ভাবে - ''সমাজ থেকে ছেঁটে ফেলা দাগী মানুষের এই দঙ্গলটাতে এসে আমার মনে হল এই আমার নিজের জায়গা।'' বড়বাবু ছাড়াও এখানে যারা এসে ঠাঁই নিয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম চরিত্র ব্যাংমুড়ি। চরিত্রগুলির মধ্যে পৈলু, হাঁড়িচাচা, সেনিয়া, পল্টন, ভৈবি প্রভৃতি - এদের একটাই পরিচয়। এরা প্রত্যেকেই সাম্প্রদায়িকতাহীন, বৈসম্যহীন, অর্থনৈতিক অবস্থানের ছোট-বড় হীন একই শ্রেণীর

মানুষ। যারা কেবল জানে কেবল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে। এরা যে জীবনের ছবি তালবেতালিয়াতে গড়ে তুলেছে তা সভ্য সমাজের কাছে লক্ষণীয়। লেখক এখানে জীবনের যে ছবি গড়ে তুলেছেন তার তাৎপর্যপূর্ণ ও মহৎ। এখানে ঔপন্যাসিক যে নাম দিয়েছেন তা হল - 'নবজীবনগড়।'

ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় আলোচ্য উপন্যাসে শেকরহীন জীবনের সঙ্গে বিলাসবহুল উচ্চবিত্ত সভ্য সমাজের জীবন এবং সুস্থ্য মানুষের সামাজিক জীবনের সঙ্গে বিকলাঙ্গ অর্ধেক মানুষের অন্তরীপের জীবনের বৈপরীত্য আশ্চর্য শিল্প দক্ষতায় উপন্যাসের প্লট-এর বিষয় করে তুলেছেন। আলোচ্য উপন্যাসে বিকলাঙ্গ মানুষের জীবনের মানবিক সত্ত্বার প্রতিষ্ঠা আমরা দেখি। জমিদারদের বড়বাবু তালবেতালিয়া সম্পর্কে বলে - ''আমাদের এটাকে গাঁ বললেও যেন ঠিক পুরো বলা হয় না। আসলে আমরা একটা খুব বড় পরিবার। এক পুরুষে শুরু হয়ে এখন দু-পুরুষে এসে ঠেকেছে। লোকে স্বীকার করুক না করুক - আহা, আমরা মানুষ তো।'' এই গ্রামের বিকলাঙ্গ মানুষগুলোর কারো ঘরে বাচ্চা হলেই শাঁখ বাজতে থাকে। উঠোনে এত ভিড় হয় যে পা ফেলার জায়গা পাওয়া যায় না। বাচ্চা হলে তালবেতালিয়ায় উৎসব শুরু হয়। বাতাসা দিয়ে সেখানে সবাই মিষ্টি মুখ করে। লেখক এই উৎসবের অতল গভীরে ডুব দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক দার্শনিকের দৃষ্টিতে কারণ নিদের্শ করেছেন। তিনি লেখেছেন - ''এটা যে শুধু আনন্দ করার একটা উপলক্ষ তা নয়। এর মধ্যে আছে একটা মহিমার ব্যাপার। ফুরিয়ে যাওয়া, ক্ষয় হয়ে যাওয়ার জায়গাটায় টিকে থাকা, প্রাণবান করা। সেই সঙ্গে আশ্চর্য হওয়া। দুই বিকৃত বিকলাঙ্গের আলিঙ্গনে এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের আবির্ভাবের চেয়ে রোমাঞ্চকর আর কী হতে পারে ?'' (৫-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)।

লেখক তালবেতালিয়ার যে জীবনের ছবি এঁকেছেন তা সম্পূর্ণ অন্ধকারের জীবন। লেখকের কথায় তালবেতালিয়া দিনের বেলায় খাঁ খাঁ করে। তখন শুধু বিকলাঙ্গ সেইসব মানুষেরা নিজেরাই থাকে। বাইরের একটিও জনপ্রাণী - তখনকার সেই পথ মারায় না। তাই সেখানকার মানুষগুলো সর্বদা অন্ধকারের প্রতিক্ষা করে থাকে। লেখকের ভাষায় - ''রাত্রিই এখানকার অন্নদাতা। তালবেতালিয়া জমজমাট হয়ে ওঠে সন্ধ্যের পর। ঝুপড়িতে ঝুপড়িতে বসে মদের আর জুয়ার আড্ডা। সব জায়গাতেই টিমটিমে আলো। কোনো ঝুপড়ি থেকে ভেসে আসবে ঝুমুর গান। কোনো ঘরে আলো জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎ ফস করে নিভে যাবে। কান পাতলে শোনা যাবে কিছু অস্ফুট শব্দ।'' (৫-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। লেখক সেখানকার বিকলাঙ্গ মানুষগুলোর প্রকৃতিকে মনস্তাত্ত্বিক মনোবিকলনের তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে দাঁড় করিয়েছিলেন। সামাজিক সুস্থ্য মানুষের সঙ্গে তালবেতালিয়ার ভিন্ন দৃশ্য

আমরা আলোচ্য ৫ম অধ্যায়ে পাই। সেই বিকলাঙ্গ মানুষ গুলোর কারো নাক নেই, কারো আঙুল নেই, কারো চোখের পাতা পড়েও না, ঘষটানি লেগে লেগে কারো পায়ে দগদগে ঘা। এই অর্ধেক মানুষগুলোর সঙ্গে বাইরের জগৎটার সঙ্গে সেই মানুষগুলোর বনিবনা নেই। লেখকের কথায় এই মানুষগুলোর সঙ্গে বাইরের জগতের পার্থক্য স্পষ্ট। ঔপন্যাসিক লিখেছেন - ''ওরা আস্ত মানুষ আর আমরা ভাঙা চোরা। সুস্থ্য-স্বাভাবিক মানুষগুলো থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে একদিকে ভালোই হয়েছে। নইলে আমাদের ভেতরটা সর্বক্ষণ জ্বলে পুড়ে খাক হত। তাও ঘৃণায় নয়, হিংসেয়। কারো কোনো ভাল আমাদের সহ্যই হত না।'' (৫-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। বড়বাবু এ সম্পর্কে বলে - ''দাগী মানুষ বলেই দিনের আলোকে আমাদের কেমন যেন নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। দিনের আলো যেন চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের শরীরের খুঁতগুলো দেখিয়ে দেয়। (৫- অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। তালবেতালিয়ার সেই অসুস্থ জীবনের সঙ্গে -বাইরের সুস্থ্য-স্বাভাবিক জীবনের পার্থক্য লেখক নিখুঁত পর্যবেক্ষণী -দৃষ্টিতে মনস্তাত্ত্বিক দিক তুলে ধরেছেন। সেই অন্ধকার জীবনে মদ, মেয়েমানুষ, চোরাকারবারী ও ভুতোর মতো মানুষকে আলোচ্য অধ্যায়ে পাই। তালবেতালিয়ার জীবন স্বাভাবিক সুস্থ্য-জীবন থেকে অনেক দূরে। অনেকটা অন্তরীপে বসবাস তারা যেন করে। এই অন্তরীপে সৃষ্টি হয় নিষ্পাপ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন। বিকলাঙ্গ মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় পূর্ণাঙ্গ শিশু। সেটা দেখে দেখে এই স্বাভাবিক জগৎ বিস্মিত হয়ে ওঠে।

ঔপন্যাসিক উত্তম পুরুষে সভ্য শিক্ষিত সমাজ ও তালবেতালিয়ার কুষ্ঠ রোগীর সমাজ সম্পর্কে বলেন - '' এ তো দ্বীপ নয়। একটা অন্তরীপ। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে আমরা নিজেদের লাগিয়ে রেখেছি। নালাগুলো ওরা এমনভাবে কেটে রেখেছে, যাতে ওদের যত ময়লাজল সব আমাদের দিকেই গড়িয়ে আসে।'' (৬- অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। এই অন্তরীপে জগতের সমস্ত আবর্জনার স্তুপে ঔপন্যাসিক পূর্ণাঙ্গ সমাজের পূর্ণাঙ্গ মানুষের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভূমিষ্ঠ হওয়া প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কুষ্ঠ রোগীদের তালবেতালিয়া মানুষের সভ্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অন্তরীপ। এখানে কোনো লাশও বাইরে যায় না। ''কুষ্ঠ রুগিদের ছোঁয়া লাশ কোনো মুর্দাফরাশই ছুঁতে রাজি হবে না।'' লেখক জানিয়েছেন - ''তালবেতালিয়া হল জীবন্ত নরক - দুনিয়ার জাহান্নম।.....এত মদোমাতাল চোর-জোচ্চোরের আনাগোনা এখানে, কিন্তু মরে গেলেও কেউ এখানে রাত কাটাবে না। বাইরের সবাই এখানে দিনের বেলায় ভয় পায়। সেই ভয়ের জন্যেই মেদ খেলেও মাত্রা ছাড়াতে কারো সাহস হয় না। তালবেতালিয়ার আকাশের তলায় রয়েছে একটা ভয়ের অদৃশ্য ঘেরা টোপ।'' (৬-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)।

অদৃশ্য ভয়ের ঘেরাটোপের তালবেতালিয়ার জীবন ক্রমশঃ পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এখানে ক্রমশঃ আনাগোনা শহুরে বসবাসকারী চোরাকারবারী ও শয়তান কতগুলো মানুষ। সভ্য সমাজের চোর, ডাকত, খুনী, বিভিন্ন আসামী এখানে নিরাপদ আশ্রয় নেয়। এভাবে দেখা যায় যে মহৎ আদর্শ নিয়ে তালডাংরা ও তালবেতালিয়ার পত্তন হয়েছিল। সেটা ক্রমশঃ ভেঙে যেতে শুরু করে। এমনকি যে সব শিশু পূর্ণাঙ্গ অবয়ব নিয়ে এই তালবেতালিয়ায় আছে। তাদের সঙ্গে এই বিশিষ্ঠ সমাজ অবিশ্বাস্যের - বাতাবরণ তৈরী করে। কেননা সেই সমাজের অগ্রদুত ও আজকের দিনের যুবশক্তি একেবারেই দুর্বল। লেখক বলেন - ''যাদের দিকে তাকিয়ে সবকিছুর হিসেব হয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে তারা একেবারেই নড়বড়ে। একেবারেই নশ্বর। তারা আর যাই হোক, কোনো পাকা কিছুর ভিৎ হতে পারে না। এখানকার নারীরা ক্রমশ সভ্য সমাজের পুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ায়। ফলে তালবেতালিয়র সেই ভয়ের পরিবেশ ক্রমশঃ থিতু হয়ে যায়। এখানকার মানুষগুলোও যা এতকাল করে নি সেই খুনো খুনিও করে এখন। বেতাল হয়ে পড়ে তালবেতালিয়া। লেখক অসামান্য শিল্প দক্ষতায় ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপন্যাসের শিল্পগউণ বজায় রেখে বিশেষ জীবনদর্শনের বিকাশে সার্থক প্রয়াস রেখেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। একটা সুস্থ্য সমাজ থেকে নির্মল এক বিচ্ছিন্ন সমাজ গড়ে তোলেন লেখক তালবেতালিয়ায়। আবার সেখানে সমাজের ক্লেদাক্ত বিচ্ছিন্নতার বিভিন্ন সূত্র একে একে কিভাবে সেই সমাজে একটু একটু করে প্রবেশ করতে থাকে - সেই সত্য উন্মোচন করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। আমরা সেই সঙ্গে এই উপন্যাসে বিচ্ছিন্নতার, বৈসাম্যের সূত্র গুলির মধ্যে মানুষের যৌনতা, ধনলিপ্সা, ভোগাশক্তি, ভোটের রাজনীতি ও মানুষের ক্রমাগত উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও পরের অন্ধ অনুকরণ অসম্ভব বিশ্বাসযোগ্যভাবে আলোচ্য উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলেন ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

উপন্যাসের কুষ্ঠ রোগীদের বিচ্ছিন্ন অন্তরীপে রেখে ঔপন্যাসিক এক নতুন সমাজের দিশা দিয়েছেন। আবার সেই সমাজের যে ঘুণ পোকাগুলি মানুষের মধ্যে বিভেদ নিয়ে আসে সেগুলিও অঙ্গুলি নির্দেশ লেখকের ইপ্সিত লক্ষ্য। সেই প্রয়োজনে জনমানসে কুষ্ঠ রোগীদের সম্পর্কে যে ভীতি রয়েছে সেটিকে তাদের সম্বল করে পথ চলা করিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এই রোগ সম্পর্কে উত্তম পুরুষে ঔপন্যাসিক বলেন - ''হ্যানসেনের অসুখ, ধ্যুৎ, রোগটা হল কুষ্ঠ। আমরা সব কুষ্ঠরোগী। সেরে গিয়েছে তো কী, আমরা যে কুষ্ঠরোগী সেই কুষ্ঠরোগীই থেকে যাব। চিরজন্মের মত। লুকোবার উপায় নেই, এক নজর দেখলেই লোকে ঠিক ধরে ফেলবে।'' (৬-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। কিন্তু এই রোগের ভয় ও রোগীদের ভীতিই এই বিচ্ছিন্নতার একমাত্র অবলম্বন। সেই পার্থক্য ক্রমে দূর হতে থাকে। তাঁর কথায় - ''লোকে আমাদের ভয় করে, ঘেন্না করে। এতদিন তারই ওপর আমাদের টিকে থাকা নির্ভর

করে এসেছে। কেউ আমাদের ছোঁবে না, এটাই ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় বল, ভরসা।'' (৬-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)।

বিকলাঙ্গ শরীরগুলো যৌন ধর্মে নিয়ে আসে পূর্ণাঙ্গ সুস্থ্য মানুষ। তালবেতালিয়া বিচ্ছিন্ন অন্তরীপে আসামীরা পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেতে তিনটি ছোকরা আশ্রয় নেয় সেখানে। সেই ছেলে তিনটি অন্তরীপের মানুষগুলোকে বন্দুকের নলের কথা বলে। ওদের সম্পর্কে লেখক বলেন - ''ছেলেগুলোর কথার আড়ে যতটা বুঝেছি তাতে ওরা চায় দুনিয়াটাকে ঢেলে সাজাতে। ওপর ওপর ঝাড়পুঁছ করা মানে পুরনো জিনিসটাকে টিকিয়ে রেখে মানুষেরফ যন্ত্রণা বাড়ানো। স্যাঁকরার ঠুকঠাক দিয়ে হবে না। ওরা দিতে চায় কামারের এক ঘা। পারে তো ভাল। কিন্তু পারবে কি ? ছেলেগুলো যে বিচ্ছু তাতে সন্দেহ নেই। চলে যাওয়ার আগে ওরা আমাদের মধ্যে থেকে যাওয়ার একটা রাস্তা বানিয়ে রেখে গেছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের গলায় এমনভাবে ওরা গান ঢুকিয়ে দিয়েছে যে ওদের কথা আমরা কিছুতেই চাপা দিতে পারছি না।'' (৬-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)। সেই ছেলেগুলো ওদের নতুন জীবনের সন্ধান দেয়। সেই ছেলে তিনটির মধ্যে একটি তালবেতালিয়ার সোনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়। এই তালবেতালিয়ায় এত বছরে এই প্রথম বাইরের লোক এসে থাকা ছেলে তিনটির মধ্য দিয়ে।

এই শেষ অধ্যায়ে আমরা দেখি তালবেতালিয়া ক্রমে 'নবজীবনগড়' হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে এখানে পৌছায় চিরুনির সঙ্গে আয়না, পৈলু প্রথম আয়না ও দাড়ি কামানোর খুর নিয়ে আসে এখানে। পৈলুর গায়ের জোটে বাহারি গেঞ্জি। তার দেখাদেখি সেখানকার অন্য ছেলেরা সেগুলি বাইরে থেকে আনে সেখানে। সেখানকার রোগীদের মনে সেই ভয় দেখানোর বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাসে চিড় ধরে। লেখক বলেন - ''কুষ্ঠ আমাদের কবচকুন্ডল। কিন্তু আমরা শেষ হয়ে গেলেই এ-গাঁয়ের আর তখন সীমান্তের কোনো বালাই থাকবে না। আমাদের সন্তান সন্ততিরা হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ অরক্ষিত। আজ আমরা ওদের বর্ম। কিন্তু সে আর কতদিন?'' (৬-অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)।

এরপর তালবেতালিয়ায় 'নবজীবনগড়' রূপায়নে তৎপর হয়ে ওঠে জমিদার পরিবারের বড়বাবু। তার বাবার বিষয় সম্পত্তি যথেষ্ট। পেশায় আইনজীবি এবং পুরনো কংগ্রেসী মানুষ তার বাবা। আদর্শের দিক থেকে তিনি উদারনীতিক এবং গান্ধীবাদী। তিনি তার কুষ্ঠরোগী বড়বাবুকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যত্নে রেখেছিলেন, এবং আরো ভাল চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা খরচ করে দক্ষিণ ভারতে ব্যয়সাধ্য হাসপাতালে পাঠিয়ে সেখান থেকে সারিয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন, এবং এই বড় বাবুর বিয়েও হয়েছে সেও ভবীরই সঙ্গে। এই বড়বাবুই নিজ হাতে নবজীবনগড় গঠনে ব্রতী হয়েছেন। একজন কুষ্ঠরোগীর হাতে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব সেটাও দেখালেন ঔপন্যাসিক। এরজন্য প্রয়োজন

বড়বাবুর পিতার মতো সহানুভূতিশীল উদার মানুষ। ক্রমে নবজীবনগড়ে মানুষের অন্ধকার জীবন রঙীন হয়ে ওঠে। মুখে স্নো আর ঠোঁটে রং লাগায় সোনিয়া। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রঙিন ফিতেয় চুল বাঁধে আংটি নামের মেয়েটি। লেখক - এই পরিবর্তনকে তাঁর ভাষায় বলেন - ''বৃত্তের মধ্যে গজিয়ে উঠছে আরেকটা বৃত্ত।''

তালবেতালিয়ায় শেষবারে বড়বাবু হাসপাতালের ডাক্তার প্যানসাহেব ও ভবীকে নিয়ে আসে। উত্তম পুরুষের ব্যক্তিকে বড়বাবু জানায় তালবেতালিয়াকে ঢেলে সাজানোর জন্য এলাহি ব্যাপার করছেন। তালবেতালিয়ার চারগুণ জায়গা নিয়ে সেখানে গড়ে তুলবেন 'নয়া বসত'। পুরনো কুষ্ঠরোগী গুলি চোখ বুঁজলে তালবেতালিয়া এক সময় আর পাঁচটা গ্রামের মতই হবে সম্পূর্ণ সুস্থ্য মানুষের পত্তন। কুষ্ঠরোগীদের তালবেতালিয়ায় চলে জমি জরিপ, খুঁটি পোঁতা, ব্যারাক বাড়ি নির্মাণ - ''কী দিনে কী রাতে তালবেতালিয়াকে এখন তেনাই যায়না। ভোরবেলা থেকেই রাস্তা দিয়ে শুরু হয়ে যায় মাল-লরির আনাগোনা।'' এখানকার রাতটাও হয়ে যায় দিনের মত। হাঁড়ি চাচার চোরদের জুটেছে নতুন কাজ - রাতজেগে মালপত্র পাহারা দেওয়া। পৈলু-পল্টনদের দম ফেলার ফুরসত নেই - ওরা এখন মিস্ত্রির যোগানদার। গাছতলায় বসেছে হাজী সাহেবের পাঠশালা, পঙ্গুদের জন্যে রয়েছে চাকা লাগানো প্যাকিং বাক্স। তাতে দড়ি লাগিয়ে পৈলু, পল্টন, আংটিও সোনিয়া দলবল সহ সেগুলো টেনে নিয়ে চলে। বাগানে উঠেছে উঁচু উঁচু পিলার। তার মাথায় বসানো হয়েছে জলের ট্যাঙ্ক। এখানে ডাক্তারখানা-ডিস্পেন্সারি গড়ে তোলা হয়। সেখানে কাজের জন্য বেছে নেওয়া হয় পৈলু আর সোনিয়াকে।

ক্রমে বিস্তার করে বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন মতাদর্শের বিভিন্ন মানুষ তাদের প্রয়োজনের জাল বিন্যাস। রথের মেলায়ও মানুষের সমারোহে তাদের কুষ্ঠরোগীদের ভাগ্যের চাকা ঘোরে। একটা গ্রাম তালবেতালিয়া সেবা শুশ্রুষায় সেখানে নির্মিত হাসপাতাল -'নবজীবনগড়'-এর মতো একটা শুশ্রুষাগার হয়ে ওঠে। যদিও এই পরিবর্তন তার পুরাতন পন্থী - এই বিভাজনও দেখা যায় তালবেতালিয়ায়। যদিও শেষ পর্যন্ত 'নবজীবনগড়'কে আর পুরনো তালবেতালিয়ায় ঠেলে নিয়ে যাওয়া ছিল অসম্ভব। ক্রমে সভ্যসমাজের সভ্যমানুষের সঙ্গে অসুস্থ সমাজের সদস্যরা বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উপন্যাসের কথক বলেন - ''আমরা তো ছিলাম দুনিয়ার বার। দুজনের এক হয়ে যাওয়াতেই ছিল আমাদের জগৎজয়ের আনন্দ।'' (৬- অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ)।

কুষ্ঠরোগীরা নবজীবনগড়ে নিজেদের পরিবর্তন করে নেয়। পৈলুর হাত ধরে সাতপাকে বাঁধা পড়ে সোনিয়া। কথক চরিত্র আইনসিদ্ধভাবে চ্যাংমুড়ি নাম পরিবর্তনে কুলসুম বিবির সঙ্গে জীবন বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ঔপন্যাসিক সেখানে সমস্ত পাপ-তাপ-শূণ্য এক নতুন জীবনে উন্নীত করার জন্য ভারি

সৌম্য চেহারার স্বামীজীকে হোমাগ্নি সম্বলিত উপস্থিত করান। সেই স্বামীজীর বেদমন্ত্রে আনন্দযজ্ঞে - নবজীবনগড়ের মানুষগুলো সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি ঢেকে দিয়ে সেবা ধর্মে দিক্ষিত হয়। মন্ত্রমুগ্ধ কণ্ঠে স্বামীজী সেই পৌরাণিক ও বৈদিক চরিত্র কাক্ষীবান মেয়ে ঘোষার কুষ্ঠরোগ সেরে যৌবন ও বিয়ের যোগ্য স্বামী পাবার কাহিনী -শোনান। লেখক এই বৈদিক ও পৌরাণিক কাহিনী সংযোজন করে এই উপন্যাসের ক্ল্যাইমেক্সের উৎকর্ষতায় সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন। মানুষগুলোর নতুন জীবন প্রাপ্তির সঙ্গে এই কাহিনী অসামাণ্য সামঞ্জস্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি সেই নবজীবনগড়ে শহর থেকে রং বেরঙের পোস্টার নিশান নিয়ে হাজির হয় শহরের মানুষের ঢল। রোজ সভাসমিতি ও বক্তৃতা হয় সেখানে। এরপর একটা সময় চ্যাংমুড়ি মারা যায়, এবং নবজীবনগড় থেকে সমস্ত সম্বন্ধ চুকিয়ে আসে উপন্যাসের কথক। এরপর সে কোথায় যাবে কিছুই জানে না। এখন কেবল নিজেকে দেখে পিছন থেকে। এভাবে উপন্যাসের সমাপ্তি হয়।

উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণ, মৃত্যু ভাবনা, উপন্যাসিকের মহৎ জীবনদর্শন, সঙ্গীত সৃষ্টি, ভাষা ও সংলাপ প্রয়োগ, মৃত্যু ভাবনাও কহিনী বিন্যাস, প্লট নির্মাণ, উপন্যাসের শীর্ষনাম ও সমাপ্তি অত্যন্ত বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ, সংবেদশীল হৃদয়ানুভূতিশীল উচ্চ সৃজনী ব্যক্তিসম্পন্ন স্রষ্টার নিদর্শন 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ'। লেখক অসামান্য যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে দেখিয়েছেন যে ; চরম সমাজতান্ত্রিক ও চরম সাম্য নির্ভর সমাজের স্থায়িত্ব খুবই স্বল্প। সেখানে মানুষ তার বাঁচার তাগিদে, যৌবিক চাহিদায়, জন্মগত বিভিন্ন প্রবৃত্তির তাড়নায় ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অন্বিষ্ঠ হয়ে পড়ে। অন্তরীপে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে না। তাদেরই সৃষ্ট উত্তরসুরী বাইরের জগতের ভোগশক্তির উদ্দীপকের ইশারায় সাড়া দিয়ে নালা তৈরি করে মিলিত হবেই। এই উপন্যাসে লেখক সুভাষের মহৎ জীবনদর্শন ও সেবাধর্মের মহৎ দিশা বাংলা কথা সাহিত্যের অসামান্য ও কালজয়ী সম্পদ।

আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনীতে সোভিয়েতের ছায়া অনুমান করা যায়। লেখক সুভাষ কমিউনিষ্ট মতাদর্শে আস্থাবান ব্যক্তি মানুষ ছিলেন। তাছাড়া কমিউনিস্টবাদী সোভিয়েত রাষ্ট্রের সমাজতন্ত্র যেন সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় যেন কোনভাবেই তার প্রভাব না পড়ে। যেমন সভ্য সমাজের মানুষ তালবেতালিয়ার কুষ্ঠরোগীদের অন্তরীপে রাখে। কোনোভাবেই তা যাতে পূর্ণাঙ্গ ও স্বাভাবিক মানুষের সমাজে না ছড়াতে পারে। সেই দাগী মানুষগুলো যাতে কোনোভাবেই তালবেতালিয়ার গন্ডীর বাইরে না আসে - সেটাই বাইরের পৃথিবীর কাম্য। তাদের বাসভূমে অন্তরীপের ন্যায় সভ্য শহুরে

সমাজ থেকে যেন দূরে থাকে। আবার তালবেতালিয়ার বড়বাবু, হাঁড়িচাচা, প্রভৃতি কুষ্ঠরোগীরাও 'ভয়'কে আশ্রয় করে নিজেদের একটি বৃত্তবর্মে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল। বড়বাবুর 'নবজীবনগড়' অনেকটা লেলিনের সোভিয়েত ভূমির মতো। সেখানে দুই ভূমিতে পূর্ণাঙ্গ ও সুস্থ্য মানুষের পরিবর্তিত জীবনের একটি নতুন জগৎ। সর্বোপরি কুষ্ঠ রোগীদের সমব্যথী লেখক সুভাষ উত্তম পুরুষে সেই সব রোগীর মর্মব্যথা, কষ্ট, প্রত্যেকের পূর্ব জীবনের মধুর স্মৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে এই উপন্যাস শিল্পরূপ নির্মাণ করেছেন। এখানে তাঁর শিল্পী সত্তার সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের উৎকৃষ্ট হৃদয়ের ও অনুভূতির নিদর্শন পাই। বাংলা কথা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে এই উপন্যাসটি নিশ্চিতরূপে সমৃদ্ধ করেছে।

ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম উপন্যাস 'কাঁচাপাকা' ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত। রচনাকালের নিরিখে এটি তাঁর চতুর্থ উপন্যাস। উপন্যাসটি স্নেহপ্রতিম 'আবু'কে উৎসর্গ করেন তিনি। উপন্যাসটি ১১টি অধ্যায়ে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নতি করে রচিত। তাঁর এই উপন্যাসের ঠিক পূর্বে রচিত 'অন্তরীপ' বা হ্যানসেনের অসুখ' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি, অন্য লেখকের বলে যে কাহিনী উল্লেখের তাগিদ উপলব্ধি করেছিলেন; 'কাঁচাপাকা' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সম্পর্কেও সেরকম একটি উপকাহিনী যুক্ত করেছিলেন তিনি। যেন পাণ্ডুলিপিটি তার নিজের নয়। পনের বছর আগে এক যুবক একটি পাণ্ডুলিপি তার কাছে রেখে বেপাত্তা হয়েছিলেন। দীর্ঘ দিন পর অনন্যোপায় সম্পাদক ও প্রকাশকের তাগিদে সেটিকে তিনি নিজের লেখা বলে চালিয়ে নিয়েছেন। এই উপকাহিনীর মধ্যে নিহিত লেখক যৌবনের অনভিজ্ঞ, কাঁচা অভিজ্ঞতার ও অপরিণত শিল্পীর, অপরিণত জীবনের স্মৃতিকে শিল্পের রূপদানের প্রয়াস লক্ষ্য করি আমরা। কেননা আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কচিও কাঁচা বয়সে কাজের সন্ধানে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ছিল। এক সময়ে বিশেষ এক ঘটনা তার জীবনের মোর ফিরিয়ে চলে। সেখানে একটি মাত্র ঘটনায় যে জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা ও পরিণতলব্ধ হয়ে ওঠে। লেখকের জীবনে কাজের সন্ধান, বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত পরিপক্কতা এনে দেয়। এখানে আমরা এক পরিণত বয়স, অভিজ্ঞ জীবনের ফসল ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর শিল্প রচনার নিদর্শন পাই। কাঁচা ক্রমশঃ নানা চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে জে পাকা হয়ে ওঠে সেই জীবনকে নিয়ে রচিত উপন্যাস 'কাচাপাকা'।

উপন্যাসটি কঁচির নামে আত্মকথন রীতিতে রচিত। এতে লেখক নিজের লেখা কবিকে দিয়ে লেখা এবং কচির লেখা নিজের লেখনীতে শিল্পরূপ দেবার সুবিধে বিভিন্ন দিক থেকে গ্রহন করেছেন। এতে ঔপন্যাসিকের স্বাধীনতার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে একটি উপকথা যুক্ত করে ঔপন্যাসিক

একেবারে শুরুতেই প্রকাশক ও সম্পাদকের লেখা জমা দেবার চাপটিকে শিল্পিত রূপ দান করেছেন। শিল্প ও সাহিত্য সৃজনে একটি আর্থিক চাহিদার বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গ্রন্থ সম্পাদক ও প্রকাশকের তাগিদ। বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকা যেমন সাহিত্য সৃজনে ভূমিকা পালন করে ; আলোচ্য উপন্যাস সৃষ্টির আড়ালে প্রকাশক ও পত্রিকা সম্পাদকের তাগিদা, অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল। সৃষ্টির এই পার্শ্বচাপ গুলিকে উপন্যাসের শুরুতেই লেখক উল্লেখ করেছেন - ''কথা দিয়ে ফেলেছি লিখব। সংসার চালাবার জন্যে টাকাটা আমার খুবই দরকার। ক-টা দিন কী হাঁচড়-পাঁচড় করে কেটেছে। ভেবেছিলাম কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলে মাথায় ঠিক কিছু এসে যাবে। বসেও ছিলাম। কিন্তু ভেবে কোনো কুল কিনারা পেলাম না। এদিকে লেখা দেবার দিন ক্রমে ঘনিয়ে আসছে। কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারলে তাতে শুধু কথার খেলাপ হবে তাই নয়, আমার তো বটেই সেই সঙ্গে আরও অনেকেরই মাথা কাটা যাবে।'' (১ - 'কাঁচাপাকা')।

অনেক ক্ষেত্রে অসাধু স্রষ্টারা পরের লেখা নিজের বলে প্রকাশ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। এখানে উল্টোভাবে লেখক সেকথা বলেও মূলতঃ নিজেরই লেখা অন্যের বলে চালিয়েছেন। সেখানে তিনি একটা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, কখনো হয়তো সেই কঁচির লেখার মধ্যে নিজেকে নয় বরং নিজের লেখার মধ্যে অন্য কেউ এসে না পড়ে। তাঁর কথায় - ''একণ ভয় শুধু একটাই, আমার লেখার মধ্যে ছোকরা হঠাৎ না উদয় হয়ে বসে।'' (১ -কাঁচাপাকা)। প্রত্যেক স্রষ্টার মধ্যে উপলব্ধি গুলিতে ভাবের বিগলন ঘটিয়ে প্রমাতৃ সংকীর্ণতা অর্জনের প্রয়াস থাকে। নিজের সৃষ্টির মধ্যে অন্যের ছায়া আসাটাই ভয়ের কারণ। যাতে পাঠক প্রামাতার সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পারে, এবং সেখানেই সাহিত্যের সার্থকতা। জীবনের সত্যটাই সাহিত্যের কাহিনী এবং সাহিত্যের শৈল্পিক গুণে সেই কাহিনীর সঙ্গে পাঠকের একাত্মীকরণের সামর্থ্য অর্জনের মধ্যে স্রষ্টার কৃতিত্ব। ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াসও ছিল ; তাঁর জীবনের সত্য পাঠকের কাছে যেন বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারে। তাদের প্রত্যেকের জীবনের গল্পে প্রতিফলিত করে নিতে পারে। তিনি বলেন - '' যে করেই হোক, আমাকে সত্যি জিনিসটাকে এমনভাবে দেখাতে হবে লোকে যাতে মনে করে গল্প।'' (১ - কাঁচাপাকা)।

'কাঁচাপাকা' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র 'কচি'। কচির জীবনে কাঁচা থেকে, পাকা হয়ে ওঠার ক্রমবিকাশের কাহিনী হল 'কাঁচাপাকা'। কচি এই উপন্যাসের কথক। কালীঘাটের পুরুত বংশের ছেলে কচি। তার বাবা মারা যাওয়ার পর তাদের বাড়িতে এসে ওঠে তার মামা। তার মামা সম্পর্কে সে বলে - '' বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই আমাদের বাড়িতে মামার যাতায়াত বেড়ে গিয়েছিল। আমাদের

বাড়িতে ঘরের অভাব ছিল না। সুতরাং মেস থেকে উঠে আসতে কোনো অসুবিধে হয়নি। মা-র হিতৈষীরা বলেছিলেন এটা ঠিক হচ্ছে না। ঐ একদিন দেখো ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোবে। ভিটেতে ঘুঘু চরাবে। মামাকে লোকে কেন দেখতে পারত না জানি না। তবে এটা ঠিক, ওর মুখের চামড়ায় কেমন একটা তেলতেলে ভাব ছিল। আয়নায় যে - পুরুষেরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেদের মুখ দেখে, তাদের কেমন যেন আমার ভাল লাগে না।'' (২-কাঁচাপাকা)।

কচি তার বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে অনেকটা সর্দারী ভাবে চলে। কেননা তখন বাড়ীতেও পুরুষ বলতে সে-ই বড়। তার মা-ও ভালো মানুষ। তিনি সারাদিন সেলাই নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। উঁচু গলায় কাউকে কিছু বলেন না, তাঁর সেলাইয়ের ওপরই নির্ভর করে সংসার চলে। কচির ছেলেবেলা নেহাৎ-ই এলোমেলো ছন্নছাড়া। পিতাহীন কচি বয়সে সে যেখানে সেখানে যেমন তেমন ভাবে সময় কাটায়। ছেলেবেলা সম্পর্কে সে বলে - ''বাবা মারা যাওয়ার পর আমার হল পোয়াবারো। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। যার তার সঙ্গে মিশি। আমাকে বারণ করবার কেউ নেই। সেলাই করতে করতে মা-র মুখটা সেলাই হয়ে থাকে। কালীঘাট যে এমন মজার জায়গা আগে কখনও জানা ছিল না আমার। হাফ-প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এলাকাটা চষে বেড়াই। যাত্রী নিবাসে ঢুঁ মেরে দেখি কারা এল গেল। ছিনে-জোঁকের মত লেগে থেকে পান্ডারা কীভাবে লোক ঠকায়, এও যেমন দেখি-তেমনি মুখ দেখেই ধরতে পারি কে পকেটমার, কে নয়। ফটোর দোকানদারদের সঙ্গেও ভাব হয়ে যায়। মেলার মরশুমে তারা চলে যায় সিনসিনারি নিয়ে গাঁয়েগঞ্জে। ফিরে এসে সেই মেলার গল্প বলে। পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে আস্তে আস্তে আমার ভাব হয়ে গেল। কখনও এর ওর ছাদে গিয়ে ঘুড়ি ওড়াই।'' (২-কাঁচাপাকা)।

ছোটোবেলা থেকে বাউন্ডুলে জীবন অতিবাহিত করলেও সততার অভাব ছিল না কচির। সে বাড়ির বাজার ঘাট, কেনা বেচা করে ছেলেবেলা থেকেই। ছেলেবেলায় একদিন ওর একবন্ধু দিনে কত টাকা কামায় কচি জিজ্ঞেস করতেই কচির মনে পড়ে যায় তার মায়ের শুকনো মুখটা। অভাবের সংসারের কথাও মনে পড়ে। মনে পড়ে ওর বোনের কথা। যে জিজ্ঞেস করে - ''দাদা, কতদিন মাছ খাইনি রে।'' এসবের প্রতিক্রিয়ায় সে সেই বন্ধুর গালে চটাস করে এক চড় মেরে বসে। এ থেকে আমরা দেখি অল্প বয়স থেকেই কচি অনুভূতিপ্রবন এক সৎ ছেলে।

পিতৃহীন কচিকে আদর করলে সে সবার আড়ালে গোপনে কাঁদে। ছেলেবেলায় সে ক্রমশঃ বন্ধুদের ত্যাগ করে। কেননা সে দেখে কাঁচা বয়সে ছেলেরা সিগারেট খায় লুকিয়ে লুকিয়ে, মুখ খারাপ

করে কথা বলে। সেগুলি কচির সহ্য হয় না। সে ওদের ত্যাগ করে রাস্তায় একা একা আপন মনে ঘুরে বেড়ায়।

ছেলেবেলায় প্রকৃতির সঙ্গেও কচির ছিল নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। গরম খোলায় চালভাজার মত করে গলির তেতে-ওঠা পিচের ওপর যখন চিরবিড়িয়ে বর্ষার প্রথম বৃষ্টি পড়ত তখন তাদের আনন্দ ছিল বর্ণনাতীত। জানলার গরাদ ধরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কচি ছড়া বলতো -

''আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে।''

গলিতে জল জমলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে কাগজের নৌকা বানাতে বসে যেতো। ভাই-বোনদের সঙ্গে সমস্বরে বলে উঠত - ''যা বৃষ্টি ধরে যা
লেবুর পাতায় করঞ্চা।'' সেদিনের সেই কাগজের নৌকাগুলো গাদাগাদি হয়ে মুখ থুবড়ে পড়লে কচির সে কী মন খারাপ হতো তা বলার নয়।

কচির বন্ধু-বান্ধবরা যখন ক্লাস নাইনে পড়ে সেই সময় সে দু-দুবার মাথা ন্যাড়া করে। পৈতে হওয়ার সময়ে এবং বাবা মারা যাওয়ার পর। সেই বয়সে তার নাকের নিচে গোঁফের ফিকে নীল রেখা দেখা দেয়। ক্রমশঃ সাবালক হয়ে ওঠার অনুভূতি জাগে - তার মনে। বন্ধু সুবলের সঙ্গে কালীঘাটের পুরুতদের বর-কনে বিয়ে দেওয়া দেখে সে। বাজারের পাশে রং-মাখা খারাপ মেয়েদের দিকে খারাপ পাড়ায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। এইসব অভিযোগ কচির মামা তার মায়ের কাছে অনুযোগের ভঙ্গিতে জানিয়েছেন। মামা-ভাগ্নের পরস্পরের অভিযোগে কচির মা-র চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল গড়িয়ে পড়ে। সে রাত্রিতেই কচি বাড়ি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কেননা বাড়িতে থাকলে ওর মামা তাকে নষ্ট করে ফেলবে। সে ভেবেছিল - ''আমাকে দাবিয়ে রেখে নিজের মতলব হাসিল করবে। মামা ঠিকই, তবে শুকুনি মামা। এই যা। (৩-'কাচাপাকা')। রাত থাকতে মা-র বালিশের তলায় একটি চিঠি লিখে কচি বাড়ি ছেড়ে বাইরের জগতে পা রাখে।

এই সময়কার কচির মনের অনুভূতিগুলি মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণীতে উল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়। - '' আদি গঙ্গার পাশ দিয়ে হাঁটছি। বাড়ির কথা মনে করে পাছে মন দুর্বল হয়ে যায়, সেইজন্য দু-পাশের দৃশ্যগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, নিজেকে অন্যমনস্ক করে রাখছি।'' (৩-'কাচাপাকা')। পথ চলতে চলতে রাস্তার চারদিকের নানা দৃশ্য দেখে কচি। হোসপাইপে রাস্তা ধোওয়া, খাটালে দুধ দোয়াবার চিড়িক চিড়িক শব্দ, সেপাইদের কুস্তির লড়াই, রেসের মাঠের ঘোড়ার দৌড়াদৌড়ি, গলফস্টিক হাতে সাহেব সুবোর পায়রাকে ছানা খাওয়ানো, ঘাটে রোগা লোকগুলি দিয়ে তেল মালিশ

করিয়ে নেওয়া ইত্যাদি দেখে দেখে রাস্তায় রাস্তায় সারাটা দিন কাটিয়ে দেয় কচি। এরপর ভুট্টার খই ও কলের জল খেয়ে খিদে চাপা দেয় কচি।

এরপর হাওড়া স্টেশনে এসে টিকিট বিহীন কচি ট্রেনে উঠে পড়ে। কোথায় যাবে কোন ট্রেন সে জানে না। ট্রেনের ভাবনার কথায় সে বলে - '' ট্রেন ছাড়তেই আমার কেমন ভয় পেল। কোথায় যাচ্ছি জানি না। মুখে যাই বলি আর মনে মনে যাই ভাবি, বুঝতে পারছি ঘুরে ফিরে সেই মায়ের আঁচল -ধরা হয়েই থেকেছি। মা-র জন্যে খুব মন কেমন করছে। রাত্তিরে না ফিরলে মা কেঁদে ভাসাবে। ছোট বোনটা দাদা-দাদা বলে খুঁজবে। খালি মনে হতে লাগল ফিরে যাই। কিন্দু চলন্ত ট্রেন থেকে এখন আর নামা যাবে না। যা হয়ে গেছে তার আর চারা নেই। (৩-'কাচাপাকা')। একসময়ে তার মনে হয়েছিল তার মা যেন তাকে হাঁটু নাড়িয়ে নাড়িয়ে কু-ঝিকঝিক বলে দোলাচ্ছিল। সেই দুলুনিতেই তার ঘুম এসে গিয়েছিল। ঘুম ভাঙতেই বড় বড় অক্ষরে অক্ষরে লেখা 'জশিডি'।

এরপর ঝাঝায় নেমে পড়ে কচি। সেখানে প্রথমে তার বন্ধু রাম অবতারের কাছে আশ্রয় করে। রামঅবতার লোকোতে কাজ করে এবং রেলকোয়ার্টারে থাকে। ওর বাড়িতেই রান্নার কাজ নেয় কচি। কিন্তু এভাবে রান্না করেই বা ক'দিন চলবে। এরপর কাল্লু বলে একটি ছেলের সাগরেদ হতে হয় তাকে। কাল্লুর নির্দেশ মতো একটি পাহাড়ের ধার ধরে রেললাইন ধরে বস্তা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে কচি। আগে থেকে বলা রেল ড্রাইভার তার বস্তায় কয়লা ভরে দেয়। একদিন রেল পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সে কাজ ছেড়ে দিয়ে একটি ছেলেকে ধরে। সেই ছেলের নির্দেশ মতো সে দেওঘর থেকে চাল এনে ঝাঝায় বিক্রি করে। সেখানেও সে পুলিশের হাতে পড়ে, সেখান থেকে রেহাই পেয়ে সে পাটনায় চলে যায়। পাটনার এ-মুড়ো ও-মুড়ো ঘুরেও কোনো হিল্লে হয় না তার। সেখানে তার ভিন্ন অনুভূতি হয়। এবারে ''পাটনাকে বড় বেশি কাঠখোট্টা লাগল। যে-যার নিজেরটা নিয়ে আছে। বাঙালি নাম দেখে ভেবেছিলাম বাঙালি বললে হয়ত মন ভিজবে। কোথায়? গেটে দাঁড়াতেই কুকুর তেড়ে এল।'' (৪-'কাঁচাপাকা')।

পাটনা ছেড়ে কচি এরপর বেনারসে যায়। বেনারসে থাকাকালীন সে তার মাকে একটি চিঠি লেখে। সেখানে সে টোলে ভর্তি হবার কথা তার মাকে জানায় - '' কিন্তু বাবর বন্ধু রামসেবক বাবু আমাকে বললেন - তুমি বরং কাশী গিয়ে টোলে ভর্তি হও, জীবনে মানুষ হতে পারবে। ওঁর কথায় আমি বেনারসে চলে এসেছি। বিশ্বনাথের মন্দিরে এক বৃদ্ধার সঙ্গে আলাপ হল। কথায় কথায় বেরিয়ে গেল, বাবার এক দুর সম্পর্কের পিসি। তাঁর তিনকুলে কেউ নেই। ওঁর কাছেই এসে আছি। ওঁর বাজার হাট করে দিই। কথা হয়ে গেছে, শিগগিরই টোলে ভর্তি হব। তারপর মা, ফিরে গিয়ে ঠাকুর্দার

নাম দিয়ে একটা টোল খুলে বসব।'' (৪-'কাচাপাকা')। বেনারস সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার কথায় সে বলে - বেনারস একটা বিশ্রী জায়গা। সেখানকার রাস্তায় পা ফেলার জায়গা নেই। সেখানে কেবল রিক্সা, পকেটমার, ফেরিওয়ালা, গুন্ডা মস্তান আর ধর্মের ষাঁড়। সেসব দেখে তার শরীর আনচান করে। কাশীতে যা দেখবার সেটা কেবল ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার ডোমবাজার শ্মশান। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই সে বেনারস ত্যাগ করে।

বেনারস ত্যাগ করে কচি এলাহাবাদ গিয়ে, সেখানকার এক মুসলমানের বেকারিতে কাজ নেয়। সেখানে তার ''ভীষণ খাটুনি। কমবয়সী কাজের লোক বলতে আমরা দুজন। আমি আর নিয়াজ। ও আমার চেয়ে মাথায় সামান্য বড়। কিন্তু আমার চেয়েও রোগা। আমাদের উঠে পড়তে হত রাত তিনটেয়। নিয়াজের ওপর ছিল জল ফুটিয়ে চা করার ভার। মালিকটি ছিল কিপ্টের জাশু। তার হাত দিয়ে জল গলত না।'' (৪-'কাচাপাকা')। কাঁচা বয়সের মধ্যবিত্ত ঘরের কচিকে এলাহাবাদে বেকারিতে অধিক পরিশ্রমে কালযাপন করতে হয়েছিল। সেখানে তাল তাল ময়দা মাখা, সেগুলি পাটার ওপর আছড়ানো, তারপর সেগুলি ছাঁচে ফেলে রাবণের চিতার মত তন্দুরে বসানো, রুটির বাক্স মাথায় নিয়ে আড়াই ক্রোশ রাস্তা হেঁটে হেঁটে এ দোকান- সে দোকান, এ হোটেল -সে হোটেল করে রুটি বিক্রি করতে হয়েছিল কচিকে। শরীরের অসম্ভব ধকল সামলাতে পারে না সে। বাধ্য হয়ে জ্বর গায়ে নিয়ে এলাহাবাদ থেকে দিল্লী যায় সে। সেখানে পৌঁছে তার করুণ অবস্থা সম্পর্কে সে বলে - ''ছবিতে দেখা ছিল, বলে প্রথম দর্শনেও শহরটাকে আমার তেমন অচেনা বলে মনে হল না। খিদে পেয়েছে খুব। পেট ভরে খানিকটা জল খেয়ে নিলাম। সার সার খাবারের দোকান। চোখ সরিয়ে নিচ্ছি। কেননা দেখলেই খিদে পায়। মনে মনে ভাবছি কোথাও একটা লঙ্গরখানা কিংবা কাঙালি ভোজনের ব্যবস্থা দেখলেই পাত পেড়ে বসে যাব। তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। রাতটা কাটালাম জামা মসজিদের পৈঁঠেয় শুয়ে। দেখলাম আমার মত অনেকেই এসে শুয়েছে। তবে দেখে মনে হল, ওরা কেউই আমার মত অভুক্ত নয়।'' (৫-'কাচাপাকা')।

দিল্লীতে কচি এক হোটেলে কাজ নেয়। সেখানে তার কাজ ছিল - ''এঁটো প্লেট ধোয়া আর বাবুর্চিখানা থেকে মাল নিয়ে দোকানে পৌঁছে দেওয়া।'' হোটেলের মালিক মকবুল খান। দিলদরিয়া ব্যক্তি ছিলেন। পরিস্থিতির চাপে কচি মকবুল হোসেনের কাছাকাছি যেতে মুসলমান বনে যায়। মকবুল তাকে বয়-এর কাজ থেকে রেহাই দিয়ে গদিতে বসিয়ে দেয়। সে সময়কালের কথায় কচি বলে - ''হিঁদুর ছেলে আমি ততদিনে পুরোপুরি মুসলমান বনে গিয়েছি। পরনে শালোয়ার, আচকানের ওপর

হাতকাটা ফতুয়া, মাথায় কিস্তি টুপি, চোখে সুর্মা, কানে গোঁজা আতর। একেবারে পুরোদস্তুর এক আবু হোসেন।'' (৫-'কাচাপাকা')।

মকবুল ছিলেন ফুর্তিবাজ আমুদে মানুষ। তার দুটি ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক নেশা ছিল - মদ ও বাঈজি। প্রয়োজনে ও পরিবেশে মানুষ বদলায়। কচিও প্রয়োজনে নিজেকে বদলে নিয়েছিল। কচি বলে - '' আমি ততদিনে মকবুলের প্রায় ইয়ার দোস্তের কোঠায় পৌঁছে গিয়েছি। ফটফট করে উর্দু বলি। শায়েরিও অনেক মুখস্থ হয়ে গেছে। ইচ্ছে থাকলে মানুষ যে কতভাবে নিজেকে পাল্টাতে পারে।'' (৫-'কাচাপাকা')।

কচির চরিত্রের ক্রমবিকাশ লেখক পরিবেশ-পরিস্থিতি ও যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে শিল্পগুণে সমন্বিত করেছেন। কচি বিভিন্ন স্থানে কাজের সন্ধান করে করে দিল্লীতে মকবুল খানের সান্নিধ্যে জীবন সম্পর্কে অনেক পরিণত হয়ে ওঠে। মকবুল খান মদ ও বাঈজীকে নিয়ে জলসার আসরে কচিকে সঙ্গে নিতে চায়। মকবুলের মতলব সম্পর্কে তার সন্দেহ হয়। সে নিজেকে নিজেই জিজ্ঞাসা করে - '' মকবুল কি আমাকে এসব দিয়ে বেঁধে ফেলার মতলব ভাঁজছে।'' হোটেলের দোতলায় কচিদের থাকার ঘরেই মকবুল জলসার আসর বসিয়েছিল। এগুলিকে নিজের জীবন সরিয়ে রাখতে কচি সেদিন সিঁড়ির নিচের ধাপগুলোতেই রাতে থাকে। এরপর কচি নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। এ সম্পর্কে কচি নিজেই বলে - '' নাচ গানে এমনিতেই আমার প্রচন্ড ঝোঁক। তার ওপর রক্তে যৌবনের প্রথম ঢল। নিজেকে আমি ধরে রাখতে পারলাম না।'' (৫-'কাচাপাকা')। সে ভাবে - 'পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে,/ এভাবে কচি মকবুলের হাতে নিঃশর্তে সপে দেয় নিজেকে। সেই বাঈজির বয়স কচির থেকেও বেশী। সে সম্পর্কে কচি বলে - '' একটা গেলাসে মদ ভরে আমার মুখের কাছে যখন ও ধরল, ওর গায়ে গা ঠেকে আমার চোখে মুখে যেন রক্ত ছলকে উঠল।'' (৫-'কাচাপাকা')। সেই বাঈজী জোরকরে কচির হাতদুটো টেনে নিয়ে মদ্যপান করিয়েছিল। সেই বাঈজীর ছোঁয়ায় কচি যেন 'স্বর্গের সুখ' উপলব্ধি করে। এই ঘটনা কচির কাছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বইতে পড়া, খসিয়ে খসিয়ে স্বপ্ন দেখার মতো মনে হয়। সেই সঙ্গে তার সম্বিৎ আসে যে, সে বাড়ি ছেড়েছিল সত্যিকারের মানুষ হবার জন্যে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তার নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম। এবারে সেই নারীর ছোঁয়া তার হৃদয়ে ভিন্ন অনুভূতি নিয়ে আসে। সে যমুনার ধারে নির্জনে গিয়ে কেঁদে মন হালকা করে নেয়। সে ভাবে এবারের কান্নাটা তার মায়ের জন্য নয়। সে ভাবে যার জন্য এখন সে কাঁদছে তাকে সে ছুঁতে পেরেছে কিন্তু নিজের করে ধরতে পারছে না। এই ভাবনায় সে সেই বাঈজীকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করলেও এড়াতে পারে না। আনজু নামের সেই বাঈজী কচিকে সন্ধ্যে বেলা তার বাড়িতে খাবার

নেমন্তন্ন করে। কচিও তাকে না বলতে পারে না। নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কচি আনজুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়। এক সময় দেখে আনজুর চোখে জল। আনজু যেন তাকে বলে - '' ইহাসে তুম চলা যাও, দিল্লি সে ভাগো !'' ভবিষ্যতে মানুষ তৈরী হবার লক্ষে বাইরে আসা কচি ক্রমশঃ নিজেকে হারিয়ে যেতে বসে। সে আত্মবিশ্লেষণ করে বলে - ''আমি এখানে থাকি আনজু চায় না। কিন্তু আমি যে ওর কাছেই থাকতে চাই, সেটা এই প্রথম আমার কাছে ধরা পড়ল। আমার বুকের ভেতর থেকে একটা কান্না উঠে আসছিল। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে চন্ডালের মত সামনে এসে দাঁড়ালো প্রচন্ড এক রাগ। জলসুদ্ধু কাঁচের গ্লাস মেঝেয় ঠাস করে পড়ে ভেঙে গেল। রংচঙে কলাই করা প্লেটের খাবারগুলো ছিটিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। আনজু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে একটু ভেতরে গেল। আমি গুম হয়ে বসে আছি। দেখলাম তার মধ্যে আনজু পোশাক পাল্টে ফেলেছে। চোখের দৃষ্টি, গলার স্বর, সব বদলে গেছে। ওকে দেখাচ্ছে অনেকটা আমার ছেলেবেলার মা-র মত।'' (৫-'কাচাপাকা')। নিজেকে সঁপে দেওয়া আনজুর কাছে, আবার সেই মুহূর্তে নিজের পরিণাম ভাবার মধ্যে কচির চরিত্র ক্রমবিকাশ পুর্বাপর ক্রম বজায় রেখে ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের শিল্পধর্ম অক্ষুন্ন রেখেছেন। কচি তার মা-ছাড়া এ পর্যন্ত কোনো নারীর সংস্পর্শে আসেনি। ক্রমশঃ বয়ঃবৃদ্ধি ও নারীর প্রথম ছোঁয়া কচি চরিত্রে যুক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে সুন্দর রূপ নির্মাণে সফল ও সার্থক হয়েছেন লেখক। মকবুলের মতো একটি বদ চরিত্রের কাছাকাছি গিয়েও কচি নিজেকে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তার মনে হয় - 'খারাপ হতে না চাইলে কেউ কাউকে খারাপ করতে পারে না।' আনজু যে তাঁকে একপ্রকার জোর করেই দিল্লী থেকে চলে যেতে বলে - এর মধ্যে আনজুর ত্যাগ ও ভালোবাসা দেখতে পায় কচি। সেই সঙ্গে সে এও অনুমান করে যে মকবুল হয়তো সর্বদাই আনজুকে কেবল নিজের করে রাখতে চেয়েছিল, এবং আনজুর মধ্যে কচির প্রতি দুর্বলতার চিহ্ন দেখতে পেয়েই মকবুল কৌশলে আনজুকে দিয়ে দিল্লী ছাড়িয়েছে। কচির এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত নেবার সামর্থ্য অর্জনের মধ্যে - পরিপক্ক চরিত্রের মানুষ হয়ে ওঠে - এই অধ্যায়ে।

'কাঁচাপাকা' উপন্যাসের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা দেখি, বাইরের জগৎ প্রত্যক্ষ করে এখন পরিণত কচি তাদের গোটা সংসারের ভার নেবার উপযোগী। সে এখন ছোট ছোট ভাইবোনদের মানুষ করে তোলার কথা ভাবে। তার মা-কেও সংসারের ভার থেকে মুক্তি দেবার কথা ভাবে। এই ভাবনা থেকে সে দিল্লী থেকে কলকাতায় ফিরে নামে ট্রেনে করে। কিন্তু পকেট থেকে ট্রেনের টিকিট কচির একটি ঝোলা থেকে ঝোলা সহ হারিয়ে যায়। সেই খেসারতে তাকে পনেরো দিনের জন্য হাজত বাস করতে হয়। সেই হাজত বাসের পনেরো দিনে জেলখানার অভিজ্ঞতা অর্জন করে কচি। জেলখানায়

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করে কচি মজার সঙ্গেই। সে বলে - '' জেলে ঢুকবার সময় বেশ মজা লাগছিল। জেল সম্বন্ধে ছোটবেলা থেকেই খুব কৌতুহ ছিল। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের সামনে দু-এক সময় দাঁড়িয়ে ভেতরে কয়েদির পোশাক পরা লোকদের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। বাপরে, এরাই তাহলে সেইসব সাংঘাতিক লোক যাদের আমরা বলি নরপিশাচ।'' (৬-'কাঁচাপাকা')। 'জেলের রুটিন - বাঁধা জীবন' কচিকে ভিন্ন অভিজ্ঞতা এনে দেয়। সকাল সাড়ে-পাঁচটায় তাদের মাদুর থেকে তুলে দেয়। তারপর গিনতি করে কোদাল হাতে দিয়ে বাগানে পাঠিয়ে দেয়। প্রত্যেক কাজের নির্দিষ্ট সময়ে ঢং-ঢং করে ঘন্টা বাজে। আর সেই জেলখানার খাবার বলতে - ''ছটা রুটি আর এক হাতা ডাল। দুপুরে কী, সন্ধেগয় কী।'' সেই জেলখানার পনেরো দিনে বিভিন্ন কয়েদীর কাছাকাছি পৌঁছে কচি জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়ে ওঠে। একটা ভিন্ন জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সেই জেলখানার কথায় সে বলে - '' পনেরো দিনের জন্যে মিলেছিল মাদুর বিছোবার একটা জায়গা। খাওয়ার পরই সবাই শোয় না। কোথাও বসে গানের আসর, কোথাও চলে রাজাউজির-মারা আড্ডা। আর যা সব চলে সে আর কহতব্য নয়। তার মধ্যে কোনো রাখঢাকও নেই। এসব ব্যাপারে কয়েদি - সেপাই ভাই-ভাই ; মদ - জুয়োর ঠেক ? কী নেই শ্রী ঘরে।'' (৬-'কাচাপাকা')। আবার এই জেলেই আর এক ভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে তার পরিচয় হয় - রাজনৈতিক বন্দী গোঁসাইজী। কচি তার জীবনের নানা কথা বলে। সেখানে কচির দেখা হলে গোঁসাইজী তাকে দেশ-বিদেশের নানা কথা শোনায়। সেই গোঁসাইজীর কাছে কচি লেনিন, কার্লমার্ক্স, মে-ডে, রুশদেশ, মাও-সে-তুং -এর নানা কথা শোনে। কচি জানায় - ''ওঁর কথা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম আর ভাবতাম - ইস্ আমি কী কাঁচা। দিলদুনিয়ার কোনো খবরই রাখি না।'' (৬-'কাঁচাপাকা')।

আমরা এই অধ্যায়েই কচির সহজ জীবনের বর্ণনা পাই। লেখকের অসাধারণ দক্ষতায় ক্রমশঃ কচির কাঁচা জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই। কচি জেল থেকে ছাড়া পাবর পর কচি বম্বে মেলে উঠে পড়ে। এরপর কাটনি শহরে নেমে নিরুদ্দেশ হয়ে হাঁটতে থাকে। সেখানে সে তার লম্বুদার দেখা পায়। স্টেশনে ভবঘুরে বলে ধরা পড়ার ভয়ে রেল-লাইন বরাবর হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ি ঝোরা দেখতে পায়। সেই ঝোরার নীচে একটা গাছতলায় গিয়ে গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এলে সেই জনশূণ্য স্থানে জংলি জানোয়ারের ভয় তার মনকে গ্রাস করে। সামনের গাছতলা দিয়ে ছায়ার মতো কী একটা চলে যেতে দেখে তার মনে অশরীরীর ভয় হয়। সেখানে আর থাকার ভরসা হয়না তার। এরপর সে বলে - ''কোথায় যাব এবার? পাহাড়ি নদীর ধার দিয়ে দিয়ে অন্ধের মত চলেছি। হঠাৎ দেখি সামনে যুদ্ধের সময়কার ভাঙা এক পরিত্যক্ত গুমটি। ভেতরে

মাকড়সার জাল আর কিছু আগাছা। ঠিক করলাম একটু সাফসুফ করে এখানেই রাতটা কাটিয়ে দেব। খিদে তখন মাথায় উঠেছে। যতসব উদ্ভট চিন্তা। মাঝে মাঝে মশার কামড়ে সোজা হয়ে বসছি। যতদূর দৃষ্টি যায় লোকালয়ের কোনো চিহ্ন নেই। শুধু ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। ঝিঁঝিঁর ডাক সেই নির্জনতাকে আরও যেন উসকে দিচ্ছে। গুমটির পেছনের দেয়ালে খস্‌খস্‌ করে গা ঘষার একটা আওয়াজ। ভয়ে কান খাড়া করে আছি। একটু বাদেই আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেও। বেরিয়ে যে দেখব, সে-সাহস থাকলে তো !'' (৬-'কাঁচাপাকা')। তারওপর নদীতে কিসের যেন জল খাওয়ার আওয়াজ। এমন সময় দুজন লোক যেন কথা বলছে থেমে থেমে হেঁড়ে গলায়। গাছতলা ছেড়ে যেতেই সেই আওয়াজ থেমে গেল। গাছের নিচে যেতেই সেই আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল/ ফলে তার গা ছমছম করতে থাকল। মনুষ্য জগতের বাইরে নদীর ধারে, একটি পাহড়ি ঝোবার জঙ্গলে থেকে বন্যজীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনে কচির চরিত্র বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে।

সেখান থেকে উঠে এসে কচি স্টেশনে আবার এসে একটি ট্রেনে উঠে বসে। তারপর সে জব্বলপুর স্টেশনে নেমে পড়ে। স্টেশনের বাইরে এসে সে শহরের দিকে হাঁটতে থাকে। সে সেদিনের কথায় বলে - '' সারাদিন শুধু হাঁটাই সার হল। পেটে চনচনে খিদে। মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। কাজ চাইতে গেলে মুখ ফুটে তো বলতে হবে। মুখ দিয়ে কথা সরছে না। রাত বাড়ছে দেখে অবসন্ন শরীরে একটা বাড়ির রোয়াকে গিয়ে নেতিয়ে পড়লাম। সারাটা মনের মধ্যে চলে তোলপাড়। আর এভাবে থাকা যায় না। যে করেই হোক ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে হবে।'' (৭-'কাচাপাকা') এসব ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়ে কচি। ঘুম থেকে টেনে চুলের মুঠি ধরে তাকে ভ্যান করে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। আবার জেলে ঢোকায় পুলিশ। এবারের জেলে এক পাকা চোরের সঙ্গে ভাব হয় কচির। সে চোরের নাম মেওয়ালাল। সে কী করে চোর হয়, চোরী করার কথায় কী মজা - সব বলেছিল কচিকে। এভাবে এবারের জেলেও অনেক প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে কচির। তাদের মধ্যে একজনের গানের গলাও খুব ভালো। সে নিজের সুরে দেশ-দুনিয়ার কথা হিন্দী ভাষা গানে বাঁধে -

''বড়ে বড়ে চোর লোগোঁ কা
বড়ে বড়ে মহল
হাম সব ছোটা হামারা লিয়ে
ডাণ্ডাবেড়ি জেহেল -
বড়ে বড়ে লোক কানুন বানাতা
হামকো মিলতা সাজা

হামারা পেট মে আগ জ্বালা কর্

উনলোগ লুটতে মজা -

দেখো ভাই, তক্‌দির দেখো

দুনিয়াকা মজা দেখো -'' (৭-'কাচাপাকা')

এখানেই পরিচয় হয় ফটোগ্রাফার হাসনাৎ-এর সঙ্গে। হাসনাৎ-এর কাছে শোনে কিভাবে সে চক্রান্তের শিকার হয়ে জেলে এসেছে। এখানেই কচি শোনে ইউ-পির নিঃসন্তান জমিদার পরিবারের বাঁজা বড় বউয়ের পাষাণ হৃদয়ের কাহিনী। এবারের জেলে তিনমাস পর জেলের বাইরে এসে পরম আনন্দে কচি 'খোলা আলো-হাওয়ায় বুক ভরে নিঃশ্বাস' নেয়।

দ্বিতীয় বারের জেল থেকে বেরিয়ে কচি ধরে আবার রাস্তা, আবার হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে ঝোপঝাড় পেরিয়ে কচি একটা গুহাগর্তের আশপাশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরে বসে বসে রাত কাটিয়ে দেয়। এরপর সে ভাবে - ''বড় বেশি এলোমেলো হয়ে গেছে জীবন, এবার গুছিয়ে সব কিছু ঠিক করে নিতে হবে।'' - একথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ লাল্লু নামের এক ব্যক্তির সাইকেল রিক্সার ধাক্কা খেয়ে ঢালু রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে কচি। সেই লাল্লুই তাকে ডাক্তারখানায় ঔষধ কিনে দিয়ে চায়ের দোকানে নিয়ে যায়। চা খাবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় কচি না বলতে পারে না। এছাড়াও আরো কিছু খেতে চায় কিনা - একথার উত্তরেও কচি না বলতে পারে নি। কচি বলে - '' খিদের জ্বালায় মানুষ কী রকম নির্লজ্জ হয়ে যায় নিজেকে দিয়েই তা বুঝতে পারছিলাম।'' কচির সব কথা শুনে লাল্লু তাকে নিজের কাছেই রাখে। লাল্লু কচিকে বলে - '' আজ্‌সে হাম তুম এক হ্যায়। সেই লাল্লু বাজারে মাছ বিক্রির ব্যবসা করে। এছাড়া সে সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে, জুয়ো খেলে আর চুল্লু খায়। সবার বিপদে-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে বস্তিতে লাল্লুকে সবাই ভালোবাসে। কিন্তু একজন লাল্লুকে সহ্য করতে পারে না, - সুখিয়ার বাবা। সুখিয়ার সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল ; স অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। সেই সুখিয়াকে মাউথ অর্গানের সুরের টানে লাল্লু আকর্ষণ করে। কিন্তু স্বজাতের নয় বলেই সুখিয়ার বাবা লাল্লুকে সহ্য করতে পারে না। লাল্লুও সুখিয়ার কথায় কচি বলে -. '' এদিকে লাল্লু আমাকে বলেছে ও সত্যিই সুখিয়াকে ভালোবাসে। লাল্লুর একটা মাউথ অর্গ্যান ছিল। কী ভাল সে বাজাত বলায় নয়। ঐ মাউথ অর্গ্যানের সুর শুনিয়েই ও নাকি সুখিয়াকে পটায়। মাছ বিক্রির ব্যাপারটা লাল্লু আস্তে আস্তে আমার ঘাড়ে ফেলে দেয়। এরপর ও বোধহয় এমন কোনো লাইন ধরে, সেটাতে পুলিশের ল্যাজে পা পড়ে।'' (৮- 'কাঁচাপাকা)

পুলিশকে লাল্লু কচির কথা বলে। তার ভাগ্নের সম্পর্কের কথা বলে। বস্তিতে পুলিশ আসার কথা জানতে পেরে কচি সে স্থান ত্যাগ করে। এরপর ঘুরে ঘুরে ইন্দোর, গোয়ালিয়র ও ইটারসি হয়ে সে নাগপুরে এসে পৌছায়। সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের এক মহারাজের কাছে অনেক অনুনয়-বিনয় করে বিফল ও বিরক্ত হয়ে চলে আসে ভুসাওয়াল। সেই ভুসাওয়াল থেকে এসে পৌছায় দাদারে। সেখানে মানিকলাল নামের এক ব্যক্তির হাত ধরে আগরওয়ালজী নামে এক ব্যক্তির কাছে পৌছায়। সেই আগরওয়ালজীর নিদের্শ মতো সে প্ল্যাটফর্মে চা-ফেরির কাজ করে। আগরওয়ালজী এরপর চায়ের সেলস্ম্যান কাজের বদলে দোকানের ভেতরের কাজ দেয়। তার কাছে কচি বারো ঘন্টা শিফট ডিউটি করে, নাইট ডিউটিতে জল টেনে আনে। একদিন রাতে জল টানতে গিয়ে এক শোরগোল শুনতে পায়। সেখানে একদল পুরুষ একটি মেয়েকে নানাভাবে উত্তক্ত করছিল। তার কথায় কচি বলে - ''শাড়ি-পরার ধরনে আর মুখশ্রী দেখে আমার মনে হল মেয়েটি বাঙালী। বয়স ষোল-সতেরোর বেশি নয়। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে আন্দাজে ঢিল মারলাম। বাংলায় জিজ্ঞেস করলাম - কী হয়েছে ? আমার মুখে বাংলা শুনে মেয়েটি যেন অকুলে কুল পেল। বলল - '' দেখুন না, এরা আমাকে বড্ড জ্বালাতন করেছে।'' (৮-কাঁচাপাকা)

অঞ্জলি। সে জানায় মা-বাবাকে হারিয়ে দুই ভাই-বোন টাঙ্গাইল থেকে কলকাতায় কাকার বাড়িতে চলে আসে। সেখানে তাদের কাকিমার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ছোটভাই বোম্বাইতে চলে আসে। ছোটভাইকে খুঁজতে অঞ্জলি বোম্বাইতে আসে, এবং তারপর সেই বদ লোকগুলির খপ্পরে পড়ে। তারপর অঞ্জলির একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার জন্য কচি তার পরিচিত টিকিট চেকার বোসদার কাছে নিয়ে যায়। এরপর সেখান থেকে এক উকিল ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে যায়। এরপর এখানে সেখানে একসঙ্গে ঘোরাফেরা, খাওয়া-দাওয়া করে চলতে চলতে অঞ্জলি আসলে নমিতা। তার কথায় কচি বলে - ''নমিতার তখন গদগদট অবস্থা। গড়গড় করে বলে গেল কী উদ্দেশ্যে ও বোম্বাই এসেছে। ও চায় সিনেমায় নামতে। হেঁদি পেঁচি যে-কোনো রোলে। বোম্বাইতে আমার তো অনেক জানাশোনা। ইচ্ছে করলেই আমি নাকি ওকে সিনেমায় ঢুকিয়ে দিতে পারি। আর তাহলে আমি যা চাইব ও তাই করবে।'' (৮-কাঁচাপাকা)

অবস্থা বিবেচনা করে কচি সেই নমিতাকে একপ্রকার জোরকরেই কলকাতার ট্রেনে তুলে দেয়। কিন্তু এরপর সেখানকার সেইসব দুষ্ট মানুষগুলোর রোষের মুখে পড়ে কচি। এই সময় সে কলকাতা ও বোম্বাই-এর সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য উপলব্ধি করে।

এই সংকটময় অবস্থায় মেহের নামের এক ব্যক্তি কচিকে আগলে রাখে। মেহেরের সঙ্গে তার আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মেহের তাকে নিজের বাড়িতে রাখে। তাকে কোনো কাজও করতে দেয় না। কচির অবস্থার উন্নতি হয়। মেহেরকে তার ভালো মানুষ বলে মনে হয়। জগতের বিভিন্ন মানুষের ভালো-মন্দ উভয় দিকই তার ভাবনাকে আন্দোলিত করে। সে বলে - ''জীবনে আমি মানুষ নিয়ে কম ঘাঁটাঘাঁটি করিনি। ভালোমানুষ দেখেছি খুব কম। জটাধারী সন্ন্যাসী দেখেছি, দিনে যে - গেরস্থ তার চন্নামেত্তর খায়, রাতে তারই বউয়ের সতীত্ব নাশ করে।'' (৮-কাঁচাপাকা)

আত্মবিশ্লেষণ করে বলে - ''নিজের ভেতরটাকে কেটে কুটে নানাভাবে দেখবার চেষ্টা করেছি। আমি সে বড়লোক বাপ-মার তবিল ভেঙে পালাইনি, সেটাই ছিল বাঁচোয়া। হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়েছে আমাকে শুধু দুটো খাওয়ার যোগাড় করতে।'' (৮-কাঁচাপাকা)

মেহেরের কাছে থেকে কচির অবস্থার উন্নতি হয়। এখন সে কোট-প্যান্ট -টাই না পড়ে বাড়ির বার হয় না ; পকেটে তাড়া-করা নোট রাখে। তার ভেতরে আসে গাঢ় প্রেম-ভাবনা। একদিন দরজার বাইরে এসে হঠাৎ তার চোখে পড়ে এক তরুণী। 'চোখাচুখি' হতেই কচির শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। সে যেন সেই তরুণীর কাছ থেকে চোখ দুটোকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না। সেই মেয়ে ছিল ইরানি তরুণী মীনা। মীনা ও তার মা পাশের বাড়িতে থাকে। মীনার সঙ্গে কচির আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কচি মীনার বাড়িতে যায়। আবার মীনাও কচির বাড়িতে আসে। ধীরে ধীরে ওরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কচির কথায় - ''আমার ভবঘুরে জীবনে আমি নানা বয়সের ভাল খারাপ কম মেয়ের সংস্পর্শে আসিনি। আমার মধ্যে কোনো প্যাঁচ -পয়জার না থাকায় সকলের ভাল করবার চেষ্টা করে অনেকের আমি আদরও কুড়িয়েছি। কিন্তু কেউই আমাকে শরীর দিয়ে বেধে ফেলতে পারেনি। আমি শেষে মীনার কাছেই আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে গেলাম। যেদিন খোলা দরজার ফ্রেমে প্রথম ওকে দেখেছিলাম, সেই দিনই ঘরে এসে আমি মনে মনে বলেছিলাম - '' কচি, তুমি এবার মরলে, তুঁহু মম শ্যাম সমান !'' (৮-কাঁচাপাকা)

ওরা পাশাপাশি বসে গল্প করতে করতে মীনার শরীর থেকে অদ্ভূত গন্ধ ধীরে ধীরে কচিকে মাতাল করে তোলে। মীনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে কচি। সেকথা সে নিজেই বলে - ''দরজা বন্ধ করে এসে মীনার দিকে হাত বাড়াতেই আমার বুকে এসে ও ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি নাক দিয়ে ওর সারা শরীর শুঁকছি। মৃগনাভির সেই গন্ধ সেই গন্ধ যে গায়ে মাখা কোনো সেন্টের নয়, মীনার ভেতর থেকে আসছে - ওর মুখে মুখ রেখে আমি সেটা আবিস্কার করতে পারলাম।'' (৮-কাঁচাপাকা) এই পর্বে কচি তার বন্ধু মেহের-এর কাছে থাকে। কচির কাজ মেহের-এর ব্যবসায় সাহায্য করা। মেহের সম্পর্কে কচি

বলে সে - সে ফুর্তিবাজ মানুষ। তার কথায় মেহের ''বড্ড বেশি মোটা দাগের মানুষ।'' তাই মেহেরের ওপর কচির রাগ হয় না বরং দুঃখ হয়। তাদের ব্যবসা সম্পর্কে কচি জানায় - ''ঘুরে ঘুরে আমি অর্ডার জোটাতাম, মেহেরের কাজ ছিল এমন লোক পাকড়ানো সে মালের যোগান দেবে। আমি আনতাম অর্ডার, অন্য লোক দিত মালের যোগান। আমরা কেউ কাউকে জানতাম না। এইখানেই ছিল মেহেরের প্যাঁচ। আমি যেন ওকে ছেড়ে নিজের ব্যবসা শুরু করে দিতে না পারি। ওর কথা হল - বন্ধু বন্ধু, ব্যবসা ব্যবসা।'' ব্যবসা আর মীনার প্রেম এই দুই - নিয়েই ক্রমশঃ পাকা হতে থাকে কচি। মীনা ও কচির প্রেমের কথায় কচি বলে - ''ভালবাসা কাকে বলে সেই প্রথম জানলাম।'' মীনা বুঝেছিল আমি আনাড়ি। মুখে মুখ দিলেও হাত দুটোকে নিয়ে এসব ক্ষেত্রে কী করতে হয় আমি জানতাম না। মীনা নিজে হাতে খুব সপ্রতিভভাবে আমাকে সব শিখিয়েছিল। আস্তে আস্তে আমিও পাকা হয়ে উঠলাম। ও তখন আমার হাতেই পুরোপুরিভাবে নিজেকে ছেড়ে দিত। ওর একটা জিনিসই আমাকে অবাক করত। ওকে যখনই আমি আনন্দ দিতাম, মীনা ফুলে ফুলে উঠে কাঁদত।'' (৮-কাঁচাপাকা)

এই পক্ষে লেখক অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর ও শিল্পগুণের সামঞ্জস্য বজায় রেখে কচি ও মীনার প্রেমের বর্ণনায় উপন্যাসে প্রেমভাবনা প্রকাশ করেছে। যার মধ্যে যৌন বর্ণনাকে ছাপিয়ে কচির জীবনের একঘেয়েমি ভবঘুরে চলাফেরা পাঠকের আকর্ষণ আদায় করে। সমুদ্রের ধারে কিংবা হ্যাঙ্গিং গার্ডেনে মীনার সঙ্গে কচির ঘোরাফেরা, মীনার গান গাওয়া, কচির ভবঘুরে জীবনের কথা বলা, পরস্পরের শরীর নিয়ে খেলার মধ্যেও সে মেহেরের ভূমিকা থাকে। মেহেরও চায় কচি উৎসাহের সঙ্গে ব্যবসার কাজ করার জন্য মীনার প্রেম একটা আনন্দের অবলম্বন হয়ে থাকুক। কিন্তু ক্রমশঃ কচি মেহেরকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। নিজের জীবনকে নিয়ে কচিভাবতে থাকে। চিরদিন এই প্রেম প্রেম খেলার স্থায়িত্ব নেই সকথা কচি ভাবে। অনেকে তা নিয়ে দুঃখ করে, যদি কলুর বলদের মত চোখে ঠুলি দিয়ে কেবল একটি বৃত্তে ঘুরত, আমি হলে সেই একঘেয়েমিতে মরে যেতাম। দুঃখের হলেও এটা সুখের যে, আমার বেলায় তা হয়নি। (৮-কাঁচাপাকা)

ভালবাসায় ডুব দিয়েও কচির মনের ভেতর কোথাও একটা সন্দেহ উঁকি দেয় কিন্তু স্পষ্ট হয় না। অন্তর্মনের এই প্রশ্ন ফাঁসে মাছ ধরার মধ্যে ইঙ্গিত পায় ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে। সে যে মীনার সঙ্গে একাত্ম হয়েছে সে মূলতঃ মেহের-এর রক্ষিতা। কচি একদিন সিনেমায় গেলেও বাজে সিনেমা জন্য এক ঘন্টার মধ্যে ঘরে ফিরে আসে। সে সহসা ঘরে ফিরে মেহের-এর সঙ্গে মীনার দৈহিক মিলন প্রত্যক্ষ করে। এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে কচি মেহেরকে ত্যাগ করে। কচি বলে - ''মেহেরকে মীনার দেহ দেওয়ার ব্যাপারটা আমার বুকে শেলের মত বিঁধছিল।'' মেহেরকে ত্যাগ করার কারণ হিসেবে

কচি বলে - '' কিন্তু তখন তো আমার প্রথম যৌবন। আমার প্রথম প্রেম। অভিমানও ছিল তাই আকাশছোঁয়া।''

পরবর্তী অধ্যায়ে কচি পুরোপুরি পরিণত। নাম কচি হলেও জীবন অভিজ্ঞতায় এখন সে রীতিমতো পাকা। কাঁচাপাকা উপন্যাসের ১০ সংখ্যক অধ্যায়ে তাই কচি নিজের সম্পর্কে বলে - '' কচি আর এখন সেই কুয়োর ব্যাঙ নয়। কচি খোকা তো নয়ই। এমনকী শুধু কচিও নয় - একই সঙ্গে সে হিন্দু, সে মুসলমানও। ইরানি মেহেরের কাছে আদরের 'এ বাঙালি।' কচি বুঝেছে নাম আর পদবি, জাতপাতের বালাই - এসব কিচ্ছু নয়। এ সমস্তই ওপরের খোসা। অস্থিমজ্জা আর রক্তমাংসের সে মানুষ - সেখানে কোনো ফারাক নেই। রামঅবতার, লাল্লু, মেওয়ালাল, আনজুরাই, মেহের, মীনা - এরা সবাই হাতে হাত লাগিয়ে কচির মনের জগৎটাকে টেনে বড় করে দিয়েছে।'' (১০-কাঁচাপাকা)

মীনার কাছ থেকে আঘাত পাবার পর খুব স্বাভাবিকভাবে বাইরের জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কচি বাড়ির দিকে রওনা হয়। মীনাকে না পেয়ে ভালবাসার শীর্ষতম স্থান মা-কে আশ্রয় করে কচি। সে বাড়ীতে এসে বাড়তি বোঝা তার মামা-কে মেসে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। অধিক পরিশ্রম থেকে মা-কে রেহাই দিতে চায়। ছোট ভাই-বোনদের দায়িত্ব নেয়। এখন কচি আর কাঁচা নয় - সে রীতিমত পাকা। তথাপি পিছনে ফেলে আসা জীবন কচিকে কখনো কখনো ভাবিয়ে তোলে। এখনো ''কেউ যদি শাঁখে ফুঁ দেয়, তার কানে আসবে সমুদ্রের শব্দ।'' পরিবারের ভার বহনের জন্য কচি একটা চাকরির খোঁজ করে।

এই সময় সুখচরে থাকার কালে শ্যামনগর -নৈহাটি এলাকায় বেশ কিছু ভালো মানুষের সংস্পর্শে আসে কচি। এঁদের মধ্যে অনেকেই বামসংগঠনের মানুষ ছিলেন। কচি মাঝে মাঝে 'গেট-মিটিঙে তাদের বক্তৃতা শোনে। তাদের যে শ্লোগান কচিকে আলড়িত করে, তা হল - '' মালিকের কাছে হাত পেতে কিছু মিলবে না, নিতে হবে হাত মুচড়ে।'' এই সময়কালের একটি পরিবারের কথায় কচি বলে - '' এই সময়ই বস্তিতে থাকা এক পরিবারের খোঁজ পেয়েছিলাম। এমন লোক যাদের ঠিক বস্তিতে থাকার কথা নয়। যেমন চেহারা, তেমনি কথাবার্তা। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আদর্শবান। কমিউনিস্ট মন্ত্রে দীক্ষিত। স্ত্রী অসাধারণ গান গাইতেন। স্বামী পার্টি করতেন। ওঁদের তখন কষ্টের মধ্যে দিন কাটছিল। কেউ বলত উনি নাকি একজন উদীয়মান লেখক। বলতে গেলে, আমার ধ্যান ধারনাগুলো ওঁরাই আমূল পাল্টে দেন। ভদ্রলোক ভারি সুন্দর কথা বলতেন। ওঁরই কাছে আমি মানুষের শোষণহীন এক সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখতে শিখি।'' (১০-কাঁচাপাকা)

এই উপন্যাসটিতে তার ছেলের জন্য নিজের জীবনের কথা লিখে যাবার প্লট-এ লেখক নিরপেক্ষ থেকে নিজের জীবনকে উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। এখানে যে কমিউনিস্ট পরিবার থেকে কচি সমাজতন্ত্রের কথা জানতে পারে, যে পরিবার এক সময় বস্তির শ্রমিক সংগঠনের কাজ করে, যে পরিবারের একজন উদীয়মান লেখক সে মূলতঃ ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী গীতা মুখোপাধ্যায়। শিল্পের চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কিত করা, শ্রমিক সংগঠনের কাজ করে সমাজকে আলোড়িত করা এবং এই সৃষ্টি যে উত্তরসুরীদের কাজে কালজয়ী গ্রহণযোগ্যতা আদায়ে সমর্থ হবে - সেই প্রত্যয়ে উপন্যাসের কথক কচিকে করেছেন ঔপন্যাসিক। এখানেই কচির নিজের জীবনের কথা ছেলের জন্য লিখে রাখার অভিপ্রায়ের সার্থকতা নিহিত। লেখকের এই উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসের এখানেই সাফল্য।

'কাঁচাপাকা' উপন্যাসের ১০ নং এবং ১১ সংখ্যক অধ্যায়টিতে কচির জীবনের সমাজতান্ত্রিক ভাবনা, রাজনৈতিক চেতনার ও শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা আমরা পাই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাইরের ভবঘুরে আনকোরা জীবনে বিভিন্ন জায়গার মালিক শ্রমিকের বিভিন্ন সম্পর্ক সূত্রে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে কচি। বাইরের জগতের লেনদেনের সম্পর্ক চুকিয়ে কমিউনিস্ট পরিবারের আদর্শে দীক্ষিত হয় সে। এখানে কচি চরিত্রটি অত্যন্ত সরল রৈখিক পথে চলতে চলতে শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছায় কচি। ভালবাসা-প্রত্যাঘাত-অপরাধ-সংশোধন-জগৎ ও জীবনের নানা চড়াই-উৎরাই পথ অতিক্রম করে কচি কমিউনিস্ট মতাদর্শে পৌঁছোয়। এখানে এসেও কচির জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। কারখানায় কাজ দেবার প্রতিশ্রুতিতে ইউনিয়নের নেতা তাকে প্রতারণা করে। সামান্য মজুরিতে দেশের শিল্প গড়ার ও দেশের বড় কাজ করার উদ্দেশ্যে ত্যাগ স্বীকার করে সে পরিবারের মহৎ উদ্দেশ্যে দিনে ন-সিকে দিনমজুরিতে মজুরি খেটে চলে। সেই কারখানায় একটি শ্রমিকের দুর্ঘটনায় কচির ভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা হয়। কচি দেখতে পায় নাইট শিফটে সেই লোকটার অ্যাকসিডেন্ট হলেও বাঁচামরা অবস্থায় ভেতরে পড়ে থাকে অ্যাম্বুলেন্সের অপেক্ষায়। আহত সেই শ্রমিকের ঠাঁই হয়না বাইরে সাহেবদের সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোতে। সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ও অসুরক্ষিত সেইসব অস্থায়ী শ্রমিকের জীবন। কচি বলে -- সেই কারখানায় ''ঢোকার সময় যারা স্তোক বাক্য দিয়েছিল, এখন তাদের প্রত্যেককেই মনে হয় মূর্তিমান শয়তান। বাইরে ভালোমানুষির শুধু একটা খোলস। অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল যার, সেই লোকটা বেঁচে গেছে। কিন্তু টানা ছ-মাস তাকে হাসপাতালে কাটাতে হবে। চিকিৎসার খরচ ছাড়া কোম্পানির কাছ থেকে আর কিছুই সে পাবে না। কেননা সেও অস্থায়ী শ্রমিক। তার অভাবে তার

বাড়ির লোক না খেয়ে মরবে। কিন্তু কোম্পানির নাকি কিছু করার নেই। আইনে আটকায়।'' (১০-কাঁচাপাকা)

এই ঘটনার পর থেকে কচি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, স্থায়িত্বের দাবিতে সরব হয়ে ওঠে। লেবার অফিসারকে স্থায়িত্বের জবাব তলব করে। কারখানার প্রতারক মালিকগুলোকে শয়তান বলে মনে হয় কচির। সে এমন কিছু করতে চায় যাতে তাদের যথোচিত শিক্ষা হয়। সে উপলব্ধি করে কলকারখানার মালিকরা কুণালের মতো শ্রমিকদের ''রস নিংড়ে ছিবড়ে করে দিচ্ছে।'' সে কারখানার শ্রমিক অফিসার ও মালিকদের প্রকৃতি বিচার করে বুঝতে পারে - ''ক্ষমতার স্বাদ আর রক্তের স্বাদে কোনই তফাৎ নেই।'' কচি দেখে সেই 'গ্যারকানুনি দিন'। সে দেখে বাঁধভাঙা বন্যার মত শ্রমিকের ভিড়ে ময়দান উপচে পড়ে। কচি শোনে - '' সেি সঙ্গে হাজার হাজার লোকের গলায় ফেটে পড়া স্লোগান -- ইনক্লাব জিন্দাবাদ। দুনিয়াকা মজদুর এক হো।'' সেই শ্রমিক সভায় কারখানাগুলির মালিকদের বঞ্চনাকে চিহ্নিত করা হয়। শ্রমিকদের আসন্ন লড়াইয়ের জন্য তৈরী হওয়ার ডাক দেওয়া হয়। জাতপাত, ধর্ম ও ঝাণ্ডার সওয়াল করে সেসব বেইমান শ্রমিক ঐক্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাদের সনাক্ত করা হয়। কুণাল ও কচি শ্রমিকদের শোভাযাত্রায় সামিল হয়। মিছিলে গলা মিলিয়ে কচিও আওয়াজ তোলে -- ''ইনক্লাব জিন্দাবাদ! দুনিয়াকা মজদুর এক হো।'' কচি দেখতে পায় সব জায়গায় শ্রমিকের হাল একই। লড়াই ছাড়া তাদের আর কোনো বাঁচার পথ নেই। এখন কচির ''নিজেকে অন্য মানুষ বলে মনে হতে লাগল।'' শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কচি কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের পরিকল্পনা করে। হোসেন ও ওঝার সঙ্গে ইউনিয়ন গঠনের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয় সে। ওদের পরামর্শ দেয় লালজী। কচির কথায় -- ''ভিড়ের রাস্তায় আমার কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লালজী আমাকে বলে কীভাবে ধাপে ধাপে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। কীভাবে আস্তে আস্তে দালালদের কোণঠাসা করে শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের রাস্তায় শ্রমিকদের টেনে আনতে হবে।'' (১০-কাঁচাপাকা)

কচিদের কারখানার সমস্ত ওয়াল ওরা শ্রমিকদের দাবি-দাবা বিভিন্ন ভাষায় পোষ্টারে পোষ্টারে ঢেকে দেয়। এভাবে কচি, হোসেন ও ওঝা কারখানার মালিক ও অফিসারদের রোষের মুখে পড়ে। অথচ মালিকরা নিজেদের স্বার্থের কাজে লাগিয়ে কারখানায় একটা ইউনিয়ন জিইয়ে রেখেছিল। কারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে ভয় দেখিয়ে চার্জশিট হাতে ধরিয়ে, জাতপাত, ধর্মের সুরসুরী দিয়ে শ্রমিকদের ঐক্য ভাঙার চেষ্টা করে মালিক পক্ষ। শ্রমিকদের নির্দিষ্ট পথে চালিত করে লালজী। ধীরে ধীরে কচি শ্রমিকদের নেতা হয়ে ওঠে। যে শ্রমিকরা সারাদিন মুখে রক্ত তুলে খেটে কোম্পানির টাকার

পাহাড় গড়ে তোলে সেই শ্রমিকদের অবস্থা সাহেবদের পোষা কুকুরের অধম, কারখানার শ্রমিকরা প্রশ্ন তোলে -- ''মানুষ কি তবে জানোয়ারের চেয়ে, যন্ত্রের চেয়েও অধম ? আমরা চাই চাকরির স্থায়িত্ব। মাথার ওপর সারাক্ষণ ছাঁটাইয়ের খাঁড়া ঝুলিয়ে রাখা চলবে না।'' (১০-কাঁচাপাকা)

বেগতিক দেখে কারখানার মালিক ও অফিসারেরা হোসেন, ওঝা ও কচিকে কারখানা থেকে চার্জশিট দিয়ে বিদায় করে দেয়। লালজী কারখানার ভেতরের নিরীহ আলতাফকে দিয়ে এমন এক ধুন্ধুমার বাঁধিয়ে দেয় যে কোম্পানি সমস্ত চার্জশিট তুলে নিতে বাধ্য হয়।

'কাঁচাপাকা' উপন্যাসের সর্বশেষ ১১ নং অধ্যায়ে কচির রাজনৈতিক পর্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভিনয় শিল্প। ইউনিয়নের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয় নাটক এবং পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র। ছেলেবেলা থেকেই তার নাটক ও সিনমার প্রতি ঝোঁক ছিল। সেটাও এই পর্বে সম্পূর্ণ হয় কচির জীবনে। সেই নাটক মঞ্চস্থ করার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল কচির রানীদি, সে সেখানকার এক কলেজে চাকরি নিয়ে এসেছিল। তাদের নাটিক ছিল বাংলায় গোর্কির 'মা'। কচির রানীদি যেন তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তার রানীদির খাতিরে শিক্ষিত সমাজে কচির খাতির বেড়ে যায়। সেই থেকে কচির মনে জনমানস সম্পর্কে একটা টানাপোড়েন তৈরী হয়। সে বলে -- ''মাঝে মাঝে ভয় হচ্ছে, আমার কারখানার সহকর্মীরা আমাকে এই ভদ্রঘরের লোকদের সঙ্গে গা ঘষতে দেখলে উল্টোপাল্টা কিছু একটা আবার ভেবে না বসে। যে কেউ ভাবতে পারে আমি দু-নৌকোয় পা দিয়ে আছি।'' (১১-কাঁচাপাকা) এই নাটক মঞ্চস্থ করার হাত ধরে কচি পরিকল্পনা নেয় তার বন্ধুসম অতুলদার সঙ্গে ''কালো মেয়ের পায়ের তলায়'' ছবি করার। শেষ পর্যন্ত পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কারণে সেই ছবি করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। একে সংসারের বোঝা তার ওপর ''নতুন ঘর বাঁধার মনোমোহিনী হাতছানি'' কচিকে ছবি করার পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে বাধ্য করে। কচির কথায় ''ছবি চুলোয় গেল। অতুলদাকে ছেড়ে তখন আমি সম্পুর্ণভাবে নিজেকে সঁপে দিয়েছি ''কালো মেয়ের পায়ের তলায়।''

আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র কচি সামান্য থেকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতে পাকা হয়ে ওঠার আদ্যোপান্ত কাহিনীকে পুষ্ট করে তোলে। ঔপন্যাসিক এখানে জগৎ ও জীবনকে দেখার মহৎ জীবনদর্শন প্রতিফলিত করেছেন মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক ও অসংগঠিত শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তোলার মাধ্যমে। ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আলোচ্য উপন্যাসের প্লট সরল প্লট। উপন্যাসের সংলাপ ও ভাষা নিতান্ত চরিত্রগুলো স্বাভাবিকত্ব বজায় রেখে ঘটনাক্রমে বিকশিত করেছেন ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কচি নিতান্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সহজ কাহিনীবৃত্তে জড়িয়ে পড়েছিল। আলোচ্য উপন্যাসে। আবার পরিবারের অবস্থান, বিভিন্ন মন-মানসিকতার মানুষের কাছাকাছি এসে কচি কাহিনী

শেষে পরিণত হয়ে ওঠে। ফলে উপন্যাসের শীর্ষনাম 'কাঁচাপাকা' অত্যন্ত শিল্পসম্মত ও ব্যঞ্জনা ধর্মী নামকরণ হয়ে উঠেছে অলোচ্য উপন্যাসে। একটি সাধারণ জীবন নিয়ে ঔপন্যাসিকের 'কাঁচাপাকা' উপন্যাসটি একটি অসাধারণ শিল্প নিমার্ণ হয়ে উঠেছে।

ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সৃজনশীলতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁর জ্ঞকমরেড কথা কওঞ্চ (১৯৯০) উপন্যাসটি। এই উপন্যাসটি তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে অন্যতম স্থান রয়েছে তাঁর মহৎ জীবনদর্শন ও শিল্পীর জগৎ ও জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। সেই দৃষ্টিতে তাঁর জ্ঞকমরেড কথা কওঞ্চ উপন্যাসটি সমকালে সৃষ্ট বাংলা উপন্যাসের ধারায় একটি অনন্য সংযোজন। এই উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ - ১৯৯০ সালে আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে। লেখক তাঁর স্নেহধন্য প্রণব বিশ্বাস মহাশয়কে এই উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছিলেন। আলোচ্য উপন্যাসের বিষয় কথা অনুধাবনে সহায়ক হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচ্ছদলেখ। সেখানে লেখা হয়েছে জ্ঞপ্রথমাবধি তিনি ছিলেন পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। সে কি আজকের কথা? ভয়কাতুরে, মুখচোরা, কোমল প্রাণ কিশোর থেকে ক্রমশ হয়ে উঠেছিলেন ইংরেজের হৃৎকম্প-ঘটানো এক বিপ্লবী। ট্যাঁকে পিস্তল, বুকে আদর্শবাদ। চিরটাকাল কেটে গেল এক ভাবের ঘোরে। জীবনের সিকিভাগ শ্রীঘরে। সময় পালটাল, তিনি থেকে গেলেন একই রকম। দেশ স্বাধীন হল, পার্টি দু-ভাগ হল, তিনি তাঁর জায়গা ছেড়ে এক পাও এগোলেন না। পার্টির স্বার্থে সংসারী হননি, পার্টির গায়ে কাদার দাগ বাঁচাতে সপ্তর্পণে এড়িয়ে চলেছেন সখলনের পথ। নেতাদের কথাই তাঁর কাছে বেদবাক্য। নিজের মনের কথা কখনো খুলে বলেননি। অন্যরকম কিছু দেখলেও উড়িয়ে দিয়েছেন নিজেরই চোখের দোষ বলে। তবু পরিণাম?

এক কমরেডের বিচিত্র জীবনকাহিনীর সূত্রে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর এই সাহসী, স্পষ্ট, উজাড় করে দিয়েছেন খুব-কাছ-থেকে-দেখা নিজের জীবনেরই কিছু অভিজ্ঞতাকে। আর সেই পরশপাথরের স্পর্শেই এ-উপন্যাস হয়ে উঠেছে নিখাঁদ সোনা।ঞ

জ্ঞকমরেড, কথা কওঞ্চ উপন্যাসেক আমরা দেখি ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, জীবনের একটা উচ্চ আদর্শ তাঁর কালের গন্ডি অতিক্রম করে চিরস্থায়ী আবেদনের প্রয়াস এই উপন্যাসে আমরা পাই। বিশিষ্ট রাজনৈতিক বোধ ও জীবনের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ করে অহৈতুকী রস সৃজন ও সাহিত্য নিমার্ণের নিরিখে জ্ঞকমরেড কথা কওঞ্চ বাংলা সাহিত্যের ধারায় অবিনব সৃষ্টি। এই উপন্যাসের বিষয় অভিজ্ঞতা কাঠামো এবং নিজাল গদ্য ভঙ্গির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যতা আমরা পাই।

ওকমরেড, কথা কওঞ্চ উপন্যাসের ছোট ছোট অনুচ্ছেদের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ। অনুচ্ছেদগুলি ঔপন্যাসিক শীর্ষনাম দ্বারা প্রকাশ করেছেন। অনুচ্ছেদ গুলি ছিল 'শিয়রে চিত্রগুপ্ত', 'বসুবৈধ কুটম্বকম', 'পেছনে কী বলে', 'বাঁয়ে চলো ভাই, বাঁয়ে', 'গিধ্ধড়', 'না, কমরেড না', 'পায়ের নিচে শেকড়', 'বেনো জল', 'চোখের ছানি', 'বুকের পাটা', 'কমলি ছাড়ে না', 'জেরার মুখে' 'পিসেমশাইয়ের ডায়েরি', 'ভায়েরির খোল সে', 'তিনের ঘরে দুই শহিদ', 'সেদিন গুরু বার', 'এক দুই তিন', 'আসলনামা', 'নজরদারি', 'শুকনো পোড়া লঙ্কা', 'এমন মানজমিন', 'বাড়ানো হাতে', 'চাওয়া পাওয়া', 'যা নয় তাই আশ্বিনের ঝাড়', 'নটে গাছ', 'পার্টির ঘরবর' 'এক নৌকায়', 'ভাঙার পর','কালা মেঘ', 'অনির্বচনীয় উপোসী মন', 'কালো নামাবলী', 'অগ্নিহোত্রী' 'কথা রইল' সেগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে টুকরো টুকরো বিভিন্ন ছবি। উপন্যাসেক একটি অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন ছবির সামগ্রিক শিল্পরূপ নির্মাণ ঔপন্যাসি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব শৈলী।

'কমরেড, কথা কও' (১৯৯০) উপন্যাসের কথক লেখক স্বয়ং। উপন্যাসের ভাই সাহেব, যিনি আজ শুনতে পান না, সাড়া দিতে পাবেন না, একদা সর্বহারার সেবায় তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন। মাথায় লাঠির আঘাতে আহত ও অজ্ঞান এই প্রবীণ কমরেড হাসপাতালের শয্যায় শায়িত। ত্রিভুবনে তার আত্মীয় বা আপনার লোক বলে কেউ নেই। সন্ত্রাসবাদী থেকে তিনি কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তিনি পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে থেকে গেছেন পার্টি অফিসে, সেই কমরেড কে অনুনয় করে কথক বলেছেন 'কমরেড, কথা কও '। এই উপন্যাসের পঁয়ত্রিশটি পরিচ্ছেদে আমরা পাই উনিশ শ-আটচল্লিশ - ঊনপঞ্চাশের কথা, অধীরের শহীদ হওয়ার কথা, একটি নার্স মেয়ের গল্প, রুক্মিনী- গিরিধারীর কথা। সেই ছোট ছোট কাহিনীগুলির মধ্যে উপন্যাসে ঢুকে যায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রসঙ্গ, সাতাত্তর পূর্ববর্তী কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট রাজনীতির কমিউনিস্ট পার্টিকে বে আইনী ঘোসণা করার প্রসঙ্গ, নেহেরুর সমাজতন্ত্রবাদ প্রসঙ্গ। সেই সঙ্গে এই উপন্যাসে মুক্ত হয় অবলীলায় শৈশবস্মৃতি- সংগঠন সভা ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতা বোধ ও প্রেম ভাবনা এবং পরিণতিতে ভাইসাহেবের মৃত্যু। ভাই সাহেবের শেষ যাত্রায় সামিল হলেন সর্বদলের সব শ্রেণীর মানুষ এই উপন্যাসের উল্লেখ্যণীয় দিক হল ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন-সমাজবাস্তবতা-চরিত্র নির্মাণ আঙ্গিক- কাহিনী বিন্যাস সহ শিল্প সার্থকতা কমরেড, কথা কও' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ 'শিয়রে চিত্রগুপ্ত'। উপন্যাসের শুরুতেই ঔপন্যাসিক বর্ণনাত্মক ঢঙে বলেন 'মাথায় চোট লেগেছে তো কী? সব ভুলে যেতে হবে? এটা কোনো কথা হল? তাছাড়া এই তো সব কিছু মনে করার সময়। তোফা শুয়ে আছ। সংসারের কুটোটা ভেঙে দুখানা করতে হচ্ছে না। গাঁটের

পয়সা খরচ নেই। ফ্রী বেডে দিব্যি ভর্তি হতে পেরেছ। তাই বলে মনে করো না সাত খুন মাপ'। এই উপন্যাসের কাহিনীতে প্রবেশের স্টাইল, বাক্য নির্মাণ, গদ্যের অভিনব আদল এবং সমকাল চেতনা লেখকের নিজস্ব বৃত্তির পরিচায়ক হয়ে ওঠে। লেখক তাঁর উদ্দিষ্ট শ্রেষ্ঠ চরিত্রের প্রকৃতি স্বল্প কয়েকটি বাক্যের আশ্রয়ে অসাধারণ শৈল্পিক গুণের সঙ্গে উপন্যাসের শুরুতেই বলে দিয়েছেন। সেখানে তিনি লেখেন - 'শ্বশুরবাড়ি কী, তা তুমি কী বুঝবে? জীবনে তো ছাঁদনাতলার রাস্তা মাড়ালে না। এসেছ একলা, যেতেও হবে সেই একলা। দোকলা জীবনের যে কী মজা কোনদিন তা টেরও পেলে না। ও হ্যাঁ, তোমাদের কাছে তো শ্বশুরবাড়ির একটাই মানে। সে হল জেলখানা। শ্রী ঘর। তোমার তো আরও মনে হবে। কেননা তোমার জীবনের সিকিভাগই তো শ্রীঘরে কেটেছে।' সেই সময়কালে দীর্ঘমেয়াদী বন্দীরা একেক করে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বেরোচ্ছিল। এবং ইংরেজরাও তত দিনে বুঝে গিয়েছিল বোমা পিস্তলের দিন শেষ হয়ে গেছে। এই সেদিনের এক ছেলে ষোল বছরের এক কয়েদিকে বলেছিল তার জীবনের ষোলটা বছরই বরবাদ। কেননা তার কথায় মন থেকে সন্ত্রাসবাদী ঐতিহ্য সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেললে দুনমুখী দুমানায় চলা যায় না। ষোল বছর জেলে থাকার অর্থ সেই দীর্ঘকাল জনজীবন থেকে সরে থাকা। এবং দিনানুদৈনিক সংগ্রামের যে অভিজ্ঞতা তা থেকে বঞ্চিত হওয়া।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (বসুধৈব কুটুম্বকম) শীর্ষক অংশে ফ্ল্যাসব্যাক রীতিতে উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের প্রকৃতি ও বাল্যস্মৃতি উল্লেখ করেছেন। আজকের সেই কমিউনিস্ট নেতা ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন 'মুখচোর' প্রকৃতির। গ্রামের প্রতিবেশীরা তাঁকে বলতেন 'খুঁজখুঁজে'। সে কাউকে গলা তুলে কোনো কথা বলতে পারতোনা। আবার কোনো অন্যায়ও তেমনভাবে সহ্য করতে পারতো না। খেলাধূলা ও বন্ধুবান্ধব ছোটবেলা থেকে তেমন ছিল না তাঁর। ছোটবেলা একবার খেলতে গিয়ে তাঁর পা মচকে যায়। এবং তারপর আর কোনোদিন সে মাঠমুখো হয়নি। তারপর থেকেই সে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে ওঠে। পার্টির বিভিন্ন কর্মসূচীতে সামিল হয়ে সে শাসক শ্রেণীর রোষানলে পড়ে দীর্ঘ ষোলবছর জেল খাটে। জেল থেকে বেরিয়ে গ্রামে ফিরে সে তার চেনা জানা গ্রামকে আর দেখতে পায় না। ততদিনে গ্রামের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মা-বাবাও লোকান্তরিত হয়েছেন। আত্মীয়-স্বজনেরা সহায় সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। ছেলেবেলায় যে মিস্টি মেয়েটিকে সে ভালোবেসেছিল, সেও জেলে যাওয়ার দু-আড়াই বছরের মধ্যে পেটে ছেলে নিয়ে লজ্জায় কলসি গলায় বেঁধে জলে ডুবে মরে যায়। তাঁর জীবনের এই সব স্মৃতি লেখক প্রত্যক্ষ উক্তিতে সংলাপের ভঙ্গিতে বিবৃত করেছেন আলোচ্য অংশে। জেলে যাবার পর পরিবর্তিত গ্রামের কথায় ঔপন্যাসিক লেখেন এমনকী বুড়ো বয়সেও মাঝে মধ্যে তোমার স্বপ্নে হানা দিয়েছে ছেলেবেলার গ্রাম। এমনকী এ - হুঁশটুকুও তোমার ছিল না যে, তোমার যে

গ্রাম তুমি স্বপ্নে দেখ আজ তার খোলনলচে সবই বদলে গেছে। সেদিনের সঙ্গে আজকের কোনই মিল নেই। সে সব বদলের কথা কাছে পিঠের গ্রামের লোকদের মুখেই তো তুমি কত শুনেছ। চিনিকল ঢের আগেই হয়েছিল। পরে হয়েছে মদের ভাটিখানা। গাঁয়ের ওপর দিয়ে বাস যাচ্ছে। সাইকেল রিক্সার ছড়াছড়ি। সারা দিক সাইকেল সারাইয়ের দোকানে ছেয়ে গেছে। জমিদার বাবুদের যেটা ছিল চন্ডীমন্ডপ, সেখানে এখন লাল ঝান্ডার আপিস।'' (বৈসুধৈব কুটুম্বকম কমরেড, কথা কও) এখানে শৈশবস্মৃতি আবেগের সঙ্গে বিশ্বাস্য করে তুলেছেন ঔপন্যাসিক। সেই সঙ্গে চরিত্র বিকাশের পারম্পর্য রক্ষার শৈল্পিক গুণের পরিচয় এখানে পাই । এরপরের 'পেছনে কী বলে' শীর্ষক পরিচ্ছেদে গ্রামের সেই নিতান্ত সাধারণ ছেলেটি মোচড় দিয়ে জাতীয়বোধ ও দেশপ্রেমের চেতনায় পরিবর্তিত হয়ে ওঠে। একটি চরিত্রের স্বল্প পরিসরে পরিণত করে তোলার অসাধারণ শিল্প চাতুর্যের পরিচয় এখানে আমরা পাই - ''তোমাকে আগে যারা দেখেছে, পরে তারা তোমাকে দেখলে অবাক হয়ে যেত। ভয়কাতুর সেই মানষটাই কিনা ট্যাঁকে পিস্তল গুঁজে ইংরেজদের প্রাণে জাগিয়ে তুলেছে থরহরিকম্প'' (পেছনে কী বলে, কমরেড কথা কও) এই পরিবর্তনের শৈল্পিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার সচেতন শিল্পী সত্ত্বায় অনিবার্যতাও নির্দেশ করেছেন লেখক। সেখানে তিনি লেখেন ''এটা হয়। মনের ভাস্তাব হলে মানুষ এমনিভাবে বদলে যায়। আদর্শ যদি মনে ধরে মূকও বাচাল হয়। পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করে।'' (পেছনে কী বলে , কমরেড, কথা কও)। সাধারণ জীবন যাপন ও সততার জন্য মানুষ তাকে 'গান্ধীবাবা' করে ডাকত। তার পোষাক বলতে আধময়লা ধুতি আর মোটা কাপড়ের রেডিমেড পাঞ্জাবি। নিজে হাত পুড়িয়ে রেধে খায়। মদগাঁজা - বিড়ি সিগারেট ইত্যাদি নেশাকে জয় করে নেয় সে। সেই চরিত্রটির প্রকৃতি পাঠকের হৃদয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেই চরিত্রটির সম্পর্কে তিনি বলেন - ''সারাটা জীবন দেশোদ্ধার করে বেড়ালে। কিন্তু কোন দিন মাটিতে পা দিয়ে হাঁটতে শিখলে না। চিরটা কাল ভাবের ঘোরে কাটিয়ে দিলে। ভাবের ঘরে চুরি করনি তো কী হয়েছে।'' (পেছনে কী বলে কমরেড, কথা কও সে জীবনের একটি বড় সময় নিয়ে কারখানায় শ্রমিক সংগঠনের কাজ করে। সভা সমিতিতে বক্তৃতা দেয়। মিছিলের আগে আগে পা মেলায় সে। একদিনের রাজনৈতিক সংঘাতে লাঠির আঘাতে তার শরীরের ডানদিক পক্ষাঘাতে অসার হয়ে যায়। হাসপাতালে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রকমারি নল লাগিয়ে দেখতে যায় গিরিধারী। সেই গিরিধারী রুক্মিনীকে বিয়ে করে রুক্মিনীর দুটি বাচ্চা সহ। ডাক্তারী মতে গিরিধারী কোনোদিন সন্তানের পিতা হতে পারবে না। সে এখন সেই রুক্মিনীর বাচ্চা দুটোকে সন্তানস্নেহে ভালোবাসে। লেখক এই ঘটনার প্রসঙ্গে ভাইসাহেব এর মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় দিয়েছেন। তার সম্পর্কে লেখক বলেন ''কী যেন বল তোমরা নিজেদের? বন্ধুবাদী উহু, শুধু বন্ধুবাদী নয়।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী। কেউ তোমাকে ভাববাদী বললে রেগে টং হও। তোমাকে অবাস্তববাদী বললে বরং সত্যের কাছাকাছি হয়।'' (বায়ে চলো ভাই, বাঁয়ে / কমরেড, কথা কও)

পরবর্তী পরিচ্ছেদ গিধধড় এই পরিচ্ছেদে গিরিধারী চরিত্রের পরিচয় পাই আমরা। এই চরিত্রের মধ্যে লেখকের এক সংগ্রামী শ্রেণীর মানুষের পরিচয় আমরা পাই। পরিচ্ছেদের শুরুতেই লেখক লিখেছেন - ''একবার ভেবে দেখো তো গিরিধারীর মত মানুষেরা কী অবস্থার মধ্যে মানুষ হয়েছে!'' গিরিধারীর পরিচয় দিছেন লেখক এভাবে- ''ওর ঠাকুর্দা ছিল গাঁয়ের চৌকিদার। নিজেদের হিন্দু বললেও উচ্চবর্ণদের কাছে ওরা ছিল জলঅচল। ছোটলোক ইতর। খাদ্যাখাদ্যের কোনো বাছবিচার ছিলনা। ইল্লত বলতে যা বোঝায়। ওরা মনে করে দানবকুলে ওদের জন্ম। রাহু ওদের পূর্বপুরুষ'' । (গিধ্ধর/কমরেড, কথা কও)। গিরিধারীর বাবা ছিলেন ভারি ডাকাবুকো লোক। কোনো রকম অন্যায় তিনি সহ্য করতেন না। তিনিই গিরিধারীকে গিধ্ধর বলে ডাকতেন। মা-এর মৃত্যুর পর গিরিধারীর বাবা অতিরিক্ত মধ্যপান করে ও নর্দমায় পড়ে মারা যায়। সেই গিরিধারীর পূর্বপুরুষের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক অসামান্য শিল্পদক্ষতায় পুরাণ চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ (না, কমরেড না)। এই পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক ভাইসাহেবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার আঘাতের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ভাইসাহেবের উদ্দেশ্যে ঔপন্যাসিক তাই বলেন ''তোমাকে মারল, আর তুমি চুপ মেরে গেলে। এটা কোনো কথা হল, ভাই সাহেব? আর কিছু না হোক, যারা মারল, তাদের ধুড়ধুড়ি তো নেড়ে দিতে পারতে। হারামজাদা বেজম্মারা আবার মানুষ নাকি? তোমার সঙ্গের লোকগুলোই বা কী! এমনই ভেড়ের ভেড়েসে, তোমাকে পড়ে যেতে দেখেই চোঁ চোঁ পালিয়ে গেল? ওদেরই না তুমি কমরেড কমরেড বলে এতদিন মাথায় তুলে নেচেছ! আহা, কী দিরির কমরেড!'' (না, কমরেড না / কমরেড, কথা কও) এই কমরেড শব্দটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিশেষে কত ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, আবেদন সৃষ্টি করে আবেগের প্রবাহ বয়ে নিয়ে আসে আলোচ্য পরিচ্ছেদে লেখক তার প্রয়োগিক দিক উল্লেখ করেছেন। এতে এই বিদেশী শব্দটির প্রতি লেখকের ব্যক্তি মানুষের দুর্বলতার প্রকাশ দেখতে পাই আমরা। এখানে 'কমরেড' শব্দটি বিশেষ আবেদন সৃষ্টির প্রয়োগ দেখিয়ে লেখেন ছাড়া পাওয়ার আনন্দে তুমি ভুলেই গিয়েছিলে যে, দুনিয়ায় আপন বলতে কেউ নেই। ঠিক সেই সময় ভিড়ের ভেতর থেকে একটা ডাক ভেসে এল 'কমরেড'। -- একটা পরদেশী শব্দ মুখের কথায় উঠে এসে কানে যে এমন মধু ঢেলে দিতে পারে, জেলগেটের বাইরে এসে সেই প্রথম তুমি তা উপলব্ধি করেছিলে।'' (না, কমরেড না/ কমরেড কথা কও) জেলজেটের বাইরের রাজনৈতিক বন্দীদের আত্মীয় পরিজনদের ভিড় থেকে বিশ বাইশ বছরের কমরেড

আলম 'কমরেড' শব্দটি দ্বারা ভাইসাহেবকে সম্বোধন করলে সেই শব্দটি তার হৃদয়ে মধুর আবেদন সৃষ্টি করে। লেখকের উপলব্ধিতে সেই মধুর ডাকটি যেন একমাত্র তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। লেখকের কাছে সেই শব্দটি যেমন মধুর, তেমনি বিপ্লরাত্মক। লেখক এই পরিচ্ছেদে নিজেই বলেন ''কমরেড এর মতন এমন একটা বিপ্লবাত্মক শব্দ শেষ পর্যন্ত তোমার মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেল।'' (না, কমরেড না/ কমরেড কথা কও)।

ভাইসাহেব কে জেল থেকে বেরোনোর পর যে আলম নিতে এসে ছিল সেও বিয়ে সাদি আর করে না। টেকলে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা হয়ে ওঠে সে। তার পরিচয় দিয়ে লেখক বলেছেন - ''যাদের শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু ছিল না। তাদেরও ভরসাস্থল ছিল আলম। বড় বড় নেতাদের সঙ্গে আলমের ছিল ওঠা - বসা দিন দুনিয়ার সমস্ত খবরই ছিল তার নখ দর্পণে।'' (পায়ের নিচে শেকড়/কমরেড কথা কও)। লেখক আলমের চরিত্র - প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন - ''তাছাড়া আলমের দলই তো পাড়ার রক্ষেকর্তা। ফি বার মহরমে আলমের দল লাঠিখেলা দেখায়, হায়-হাসান হায়-হোসেন করে। দাঙ্গার সময় রাত জেগে মোড়া পাহারা দেয়। কারো বাড়িতে অসুখ বিসুখ করলে এমনকী রাত বিরেতেও ডাক্তার ধরে আনে''। (পায়ের নিচে শেকড়/কমরেড, কথা কও। ভাইসাহেবই আলমকে শিখিয়ে পড়িয়ে কমিউনিস্ট করেছে। গিরিধারী ও আলম - ভাইসাহেবের হাত ধরেই পার্টিতে এসেছিল। ভাইসাহবকে পার্টির সকলেই অভিভাবকের মতো মান্য করে। অথচ সেই ভাইসাহেবের মাথায় কেউ বাঁশের বাড়ি মারতে পারে একথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। পার্টি তখন দ্বিধাবিভক্ত হলেও সেখানকার পার্টিটা ভাই সাহেবের হাতেই গড়া। মূলতঃ ভাইসাহেব পার্টির সবাইকে অন্তঃপ্রাণ করে নিলেও তাঁরা সবাই যে ভালোমানুষ নয়, অন্ধ আবেগে তিনি তা কখনো বিচার করে দেখেননি। পার্টির ভেতরকার মতলববাজ, সুবিধেবাদী স্বার্থপর পার্টি সদস্যদের খারাপ দিক টিকেও ঔপন্যাসিক আলমের দৃষ্টিতে উপন্যাসে আলোকপাত করেছেন। তাদের কথায় লেখক বলেন ''আলম অবশ্য আগে থেকেই ট্রেড ইউনিয়নে ছিল। তবে যাদের সঙ্গে ও তখন কাজ করত তারা ছিল এক নম্বরের হারামি। মতলববাজ সুবিধেবাদী। মজুরদের নাচিয়ে দিয়ে মালিকদের সঙ্গে দর কষত। তাল করত ইলেকশনে দাঁড়াবার''(বেনো জল/কমরেড, কথা কও)। পার্টিতে নতুন ঢুকে একটা শ্রেণী সামাজিক স্বাভাবিক সম্পর্কে যে বিভাজন এনেছিল তাকে উপন্যাসের অন্তভুর্ক্ত করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সামাজিক সম্পর্কগুলো এই নব্য মার্ক্সবাদীদের আচরণে একটু একটু করে বিভাজনের রূপ নিয়েছিল। ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই বিষয়টিকে শিল্পে রূপ দিয়ে লেখেন - ''পার্টিতে যারা নতুন এসেছে তারা অনবরত ওকে খোঁটা দেয়। বলে কমরেড, সেদিন দেখলাম ভাইসাহেবের সঙ্গে হেসে হেসে কথা

বলছেন। কেন? কংগ্রেসের পা চাটাদের সঙ্গে কিসের অত ঢলানি? সাম্রাজ্যবাদের ঘাড়ে-চাপা লড়াইয়ের ভূত ঝাড়াবার জন্যে ওঝা সেজে ওরা কেবল শান্তি শান্তি করে। ওদের একেবারেই কাছে ঘেঁষতে দেবেন না, কমরেড। মন থেকে বুর্জোয়া মায়া-দয়া মুছে ফেলুন। নইলে নিজেও ডুববেন, পার্টিটাকেও ডোবাবেন। পার্টির এই সব ছেলেছোকরাদের দেখে আলম কেমন ঘাবড়ে যায়। মাঝে মাঝে খুব রাগ হয়। এমন চ্যাটাং করে কথা বলে যে, আলমের ইচ্ছে করে ঝামা দিয়ে ওদের মুখগুলো ঘষে দিতে।'' (বেনো জল / কমরেড, কথা কও)। আলমের ইচ্ছের মধ্য দিয়ে লেখকের সামাজিক সম্পর্কের বিভাজনের প্রতি ক্ষোভের প্রকাশ দেখতে পাই আমরা।

উপন্যাসে লেখক সমকালের মার্কসবাদী ও কংগ্রেসী নীতিবাদের দ্বন্দ্বের শিল্পিত রূপদানের প্রয়াস রেখেছিলেন। ভাইসাহেব চরিত্রটির মধ্যে নীতির বিরোধ থাকলেও সামাজিক বোধ ও জাতীয়তাবোধের মমত্ব এতটুকু ঘাটতি ছিল না। ফলে তাঁর ব্যক্তিমানসের এই প্রকৃতির কারণে পার্টিতে তিনি ক্রমশঃ বাতিলের তালিকাভুক্ত হতে বসেছিলেন। অথচ যে সমাজের কাছে ভাইসাহেব আজ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছেন, সেই সমাজেই ''একেবারে গোড়ার যুগে ভাইসাহেব এসে মজুরদের ক্লাস নিতেন। আদ্যিকালের সমাজ কেমন ছিল, ধাপে ধাপে কীভাবে তার বদল হল। কেমন করে মানুষে মানুষে ফারাক হল। শ্রেণীভেদ দেখা দিল। শ্রেণী সংগ্রামের ভেতর দিয়েই কীভাবে মানুষ শ্রেণীহীন সমাজের দিকে এগোবে। ভাইসাহেব এই সব জলের মত করে বোঝাতেন। সেই ভাইসাহেব আজ কোন মুখে বলেন যে, দেশভক্ত বুর্জোয়াদের সঙ্গে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে?'' (চোখের ছানি/ কমরেড, কথা কও)। এখানে ভাইসাহেবের সামাজিক বোধ ও সমকালের কংগ্রেস সরকারের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল মাক্সবাদীদের মানসপটকে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়। অসুস্থ ভাইসাহেবকে হাসপাতালে পার্টির অজান্তে দেখতে যাওয়ার আগ্রহ ও আশঙ্কা প্রকাশ পায় আলম চরিত্রে। পার্টির এককালের সংগঠক তার সামাজিক মতপার্থক্যের কারণে ও উচ্চ আদর্শের কারণ ও উদার চিত্ততার প্রকাশে পরিত্যক্ত হয়েছেন। এখানে পার্টির সংকীর্ণতার রূপটিকে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রিয় কাঠামোতে রাজনীতি সমাজের প্রত্যেক অঙ্ককেই নিয়ন্ত্রণ করে। সেই বিশেষ দিকটিকে ঔপন্যাসিক ভাইসাহেবের অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে শুশ্রূষার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। লেখক গিরিধারী ও রুক্মিনীর কথোপকথন প্রসঙ্গে লেখেন 'কী গো! আটচল্লিশ ঘন্টা পেরিয়ে গেল। না খুলল চোখের পাতা, না বেরোল গলা দিয়ে একটা টু শব্দ। শুধু ঠোঁট দুটোই যা থেকে থেকে নড়ে উঠছে। তুমি তো কিছুই লক্ষ করছ না হে! ইমার্জেন্সিতে নিয়ে আসার পর এলেবেলে একটা

বেডে তোমাকে ফেলে রেখেছিল। দু-চারটে টেলিফোন আসতেই ওপর মহলের টনক নড়ে। এখন তুমি কেবিনে। চব্বিশ ঘন্টা পালা করে দু-দুটো নার্স তোমার দেখভাল করছে'' (বুকের পাটা/কমরেড, কথা কও)। যে নার্স মেয়েটি ভাইসাহেবকে দেখভাল করছে তার বাবার সঙ্গে একই জেলে অনেকদিন কাটিয়েছিল ভাইসাহেব। একই জেলায় তাদের বাড়ি। সেই জেলখানাতেই কমিউনিস্ট হয় ভাইসাহেব। সারাদিন জেলে বই মুখে করে বসে থাকে। সে সময়ও তার পুরনো দলের লোকেরা গায়ের জ্বালায় তাকে পিটিয়েছিল। এরপর থেকে ভাইসাহেব সর্বহারার সেবায় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন নিয়েছিল। সেই নার্স মেয়েটি আজ রাজনৈতিক নেতাদের ফোনে ও তাগিদে কর্মসূত্রে সর্বদা মুখে হাসি নিয়ে ভাইসাহেবের সেবা করে চলেছে। অথচ তার পারিবারিক অশান্তির ঝড় বয়ে চলেছে তার ওপর দিয়ে। সেবার এ এক কঠিন রূপ দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসে। সেই মেয়েটির কথায় ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন ''একটু উত্তেজনা হলেই বাবার হাঁপানির টান দেখা দেয়। তখন তাঁকে ওষুধ দাওরে, ঘুম পাড়াওরে। মেয়ে হয়ে জন্মানোর কম ঝকমারি, ছেলেটা কাদা হয়েছিল। সেই অবস্থাতেই কোন রকমের দুটো নাকেমুখে গুঁজে দৌড়ে এসে ওকে ট্রেন ধরতে হয়েছে। মা হেঁসেল ঠেলেন, ঘরসংসার সামলান তাই রক্ষে। মা-রও কী খোঁয়ারের জীবন। ভবকা ছেলেটা ভিড়ে ট্রেন থেকে পড়ে চাকার তলায় চলে গেল। দাদা তখন সবে ফুড কর্পোরেশনের গুদামে একটা চাকরিতে ঢুকেছে। পেটে একটা ছেলে ধরিয়ে দিয়ে স্বামী অন্য একজনের বউ নিয়ে কেটে পড়ায় সেই থেকেই মেয়ে তার বাপের বাড়ির গলগ্রহ। দাদা মারা যাওয়ার পর নার্সের ট্রেনিং নিয়ে নিজের চেষ্টাতেই হাসপাতালের এই বাড়ির সংসার এখন ওর রোজগারেই চলছে। মেয়েই এখন বুড়ো বাপ-মার ভরসা।'' কেমলি ছাড়ে না/ কমরেড কথা কও)। যে নার্স মেয়েটি তার শ্রম দিয়ে ও হাসিমুখে সেবা দিয়ে অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে তুলছে ; তার হাসিমুখের আড়ালে যে নিদারুণ বেদনা নিমজ্জিত তা শিল্পে তুলে ধরে একজন দায়বদ্ধ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

পরবর্তী পরিচ্ছেদ 'পিসে মশাইয়ের ডায়েরি'। এই পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক ডায়েরী লেখায় পারিবারিক মানুষজনের আচরণের ভালো দিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। লেখকের পরিবারের পিসেমশাই ডায়েরী লিখে রাখার জন্য বাড়ির লোকেরা নিজেদের আচার আচরণ সম্পর্কে সচেতন থাকার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। অনেকবার পুলিশ হানা দিয়ে ভাইসাহেবের বাড়িতে ডায়েরী ধরনের কিছু তথ্য আবিষ্কার করতে চেয়ে কেবল ছিটকাপড়ের একটা খোলের মধ্যে জোড়ানো এস্রাজটিই দেখতে পেয়েছিল। লেখক এ সম্পর্কে লেখেন ''বাইরের লোক বলতে, পুলিশ যে কবার খানাতল্লাশিতে

এসেছে, তারাই শুধু ওটা খুলে দেখেছে। বিপ্লবীর ঘরে- বোমা নয়, পিস্তল নয়- চিমসে পড়া একটা এস্রাজ। দেখে ওদের খুব মজা লেগেছে''। (পিসেমশাইয়ের ডায়েরি/কমরেড, কথা কও)।

এরপরের পরিচ্ছেদ 'ডায়েরির খোলসে' এই পরিচ্ছেদে ভাইসাহেবের একটি ডায়েরীর কথা জানা যায়। সেই ডায়েরীতে ভাই সাহেবের কিশোর কবি সুকান্ত অনুকরণ করে কিছু পদ্য ধরনের লেখার চেষ্টা দেখা যায়। ভাইসাহেব সুকান্ত বলতে অজ্ঞান ছিলেন। এই পরিচ্ছেদে ভাইসাহেবের চরিত্রের আদলে কবি সুকান্তের প্রতি ঔপন্যাসিকের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। রেড এড কিত্তর হোস - এর যে বেডে সুকান্ত কে রাখা হয়েছিল ঠিক তার পাশের বেডে রেখে উপন্যাসে ভাইসাহেবকে চিকিৎসা করান লেখক। আবার একালের মানুষ হলে সুকান্তকে ক্ষয়রোগে হয়তো ইহলোক ত্যাগ করতে হতো না - এই আক্ষেপও প্রকাশ করেন আলোচ্য অংশে। ভাই সাহেবের প্রতি ঔপন্যাসিকের অধিক গুরুত্ব প্রকাশ করতে দেখি আলোচ্য পরিচ্ছেদে- ''কিছু কিছু ব্যাপারে তুমি যে ভয় পাও, ভাইসাহেব এটা তোমার চরিত্রের একটা ভাল দিক। যারা বীর, তাদের কোনো ভয়ডর থাকে না। একথা ঠিক নয়। তাদেরও ভয় থাকে। মাথা হেঁট হওয়ার ভয় সেই ভয়েই তারা সাহসী হয়।'' (ডায়েরির খোলসে/কমরেড কথা কত্ত) । এই পরিচ্ছেদে মাধবের মা চরিত্রটির কথা পাই আমরা। সেই ভাইসাহেবের করুণ অবস্থা দেখে হাসপাতালে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চোখের জল ফেলে।

এর পরের পরিচ্ছেদের শীর্ষনাম তিনির ঘরে দুই শহিদ। এই অধ্যায়ে মাধবের মা যে মৃতপ্রায় ভাইসাহেবের ঘরে এসেছে তার মধ্যে মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে মাধব ও কার বাবা অধরের শহীদ হওয়ার যোগসূত্র স্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। সে জন্য লেখকের জিজ্ঞাসা ''ওর যে অত ফুলে ফুলে কান্না , সে কি শুধু তোমারই জন্যে? মাধবের জন্যে! নাকি মাধবের বাবার জন্যে ?'' মাধব ও অধরের কথায় লেখক জানিয়েছেন ''মাধবের বাবা অধর ছিল বোস্টমের ঘরের ছেলে। গলায় তুলসির মালা নিয়েই অধর কমিউনিস্ট হয়েছিল। এখানকার চটকলে তাঁতঘরে কাজ করত। কোনরকম নেশাভাঙ করত না। কারো সাতে-পাঁচে থাকত না। ওর কাজ ছিল শুধু মিছিল মিটিঙে একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে ঝান্ডা বওয়া। শেষ পর্যন্ত সেটাই হল ওর কাল। খাদ্য আন্দোলনের সময়ে পুলিশের গুলিতে অধর মারা গেল। ঝান্ডা নিয়ে ও ছিল মিছিলের ঠিক সামনে। সেটা ছিল কংগ্রেসের আমল।'' (তিনের ঘরে দুই শহিদ কমরেড, কথা কও)। কংগ্রেসের আমলে পার্টির সংঘর্ষে কেবল লাল ঝান্ডা উড্ডীন রাখতে কত শত প্রাণ শহীদ হয়েছে তার শিল্পিত রূপ মাধবের বাবা অধর। তার হাতে ঝান্ডা না থাকলে সে হয়তো ছুটে পালিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারতো। কিন্তু পার্টির প্রতি দায়বদ্ধ অধর ঝান্ডা হাতে মিছিলের আগে থাকায় ও হাতের ঝান্ডা উঁচু রাখার চেষ্টায় শহীদ হয়ে যায় রাজনৈতিক সংঘর্ষে। সেই

অধরের প্রতি আন্তরিক বেদনা গভীর রেখায় প্রকাশ করেন ঔপন্যাসি। তিনি ভাইসাহেবের মর্মবেদনা প্রকাশ করতে লেখেন - ''শহিদ অধরের বডি স্তূপাকার ফুলে ঢেকে লরিতে করে এখানে আনা হয়েছিল। বোধহয় শরীরটা ফুলে যাওয়ার জন্য তার তুলসির মালাটা গলায় এঁটে বসে গিয়েছিল। তাই দেখে ভাইসাহেবের মনে মনে সে কী অশান্তি মালাটা ছিঁড়ে ফেলে দাও, ওর যে দম বন্ধ হয়ে যাবে। অধরকে যখন মাটি দেওয়া হয়, পার্টির বড় বড় নেতারা বজ্রমুষ্টি তুলে 'ভুলো মাৎ', 'ভুলো মাৎ', বলে তাকে অভিবাদন জানালেন। চাচাসাহেব তাদের পেছনে। তাঁর চোখ দিয়ে সমানে টপটপ করে জল পড়ছিল।'' (তিনের ঘরে দুই শহিদ/কমরেড, কথা কও)। পার্টি কর্মীর মৃত্যুতে কমরেড ভাইসাহেবের মর্মবেদনা অত্যন্ত নিখুঁত তুলির টানে নিজস্ব ভাষা শৈলীতে ছবি এঁকেছেন ঔপন্যাসিক। এখানে তাঁর শিল্পী সত্তার সঙ্গে অন্বিত হয়েছে রাজনৈতিক সত্ত্বা। কমরেড কথা কও' উপন্যাসের ষোড়শ সংখ্যক পরিচ্ছেদের শীর্ষনাম 'যেদিন গুরুবার'। এই পরিচ্ছেদে অধর এর বাড়ির সঙ্গে ভাইসাহেবের সম্পর্কের একটি সূত্র নির্ধারণ করেছেন ঔপন্যাসিক। অধর প্রতি বৃহস্পতিবার নিয়মিত লক্ষ্মীর পাঁচালী পাট করত। সেই পাঁচালীতে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে পাঠ শেষে পেট ভর্তি নিনি খেয়ে বাড়িতে ফিরত ভাইসাহেব। অধর মারা যাবার পরও দু' দিন মাধবের বাড়িতে খায় ভাইসাহেব। কিন্তু মাধবের বাবা না থাকায় কোথায় যেন একটা সুর কেটে যাওয়ার ভাব জেগেছিল ভাইসাহেবের। থান পরে ছোট করে ছাঁটা চুলে কেমন যেন দেখাচ্ছিল মাধবের মাকে। অধর মারা যাবার পর তার বাড়িতে দু' দিন পুরোহিতের মুখে পাঁচালী শোনে ভাইসাহেব। পুরোহিত লক্ষ্মীর ব্রত পালনের ফলে জনৈক রমণীর সমস্ত দুঃখ ও দীনতা মোচনের পর পুত্রসন্তান লাভ, নীরোগ শরীর অপার ঐশ্বর্য লাভের কথা বলেন।এই সুসমঞ্জস্য প্রসঙ্গে নারীদের পাঁচালী ও ব্রত কথা পালনের বিষয়টি উপন্যাসে অসাধারণ শিল্প দক্ষতায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন উপন্যাসিক।

এই উপন্যাসের সপ্তদশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ হল 'এক দুই তিন। ' এই পরিচ্ছেদে অধর ও মাধবকে দিয়ে দুই প্রজন্মের জাতীয় রাজনীতির দুটি কালকে নির্দেশ করেছেন লেখক। সেই দুই সময়কে নির্দেশ করে লেখক বর্ণনাত্মক ভঙ্গীতে লেখেন ''বোস্টমের ঘরের ছেলে অধর কমিউনিস্ট হয়েছিল ভালবাসার টানে। 'সবার উপর মানুষ সত্য' ছিল তার রক্তে। অধর যখন খুন হয়, সরকারে তখন কংগ্রেস। তার ছেলে মাধব হয়ে গেল নকশাল। পাইপগান হাতে নিয়ে সে খুন হয়। তার মধ্যে ছিল শুধু ক্রোধ আর ঘৃণা। রাজ্যে তখন সরকারে কমিউনিস্টরা।'' (এক দুই তিন কমরেড, কথা কও)। এই শহীদ পরিবারে আরো একটি প্রজন্মের ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক, এখানে তাঁর আশাবাদ ও জীবন সংগ্রামে মানুষকে শেষ পর্যন্ত মহৎ জীবনদর্শন উপলব্ধি করি এখানে। অধর ও পরে মাধব মারা

গেলে, মাধবের এক ছেলের হদিশ পাই আমরা। মাধব মারা যাবার পর তার বউ ছেলে বস্তি ছেড়ে উঠে গিয়েছে রাস্তার ধারের একটি ঝুপড়িতে।

এর পরবর্তী অষ্টাদশ সংখ্যক পরিচ্ছেদের শীর্ষনাম 'আলমনামা'। এই পরিচ্ছেদের একেবারে শুরুতে আলমের ফেস্টুন ও পোষ্টার হাতে সদলবলে ইলেকশনের প্রচারে বেরোনোর ছবি দেখি আমরা। কিন্তু লেখকের জিজ্ঞাসা আলমের দায়িত্বে এই এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও আলম এই এলাকায় কেন।? পার্টিকর্মী ভাইসাহেব বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ''আসলে কোনো একটা ছুতো বার করেছে হাসপাতালের সামনে দিয়ে যাওয়া। যেতে যেতে কেবলি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে। ওর মুখে একটা ছটফটে ভাব। আগ বাড়িয়ে ছুটে এসে তোমাকে একটু দেখে যাবে কিংবা নিদেনপক্ষে একটা খবর নিয়ে যাবে, তার উপায় নেই। পার্টির বারণ আছে। ভাইসাহেব যে দলছুট। বলিহারি যুক্তি ওদের। যারা ছেড়ে গেল তারা দলছুট নয়, যে থেকে গেল সে দলছুট।'' (আলমনাম/কমরেড, কথা কও) এই পরিচ্ছেদে আমরা আলমের বাবা বদরু মিঞা চরিত্রের ধর্মীয় চেতনার মধ্যে লেখকের ধর্মসচেতন মানবিক চেতনার পরিচয় আমরা পাই। ধর্মীয় চেতনায় বদরা মিঞা পাপ পুণ্যের বিষয়টি পাড়ার মানুষকে মজলিশ বসিয়ে শোনায়। তিনি কোরান,হাদিস পাঠ করে তার সার কথা শোনান। সেখানে বলা হয় সব মানুষই আদমের সন্তান। তাই ''গোড়ায় ছিল সবাই এক । জাতের বালাই পরে এসেছে। মানুষ মাত্রই হল সোনা রুপোর খনি। যে অত্যাচার করে, পরলোকে তার জন্যে শুধু অন্ধকার। জোর করে কেউ যদি কারো জমি কেড়ে নেয়, কেয়ামতের দিন সেই জমির নিচের সাত পরত জমি তার গলায় হাঁসুলি করে বেঁধে দেওয়া হবে। অগাধ ধনে সুখ নেই। সুখ মানুষের মনে। পৃথিবীতে অতিথি হয়ে থাকো। কয়েদি হয়ে নয়।'' (আলমনামা/কমরেড, কথা কও)। এখানে মানুষের জীবনের মূল্যবোধ, পাপ বোধ ও পুণ্য চেতনা সম্পর্কে মানুষকে জনআলোড়ন সৃষ্টি করতে জাগরণের প্রয়াস রেখেছেন লেখক, ক্ষমতা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে, ক্ষমতার লোভে ভাই-ভাইকে আঘাত করে। যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের স্থান বেহেশতে হতে পারে না; তাদের স্থান জাহান্নমে।

'কমরেড, কথা কও' শীর্ষক উপন্যাসে উনিশতম পরিচ্ছেদ 'নজরদারি'। এই পরিচ্ছেদে রাজনীতিতে ক্ষমতাবান মানুষ ও সাধারণ মানুষের জীবনচর্যার বৈপরীত্য সাহিত্যের অঙ্গ করে তুলেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। একজন পার্টি কর্মী সারাজীবন নিজেকে পার্টির সেবায় নিযুক্ত করে গেছেন নিলোভ নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠার সঙ্গে। অথচ অসুস্থ অবস্থায় পার্টি তা অপ্রয়োজনীয় করে রেখেছে তার এই দুঃসময়ে। এমনকি সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সময়ে নানা কাজে সহযোগিতা করে এসেও আজ তেমন কারো টান দেখছেন না লেখক। অথচ সেই পার্টিকর্মী স্বার্থপর হয়ে কোনোভাবে এম এল এ, এম পি হতে পারলে

জীবনে কতটা করত তা নির্দেশ করেছেন লেখক। এখানে রয়েছে সাধারণ মানুষ জনসাধারণের ভোটেই নির্বাচিত হয়ে যতটা ভোগবাদী হয়ে ওঠে তার ছবি তুলে ধরেছেন লেখক ''তখন পেত রক্তের স্বাদ। দিল্লিতে বারলোবাড়ি, মায় অ্যাটেন্ডান্টেরও ফাস্ট ক্লাস টিকিট; ভ্রমর যেমন ফুলে ফুলে গিয়ে বসে, তেমনি আজ এখানে পার্টি, কাল সেখানে পার্টি, নানা রঙের নানা রসের দিন; সরকারি লোকেরা স্যার স্যার করবে; আজ এ কমিটিতে কাল সে কমিটিতে; তাছাড়া দুনিয়ার এক ষষ্ঠাংশেরও বেশি জায়গায় ইচ্ছেমত তীর্থদর্শন করে আসতে পারত। দলও তখন পাত্তা না দিয়ে পারত না।'' (নজরদারি/কমরেড, কথা কও)। পার্টি সামাজিক মানুষের জনজীবনে যে সামগ্রিক পরিবর্তন এসেছিল তা পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে ভাইসাহেবের শ্রমিক সংগঠনের প্রসঙ্গে উপন্যাসে প্রয়োগ করেছেন লেখক, যা উপন্যাস শিল্পের অঙ্গ হয়েও সামাজিক দলিল হয়ে ওঠে এখানে।

উপন্যাসের বাইশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ 'বাড়ানো হাতে' । এই পরিচ্ছেদে কোনো পরিবারের ছেলে মেয়েরা আবেগে পার্টির কাজে যুক্ত হওয়ার পর তাদের মাতা পিতার প্রতিক্রিয়া এবং সমকালের ছাত্র-যুব সমাজের পার্টিতে যোগদানের পর, তাদের জীবনযাত্রার শৈলীকে শিল্পিত রূপ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। সুমনের মায়ের সাধ ছিল ছেলে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে ফরেন সার্ভিসে উঁচু পদে চাকুরী করবে। খুব কম হলেও সে আই পি হবে। পার্টিতে যোগদান করার সংবাদ শুনে সুমনের মায়ের চোখ কপালে ওঠে যায়। অবশ্য তার বাবা এতে মনে মনে খুশী হয়। তার বাবার কথায় এক শ্রেণীর মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে এখানে। সুমনের বাবার কথা ''আড়ালে ওঁর স্ত্রীকে বোঝান। এখন পলিটিক্সের চেয়ে ভাল কেরিয়ার কী আছে? দেখছো না, যাদের কোনো গুণ নেই, শুধু লোক চবিয়ে খায় - তারাই এখন পতিতপাবন মিনিস্টার। মনে মনে শালা বললেও মুখে কিন্তু স্যার স্যার বলছি।'' (বাড়ানো হাতে/কমরেড, কথা কও)। সুমন নাগরিক জীবনের আদব কায়দা থেকে বেরিয়ে আসে । সে বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, দেঁতো হাসি দারোয়ান- আর্দালি, মাসি-পিসি, আদব-কায়দা মাপা কথা কপট ভদ্রতার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসে। ফলে ''সুমন কোথায় লীডার হবে, তা না ও হয়ে গেল বস্তির লোকদের ইয়ার দোস্ত। ওদের কাঁধে হাত দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওদের মুখ থেকে এঁটো সিগারেট টেনে নিয়ে খায়। ওদের কাছ থেকে বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি খিস্তি শিখেছে। সেই সঙ্গে ফচ্‌কে ছোড়াদের সঙ্গে কোমর দুলিয়ে হিন্দি সিনেমার গান গায়। তারপর শহরে তার সেই নীরক্ত পান্ডুর কৃত্রিমতার জগতে ফিরে গিয়ে সুমন বোমা ফাটায়। (বাড়ানো হাতে/কমরেড কথা কও)। সুমন তার বাবার ইচ্ছেতে অধঃপতনের জীবন থেকে সরে এসে স্টেটস এ চলে যায়। যাওয়ার পর সে পার্টি অফিসে একটি দেওয়াল ঘড়ি পাঠিয়ে দেয়। সেটা পার্টি অফিসে টাঙানো থাকে। এর ঠিক তিনমাস পর গাড়ি দুর্ঘটনায় সুমনের অকাল

মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর দু-তিন মাসের মধ্যে জয়ন্তীও এক বিজ্ঞাপন কোম্পানীতে মোটা মাইনের কাজ নিয়ে মুম্বাই চলে যায়। সেখানকার ইন্টারভিউতে সে শ্রমিক ইউনিয়নের জনসংযোগের অভিজ্ঞতার কথা বলে। তবে ''মেয়েদের মুখে যেসব কথা শুনে ওর কান লাল হয়ে যেত, রাস্তায় দু-একদিন মাতালের পাল্লায় পড়ে ওকে যে বেইজ্জত হতে হয়েছিল, মেয়ে মজুরদের ওপর কারখানা কর্তৃপক্ষ আর ঠিকাদাররা যে কী অমানুষিক অত্যাচর চালায় - সে-সব কথা জয়ন্তী একেবারেই বলেনি।'' (বড়ানো হাতে/কমরেড কথা কও) কলকারখানা, মালিক ঠিকাদারদের কাছে নারীর অসহায়তার ও অমানবিক অত্যাচারের করুণ ছবি এঁকে লেখক নারীর প্রতি দায়বদ্ধ সমাজ সচেতন শিল্পীসত্তার পরিচয় দিয়েছেন এখানে।

উপন্যাসের তেইশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ 'চাওয়া পাওয়া'। জনসংযোগে মানুষ যে জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তাতে জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার সামর্থ্য তৈরী হয়। এই অভিজ্ঞতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ছিলেন লেখক জয়ন্তী চরিত্রে। জয়ন্তী ওর দাদার এক বন্ধুর সঙ্গে জীবনের প্রথম প্রেমে ব্যর্থ হয়ে একসময় বাচাঁর ইচ্ছেটাকেই হারিয়ে ফেলেছিল। প্রথম থেকেই সে ছিল নরম প্রকৃতির মানুষ কেবল স্বপ্ন দিয়েই সে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতো নিজের মধ্যেই। তার সাধারণ জীবনে একটা সংসার নিজের সাধের সন্তান এই স্বপ্নই এতদিন দেখে এসেছিল জয়ন্তী। কিন্তু প্রথম প্রেমে ব্যর্থ এবং দ্বিতীয় বারে মতা সুমনের অকাল মৃতু তার স্বপ্ন কাগজের নৌকার মতো ভেসে যায়। সেই স্বপ্নভঙ্গের জীবনে জয়ন্তী জনসংযোগে বাঁচার সার্থকতা খুঁজে পায়। সে রাজনীতিতে ডুব দিয়ে জনসংগঠনের সংযোগের কথায় বলে ''নইলে আমি কি ভাইসাহেবের মত মানুষের নাগাল পেতাম? কিংবা বস্তির সেই মানুষগুলোর কাছে যাওয়ার মত সাহস হত? না গেলে মানুষের ওপর হারানো বিশ্বাস আমি ফিরে পেতাম?'' (চাওয়া/পাওয়া /কমরেড, কথা কও)।

আলোচ্য উপন্যাসের চব্বিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদের শীর্ষনাম। যা নয় তাই এই পরিচ্ছেদে নারীর ঈর্ষা রুক্মিনী চরিত্রে দেখিয়েছেন লেখক। সেই সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সমকালের সামাজিক অবস্থান ও মতাদর্শের পার্থক্য তুলে ধরেছেন লেখক। ভাইসাহেব একদিন বাজারের রাস্তা দিয়ে জয়ন্তীর ঘাড়ে একটা হাত রেখে পাশাপাশি হাঁটছিল। রুক্মিনী দূর থেকে দুজনকে এক সঙ্গে দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে ''তাতেই রুক্মিনীর চোখ দিয়ে যেন আগুন ছিটকে বেরিয়ে এল। দাঁড়িয়ে পড়ে নাক দিয়ে একটা হু শব্দ করে হঠাৎ পেছন ফিরে ও যেন গট গট করে হাঁটাদিল যে রাস্তার লোকে অবাক। ঠিক যে রকমটা সিনেমা থিয়েটারে দেখা যায়।'' (যা না তাই/কমরেড, কথা কও)। এখানে লেখক রাজনৈতিক সত্তা নিয়ে শিল্প নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে নারী চরিত্রের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে চরিত্রের

স্বাভাবিকত্ব বজায় রেখে তাকে রক্ত মাংসের মানুষের জীবন্ত চরিত্রের রূপদান । লেখক এই পরিচ্ছেদে কমিউনিস্ট নেতা কমরেড ঘোষালের ভাবনায় সমকালীন পার্টির অভিমুখকে শিল্পের অঙ্গ করে তুলেছেন। সেই কথায় লেখক বলেন - '' আর তামাদের দিল্লির সেই বড় নেতা গো! কমরেড ঘোষাল। সোভিয়েট পার্টির বিশতম কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে পার্টিরই কাগজে নাকি লিখেছিলেন রেড স্কোয়ারের চত্বর থেকে কাঁচের বাক্সবন্দী স্তালিনকে তুলে নিয়ে গিয়ে যে কবর দেওয়া হয়েছে, সেটা হয়েছে খুবই উচিত কাজ। লেনিনকেও ওখান থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত। এতো এক রকমের মূর্তিপুজো। কমিউনিস্টরা কেন তার প্রশ্রয় দেবে সেই সঙ্গে একথাও নাকি ঘোষাল লিখেছেন যে, সোভিয়েট অন্য অনেক দিকে এগিয়েছে, কিন্তু একটা দিকে এখনও পিছিয়ে আছে সেটা হল গণতন্ত্র।'' (যা নয় তাই/কমরেড, কথা কও)। সেকালে পার্টির একটা নেতৃস্থানীয় কর্মীদল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে কংগ্রেসের সঙ্গে আতাত করার প্রয়াস নিয়েছিল। সেই দিকটিকেও লেখক উপন্যাসের বিষয় করে তুলেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির এই অভিমুখ দেখা গিয়েছিল উনিশ' আটচল্লিশে। এই মতাদর্শের দিক থেকে পার্টি কর্মীরা সেকালে বিভাজিত হয়ে পড়ে '' আমাদের একটু সাবধান হতে হবে, কমরেড। সেনাপতি মশাই দল পাকিয়ে পার্টির হাল ধরার চেষ্টা করছে। শুনে এলাম ভাইসাহেব ওর সাগরেদ। । ওরা এক জেলার লোক। একবার যদি ওরা হাল ধরতে পারে, পার্টির নৌকোটাকে ওরা ঠিক কংগ্রেসের ঘাটে ভেড়াবে।'' (যা নয় তাই/কমরেড, কথা কও)।

আলোচ্য উপন্যাসের পঁচিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদের নাম 'আশ্বিনের ঝড়'। স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক প্রেক্ষিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেকালে বাংলার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছিল একটা প্রচন্ড ঝড়ের বেগ সেকালে বাংলার শাসকদল কংগ্রেস কে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষণা করেছিল। ফলে সেকালে চলছিল একটা রাজনৈতিক সংঘাত। সেই সময়ে জীবন্ত অভিজ্ঞতার ছাপ পাই আমরা আলোচ্য উপন্যাসে। ভাইসাহেবদের মতো কমিউনিস্ট মতাদর্শের মানুষ তখন আশ্রয় নিয়েছিলেন আন্ডারগ্রাউন্ডে। আলোচ্য পরিচ্ছেদের শুরুতেই লেখক লিখেছেন গোড়ার দিকে ধরা পড়েছিলো। তখন কংগ্রেসের আমল। তবে বেশি দিন জেলে থাকতে হয়নি। ছাড়া পাওয়ার পরই চলে গেল আন্ডার গ্রাউন্ডে।'' (আশ্বিনের ঝড়/ কমরেড, কথা কও)। ভাইসাহেবদের কাছে দেশের নেতা নেহেরু সর্ম্পকে নেতিবাদী মানসপটের প্রতিক্রিয়া সমকালের কমিউনিস্টদের সামগ্রিক বোধের পরিচয় আমরা পাই। সেকালে পার্টিকর্মীরা গোপনে আন্ডার গ্রাউন্ডে থেকে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়েছিল। এই রাজনৈতিক ও সমাজবাস্তবতাকে সাহিত্যে রূপদান করেছিলেন সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

এই উপন্যাসের ছাব্বিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদের শীর্ষনাম 'নটে গাছ' । কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের সেকালে অনেকেই উগ্রয়ামপ্রন্থা ও সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক ক্রিয়া মেতে উঠেছিল। এই রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদকে ভাইসাহেব এবং স্বয়ং লেখক কেউই সমর্থন করতেন না। সেকালে কলকাতার ময়দানের সভায় নেহেরুকে হত্যার চেষ্টা করে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল কয়েকটি কিশোর। যৌবনের বাঁধনহারা আবেগে তারা সেই সর্বনাশা পথে পা রেখেছিল। কিন্তু সেই পন্থাকে অহেতুক ও অযৌক্তিক বলে মনে করেছিলেন সাহিত্যিক। এই ঘটনার বর্ণনায় তিনি লিখেছেন ''এ পর্যন্ত ওরা সবাই একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। সমাজতন্ত্রের আদর্শ বুকে নিয়ে শাহীদ হতে যাচ্ছে, এই রকমের একটা ভাবনা ওদের নেশাগ্রস্ত করে রেখেছিল। রেশনের থলি হাত থেকে পড়ে যেতেই ওদের চট্‌কা ভেঙে যায়। এতক্ষণ পাখির চোখ ছাড়া আর কিছুই ওরা দেখতে পচ্ছিল না। কানের মধ্যে শুধু রাবণের জ্বলার আওয়াজ। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে ময়দান জুড়ে বিশাল জনসমুদ্র লোকে চিৎকার করে থেকে থেকে নেহেরুর জয়ধ্বনি দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের হাত পা হিম হয়ে আছে। ভয়ে বা আতঙ্কে, নয় ছোট ছেলে মেলায় হারিয়ে গেলে তার যে দশা হয়, ওদেরও তখন সেই দশা বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ একা (নটে গাছ/কমরেড, কথা কও)। ছোট ছোট ছেলেদের প্রচন্ড ভাবাবেগ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে লেখক ভয়ঙ্কর স্খলন বলে মনে করে ছিলেন লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় আলোচ্য পরিচ্ছেদে লেখক দেশের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি এবং সমকালকে সাহিত্যের বিষয় করে তুলেছেন।

এই উপন্যাসের সাতাশ সংখ্যক পরিচ্ছেদের শীর্ষনাম পার্টির ঘরবর। এই শীষনাম প্রদানের ও নির্বাচনের কালে লেখকের রাজনৈতিক অভিমুখ ও রাজনৈতিক চেতনা ক্রিয়াশীল ছিল। পার্টিতে জনসাধারণের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে লেখকের পূর্বাপর বিশ্লেষণ ''পার্টি তখন ছোট্ট গন্ডি ছাড়িয়ে সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে কমবয়সীরা দলে দলে আসছে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প নিয়ে। পুরনো আমলের স্বদেশীদের মতন তারা কি সব গৃহত্যাগী ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবে? আর তা না পেরে শেষ পর্যন্ত সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সংসারের গর্তে ঢুকে যাবে।'' (পার্টির ঘরবর /কমরেড, কথা কও)। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেন যে, কমিউনিস্ট হওয়া কোনো সাময়িক বারব্রত নয়। যে বিষয় হল সারা জীবনের বারমেসে সাধনার বিষয়। কমিউনিস্টরা বিয়ে থা করে স্থিতু হবে কিন্তু পুত্র পরিবার নিয়ে তারা গড়ে তুলবে রেড ফ্যামিলি। এমনকি পার্টির গায়ে যাতে কোনো কাদা না লাগে সেজন্য কমিউনিষ্টদের জীবনে যে কোনো ত্যাগ করার মতো নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য বড় কষ্ট হলেও ভাইসাহেবকে যে কোনো স্খলন বাঁচিয়ে পথ চলতে

য়েছিল। এমনকি পার্টির মহিলা সহকর্মীদের প্রতিও ভাইসাহেব কখনো ভিন্ন নজরে দেখতো না। রুক্মিনীর দিকেও ভাইসাহেব তেমনভাবে তাকায়নি। মহিলাদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ কখনো তার হৃদয়ে তেমন দাগও কাটতে পারে নি। অথচ সেই রুক্মিনীর ব্যক্তিজীবনে ছিল অভাবের মরুভূমি। লেখকের কথায় - '' ও ছিল পাহাড়ি মেয়ে। বাপ মরা অনাথা। চটকলের এক আধ-বুড়ো দারোয়ান কালীঘাটে মালাবদল করে ওকে বিয়ে করে আনে। লোকটা খারাপ ছিল না। তার একমাত্র ইচ্ছে ছিল রুক্মিনী যেন ওকে একটা ছেলে দেয়। জগতে সবার সব ইচ্ছে তো পূরণ হয় না। ওদের বেলাতেও তা হয় নি রুক্মিনী নিজেও কম চেষ্টা করেনি। পীরের থানে গিয়ে ঢেলা বেঁধে এসেছে, মা কালীর কাছে মানত করেছে। তাতেও ওর পেটে ছেলে আসেনি। বীজ, না ক্ষেত্র দোষটা যে কার কেউই তা ধরতে পারেনি, তার একটাই ফল হয়। দিন দিন দারোয়ানের খাওয়া মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ফলে, ও যখন লিভার পচে মারা গেল শরীরটাকে পুঁজি করে রুক্মিনীর তখন লাইনে এসে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় রইল না। (পার্টির ঘরবর/কমরেড, কথা কও)। রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে অত্যন্ত স্পর্শদাতর সমাজ সচেতন শিল্পীমনে লেখকের সমাজের হতদরিদ্র অসহায় যৌনকর্মীদের ব্যক্তি জীবনের করুণ কাহিনী এখানে নাড়া দিয়েছিল। সেই দায়বদ্ধ সমাজ সচেতন শিল্পীর অনুভূতি এখানে উপলব্ধি করি আমরা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আটাশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ হল - (এক নৌকোয় কমরেড কথা কও)। এই উপন্যাসে ভারতের স্বদেশী আন্দোলনের কালের সঙ্গে স্বাধীনতা উত্তর কালের সমাজ পরিবর্তনের রূপরেখার প্রকৃতি নির্ণয় লেখকের শিল্পীসত্তায় ক্রিয়াশীল ছিল। সেই প্রকৃতি নির্ণয়ে লেখক ভাইসাহেবের কথায় বলেন - ''তোমাদের স্বদেশী জমানার সঙ্গে এ-জমানার যে আকাশপাতাল তফাৎ, সেটা তখন আস্তে আস্তে তোমার মালুম হচ্ছে।বাইরে পা দেওয়া ইস্তক আজ খাদ্য কমিটি, কাল বস্ত্র কমিটি, কার আছে কার নেই সব খুঁটিয়ে জেনে, সকলের হাঁড়ির খবর নিয়ে লিস্টি আর লিস্টি।একদিন যে এসব করতে হবে সেকথা তোমাদের স্বদেশী যুগে কি কখনও ভাবতে পেরেছিলে?তখন চাদরের মধ্যে একটা পিস্তল নিলেই সারা শরীরে রোমাঞ্চ জাগত। দু-মাস জেলের ভাত খেয়ে আসতে পারলেই পুরসভার চাকরিতে তখন পদোন্নতি হত, মাইনে বাড়ত। পরতলার ডাকসাইটে নেতা, নিচের তলার অসম্বন্ধ জনতা। মাঝে মধ্যে স্বাধীনতার জন্যে লম্ফঝম্প।

এ-জমানায় জাতীয় মুক্তি আর জনমুক্তি পিঠোপিঠি সম্পর্কে এল। স্বাধীনতার পর সংগঠনের খোলে জনশক্তিকে পুরে শুরু হল গদিদখলের লড়াই।'' (এক নৌকোয়/কমরেড, কথা কও)। গতিময় জীবনে লেখক প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্বাধীনতার স্বদেশী আন্দোলনের জাতীয় জীবনকে। স্বাধীনতার উত্তর কালেও ভারতীয় জাতীয় জীবনের প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে এসেছিল তুলনা। লেখক তাঁর বাস্তব

অভিজ্ঞতায় জীবনপণ লড়াই করে ভারতীয়ের নিজের হাতের পাসন ক্ষমতা দখলের পর সমষ্টি মানুষের আশাভঙ্গে মর্মান্তিক আঘাত প্রাপ্ত। স্বাধীনতার এই শোচনীয় রূপ তাঁর সাহিত্যে অসাধারণ মূল্যবান হয়ে উঠেছে। মানুষের ভয় ও জীবনকে উপেক্ষা করে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য সেটা ছিল না। এই রাজনৈতিক চেতনায় লেখকের মানসপটে উঠে এসেছিল আন্তর্জাতিক বোধে ভারতের সম্বন্ধের প্রকৃতি। সেকালে সোভিয়েট রাষ্ট্রবিপ্লব থেকে সরে এসে শান্তি প্রতিষ্ঠায় লক্ষ্য দিয়েছিল। আর চীন সেই বুর্জোয়াদের সরিয়ে শ্রমিকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফাঁকি পূরণ করতে বসেছিল। সেই জাতীয়তার সঙ্গে আন্তজার্তিক বোধে পৌঁছে লেখক বলেন - '' আটচল্লিশের সঙ্গে ষাট বাষট্টির অনেক ফারাক। তখন ছিল লড়াইয়ের চেয়ে পাঁয়তারা বেশি। খাজনার চেয়ে বেশি বাজনা। ওদিকে দেশে কমিউনিস্ট মেরে হাতের সুখ করে নিয়ে নেহরুর শখ গেল চীনকে এক হাত নেওয়ার। নেহরুর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিল চীন। অত যে পেয়ারের সোভিয়েট, সে কিন্তু কড়ে আঙুলটিও নাড়াল না। শুধু বলল, - ভারত আমার বন্ধু, চীন আমার ভাই।'' (এক নৌকোয়/ কমরেড, কথা কও)।

আলোচ্য উপন্যাসের উনত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ হল 'ভাঙার গান'। আলোচ্য পরিচ্ছেদে যে 'ভাঙনের' কথা বলা হয়েছে তা হল সমকালীন কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙনের করুণ ছবি। পার্টিকে আপ্রাণ ভালবেসে যে মানুষগুলোকে সঙ্গে নিয়ে চলেছিলেন ভাইসাহেব ক্রমশঃ পেটের তাগিদে ও বাঁচার জন্যে তারা পার্টি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। গিরিধারী ভাইসাহেবের কাছে পরামর্শ নিতে আসে। সেই সময়কার ভাইসাহেবের মানসিক টানাপোড়েন ও ভাঙনের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন পার্টির তৎপরতার জীবন্ত ছবি এঁকেছেন লেখক এখানে ''বেশ কিছুদিন ধরেই কংগ্রেসীরা টোপ ফেলবার জন্যে ওর আশপাশে ছোঁক ছোঁক করছিল। পার্টি ভাঙার পর ওর যে হাড়ির হাল হয়েছে, সেটা ওদের কানে এসেছিল। গোড়ায় গিরিধারী একেবারেই ওদের আমল দেয়নি। কিন্তু মানুষের কাহিল শরীরে যেমন রোগ প্রতিরোধ করা কঠিন হয়, তেমনি বেশিদিন অভুক্ত থাকলে মনের জোরও কমে যায়। ওরা বলেছে ওদের ট্রেড ইউনিয়নের হয়ে কাজ করলে মাসে তিনশো টাকা করে দেবে। সেই সঙ্গে এখনই কিছু আগাম।

শুনে তুমি পাথরের মত বসে রইলে। কেউ যেন তোমার ডান হাতটা কেটে নিতে চাইছে।'' (ভাঙার গান/কমরেড, কথা কও)।

'কমরেড কথা কও'' উপন্যাসের ত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদের শীর্ষনাম - 'কালা মেঘ'। গিরিধারীকে দেখা যায় এই পরিচ্ছেদে, সে ভাইসাহেবকেও তাদের দলের বিরুদ্ধে সভায় গালমন্দ করার অর্থ উপলব্ধি করে। একসময়ের খুব কাছের জনকেও যে ভিন্ন শিবিরে জায়গা করে নিতে হবে। তাই লেখক বলেন ''তুমি বুঝেছিলে ব্যাপারটা তা নয়। ও এটা করছে নতুন পার্টিতে বিশ্বাস অর্জনের

জন্যে। শুধু পার্টির কাছে নয়, নিজের কাছেও ওকে আস্থাভাজন হতে হবে। ওকে চাল ফেরত নিতে হয়েছে স্বেচ্ছায় মাত হবে বলে।'' (কালা মেঘ/কমরেড, কথা কও)। লেখক ভাইসাহেবকে উদ্দেশ্য করে কথোপকথনের রীতিতে আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস করলেও অনেকটা বর্ণনার ঢঙে কথাগুলি বিবৃত করেছেন। এই পরিচ্ছেদে ভাই ভাইসাহেবের সঙ্কটপূর্ণ স্থিতিশীল শারীরিক অবস্থার কথা আমরা জানতে পারি ''ভাইসাহেব আজ নিয়ে এই পাঁচ দিন। তোমার আধ বোজা চোখে শূন্য দৃষ্টি। মুখে মাছি বসলেও তোমার কোনো সাড়া নেই।'' (কালা মেঘ/কমরেড, কথা কও)। কারা একজন বৃদ্ধ মানুষের মাথায় বাঁশের বাড়ি মেরেছে তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। কেননা প্রত্যক্ষদর্শী নেই। কেবল বিরোধী শিবির বলে আলমের দলের বিরুদ্ধে দোষ চাপানো হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে পুলিশ প্রশাসনের বাস্তবসত্যও এখানে তুলে ধরেছেন লেখক - ''পুলিশ কী করবে? এমনিতেই নকশালদের হামলায় তাদের মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা। তাছাড়া ওদের হয়েছে এখন উভয়সঙ্কট। কোন দল এসে মাথায় বসবে, তার ঠিক নেই। পারতপক্ষে ওরা এখন কাউকেই খাঁটাবে না।'' (কালা মেঘে/কমরেড, কথা কও)।

আলোচ্য উপন্যাসের একত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ 'অনির্বচণীয়'। আলোচ্য অধ্যায়ে মৃত্যু ভাবনা এবং আত্মা লেখকের উপলব্ধিতে প্রাধান্য পেয়েছিল। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব ই নিয়ে নানা মুনির নানা মত প্রচলিত। লেখক মনে করেন জীবনরথের মালিক হল জীবের আত্মা এবং রথ তার শরীর। মনের লাগাম হাতে নিয়ে বিবেকবুদ্ধি সেই রথ চালিয়ে যায়। লেখকের এই পরিচ্ছেদে পৌরাণিক ভাবনার পরিচয় আমরা পাই। জীবনের ভাবনার সঙ্গে পৌরাণিক চেতনার মেলবন্ধন হয়ে লেখকের শিল্পীসত্তাকে এই পরিচ্ছেদে নাড়া দিয়েছিল। এই পরিচ্ছেদে স্বাভাবিকভাবে এসেছে দেবযানী, কচ, নচিকেতা ও যমরাজের বিভিন্ন ছোট ছোট কথা ও কাহিনী। এখানে প্রসঙ্গক্রমে আসে গীতা ও কোরাণ পাঠের উপলব্ধি। এখানে আমরা দেখি ভারতীয় অধ্যাত্ম চেতনা যেখানে বিশ্বাস করা হয়দেহ ত্যাগ করেও আত্মা বেঁচে থাকে কিংবা মুক্ত আত্মা দেহান্তরে যায়। সেই ভাবনার সঙ্গে বিজ্ঞান চেতনায় মিশিয়ে লেখক বলেন এমন এক শ্রেণীর জীবের কথা যেগুলি আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না - তাদের অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায়। যাদের বলা হয় রেখার অ্যানিম্যাল কিউল। এরা জলে থাকে। যতক্ষণ জলে থাকে ততক্ষণ দিব্যি টগবগে চনমনে হয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু জল শুকিয়ে গেলে ধুলিকণার আকার নেয়। মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর সেই কীটানুকে জলে রাখলে দেখা যায় যে এরা আগের মতোই নড়েচড়ে ওঠে। সেখানে লেখকের জিজ্ঞাসা সেটা ''মৃত্যু? না জীবন? নাকি পুনর্জীবন? জন্মান্তর না দেহান্তর?'' (অনীর্বচণীয়/কমরেড, কথা কও)। লেখকের জীবন-মৃত্যু ভাবনা

এসেছিল ভাইসাহেবের সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায়। ভাইসাহেবের কথা রাজনৈতিক উপন্যাসে খুবই প্রাসঙ্গিক ও সাযুস্যপূর্ণ ভাবে এসেছে। লেখকের জীবন ভাবনা মৃত্যু চেতনা শরীর ও আত্মার অস্তিত্ব অস্তিত্বের চেতনা।

আলোচ্য উপন্যাসের বত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ 'উপোসী মন'। পেটের তাগিদে বাঁচার সংগ্রামে গিরিধারী শিবির বদল করেছিল। এই পরিচ্ছেদে রাজনৈতিক সত্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামাজিক বিভিন্ন সেবামূলক কাজের ও মূল্যবোধের সঙ্গে অন্বিষ্ট শিল্পীসত্তা। উপন্যাসে এসেছে সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম পদক্ষেপ নিরক্ষরদের লিখতে পড়তে শেখানোর কথা। উপন্যাসের সুমনের মতো লেখকের অভীষ্ট ভারতীয়ের জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়াই এবং অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সামাজিক লড়াই। সমাজিক বিভিন্ন কুসংস্কার ও ব্যাধির বৈচিত্র ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছে আলোচ্য পরিচ্ছেদে কালিপূজো শীতলাপুজোর ঠেলায় এখন রাস্তা হাঁটা দায়। নতুন উপসর্গ জুটেছে সন্তোষী মা।যে-পুকুরে লোকে স্নান করছে কাপড় কাচছে সেই জলেই রান্না করছে খাচ্ছেও সেই জল। লড়াই করে পাওয়া হকের পয়সা ঠকজুয়াচোর শুঁড়িরাঁড়ী কাবলিওয়ালা আর মোল্লাপুরুতে লুটে নিচ্ছে।

মেয়েগুলোকে বলির পাঁঠার মত তৈরী করা হয় যাতে বালিকাবধূ, বালবিধবা বা স্বামী পরিত্যক্ত মা হয়ে তারা মায়ের ভোগে লাগে।'' (উপোসী মন/কমরেড, কথা কও)। আলোচ্য উপন্যাসের তেত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদ 'কালো নামাবলী'। আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ভাইসাহেবের মৃত্যু আসন্ন। খুব স্বাভাবিকভাবে এই পরিচ্ছেদে এসেছে মৃত্যু ভাবনা। এসেছে শ্মশানের ছবি। শ্মশানের পোড়া কাঠকয়লার কচিকাঁচাদের হল বানানে লেখা লাইনবন্দী নাম। 'শহীদ অমুক, শহীদ অমুক। শহীদ তোমায় ভুলছি না ভুলব না।' লেখকের মূল্যায়ন যে, দলে দলে মানুষ ভুলছি না ভুলব না বলে চিৎকার করলেও কিন্তু ভুলেই যায়। রাজনৈতিক সংঘর্ষ, দলাদলি করে মানুষ মরে, হানাহানি করে কোনো নেতারই জীবনের কোথায় সার্থকতা একই দলের ও সমমনোভাবাপন্ন, একই মতের মানুষের শিবিরে বিভাজনে পার্টির সার্থকতা কোথায়। প্রসঙ্গত এসেছে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে অর্জুনের বিষাদ। যুদ্ধে আপন জনদের হত্যা করে জয়ী হবার কী সুখ। লেখকের কথায় ভাইসাহেবের সেই রথ চালকও নেই, রাথের সারথীও নেই আর অর্জুনের মতো বীরও সে নয়। তাই তার মৃত্যুই শ্রেয়। আলোচ্য পরিচ্ছেদের চৌত্রিশ সংখ্যক উপন্যাসের শীর্ষনাম 'অগ্নিহোত্রী'। এই পরিচ্ছেদে ভাইসাহেবের জেল খাটার সময়েপাশের সেলের আলুওয়ালা কিংবা দারুওয়ালা গোছের নামের এক পার্সির প্রসঙ্গ স্মৃতিচারণে এসেছে। সে ছিল খুব নিষ্ঠাবান পার্শি। নরম গলায় কথা বলত। দেশ থেকে নানা রকমের খাবার পার্সেলে এলে সবাইকে খেতে দিত। তার ধর্মগ্রন্থ জেন্দ্রআবেস্তার সঙ্গে ভাইসাহেবের ধর্মগ্রন্থ গীতার কথা

এসেছে আলোচ্য পরিচ্ছেদে এসেছে বেদের কথা, মহাভারতের কথা। জেন্দআবেস্তা ও ঋগ্বেদের দেবতা ও দানব সৃষ্টির আদিকথা। এই পরিচ্ছেদে এসেছে জীবনের কঠিন তম সত্যের কথা। এই প্রসঙ্গে এসেছে ভক্ত কবি হাফেজের কথা। তিনি বলেছিলেন - ''মনসুরের মতন আমাকে যদি শূলে চড়াও, আমার রক্তধারায় মাটিতে সমানে লেখা হবে - (আঘাতে আছেন সেই সত্য!) (অগ্নিহোত্রী/কমরেড কথা কও)। এই পরিচ্ছেদে আমরা দেখি লেখক ভাইসাহেবকে উদ্দেশ্য করে ঘ্যানর ঘ্যানর করছেন - ''অগ্নিহোত্রী/ কমরেড, কথা কও।'' কিন্তু ততক্ষণে ভাইসাহেব ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন।

'কমরেড, কথা কও' উপন্যাসের সর্বশেষ তথা পঁয়ত্রিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদের নাম কথা রইল। এই পরিচ্ছেদে আমরা দেখি গিরিধারী ও রুক্মিনী দুজনেই ভাইসাহেবের মৃত্যুতে নিরুদেশ হয়ে যায়। সর্বশেষ পরিচ্ছেদে ভাইসাহেব চরিত্রের সার্থকতা ঔপন্যাসিকের কথাতেই উঠে এসেছে। তাঁকে উদ্দেশ্য করে লেখক বলেন '' তোমার জীবন তাই বলে বৃথা যাবে না, ভাইসাহেব। মানুষের ভালর জন্যে নিজেকে যে কাজে তুমি সঁপে দিয়েছিলে, আগাছা, ইঁদুর আর পোকার হাত এড়িয়ে একদিন সেই মাঠের ফসল গোলায় উঠবে।'' (কথা রইল/কমরেড, কথা কও)। মৃত্যুতে ভাইসাহেব চরিত্রটি সর্বজনবিদিত নেতা হয়ে ওঠেন। সেখানে মতাদর্শ নির্বিশেষে ও পার্টির ভেদাভেদ ঘুঁচে সর্বশ্রেণীর মানুষ তাঁর শবযাত্রায় হাজির হয়। ভাই সাহেব জগতের ও মানুষের ছোট ছোট ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে এক মহান চরিত্র হয়ে ওঠেন। ভাইসাহেবের শবযাত্রার বর্ণনায় তুলনামূলক ভাবে লেখক বলেন - ''শিখন্ডী খাড়া করে অর্জুন ভীষ্মকে শরশয্যায় শুইয়ে দিলে কুরুক্ষেত্রে অনেকটা এই রকমের একটা সর্বদলীয় সমাবেশ ঘটেছিল।'' (কথা রইল/কমরেড, কথা কও)।

আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উচ্চ জীবন দর্শন, চরিত্র সৃজন, সমাজ ভাবনা জীবন চেতনা কাহিনী বিন্যাস, সমকাল চেতনাও রাজনৈতিক চেতনা সবমিলে তাঁর শিল্পভাবনার নিদর্শন আমরা পাই। তাঁর কমরেড, কথা কও' উপন্যাসে ভাইসাহেবকে উদ্দেশ্য করে তিনি নিজের জীবন অভিজ্ঞতারই নানা কথা বলেছেন। বিষয়ের সঙ্গে সাজুয্য রেখেই ঔপন্যাসিক তাঁর শব্দ চয়ন ও ভাষার প্রয়োগ করেছেন। বিষয়ের সঙ্গে ভাষায় উপযোগী ও জীবন্ত ও কথ্যরূপ পেয়েছে। তার এই বিশেষ রীতি ও ভাবনা সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন - ''তাঁর বক্তৃতা খুবই সোজা। কিন্তু তার লিখিত গদ্যের 'স্টাইল' রীতিমত জটিল। কারণ যে সব জটিল বিষয় নিয়ে তাঁকে ভাবিত হতে হয়েছে তার কোনো সরলীকৃত প্রকাশভঙ্গি হয় না।'' (বাংলা কবিতার কালান্তর সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় সংস্করব - ২০০৮-দেজ পবলিশিং, পৃঃ ২২৬-২২৭) ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কাব্য-উপন্যাস-আত্মজীবনী-অনুবাদ ইত্যাদি সাহিত্য সৃষ্টিতে যথেষ্ট সংখ্যক ব্যাপ্তি বিস্তৃত করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে উপন্যাসের সংখ্যা স্বল্প। তবে শিল্পের গুণগত বিচারে সেই উপন্যাস কয়টি বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় কালজয়ী স্থান অধিকারে অবশ্যম্ভাবী সামর্থ অর্জন করেছে। তাঁর মানসলোকের প্রতিফলন ঘটেছে সেই উপন্যাসগুলিতে। তাঁর স্বাধীন জীবন-জিজ্ঞাসা তারই নিজস্ব নিয়মে সমকালীন পটভূমিতে বিকাশ লাভ করেছে। স্বদেশ-জিজ্ঞাসা ও জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসের মূলে নিহিত। স্বাভাবিকভাবে তাঁর উপন্যাস শিল্পে চরিত্র নির্মানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে স্রষ্টার বিশিষ্ট মনোভঙ্গি। তাঁর উপন্যাস সাহিত্যে আমরা একেকটি পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্যময়ী শিল্পপ্রতিমাকে পাই। সেই শিল্পের কাহিনী , চরিত্র , মনস্তাত্ত্বিকদ্বন্দ্ব, বাস্তবতা , স্থনীয় পরিবেশ , সমকাল , শিল্পীর দায়বদ্ধ চেতনা , বিশিষ্ট জীবনদর্শন প্রভৃতি বিষয়গুলি বাংলা কথাসাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। সেগুলিতে আমরা একজন সার্থক শিল্পী এবং সফল স্রষ্টাকে প্রত্যক্ষ করি। সেই সঙ্গে আমরা পেয়ে যাই অখ্যাত-উপেক্ষিত-নিতান্ত সাধারণ নিম্নবর্গের মনুষের জীবনকে শিল্পে উন্নীত করার মহান প্রয়াস। তাঁর উপন্যাসগুলিতে আমরা একজন সামাজিক দায়বদ্ধ সচেতন শিল্পের শিল্পসত্তাকে উপলব্ধি করি। তাঁর উপন্যাসে প্রধানত গুরুত্ব পেয়েছে বিশিষ্ট জীবনদর্শন সমকালীন পটভূমি ও সমাজবাস্তবতা। কালধর্মে চলমান সাধারণ মানুষের জীবনের ছবিতে অসাধারণ শিল্প নির্মাণে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কালোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছেন। কোথাও কোথাও তিনি উপন্যাসকে গণজীবনের হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর লেখনীতে উপন্যাসগুলি শিল্পের গুণে উপন্যাস হয়ে উঠেছে আবার জীবনদর্শনে সেগুলি জনজীবনের জাগরণী সুরের বীণা হয়ে বেজে উঠেছে ।

খ) গদ্য সহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায় : রিপোর্টাজ ভ্রমণকাহিনী ও অন্যান্য গদ্য রচনা

সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যয়ের উপন্যাস ছাড়াও গদ্য সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে চাঁর গল্প - রিপোর্টাজ ভ্রমণকাহিনী - প্রবন্ধ - ডায়েরীধর্মী রচনা পত্র-পত্রিকায় লেখা চিঠি ও আত্মজীবনীমূলক রচনা। এগুলি বিভিন্ন সময়ে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নিসৃত রস সৃষ্টির প্রয়াস। আবার কোনোটি পছন্দের লেখকের গদ্যানুবাদ। তাঁর এই শ্রেণীর উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ হল 'আমার বাংলা' (প্রথম প্রকাশ

১৩৫৮, বঙ্গাব্দে ঈগল পাবলিশার্স, কলকাতা ২০), 'ভূতের বেগার' (প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৫৪, কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃর্ক), 'যখন সেখানে' (প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৭, কলকাতা ২৬), 'ডাকবাংলার ডাইরি' (প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭২, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা ৯), 'নারদের ডাইরি' (প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭৬, ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা-৬), 'যেতে যেতে দেখা ' (প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৩৭৬, বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলকাতা ৭) 'ক্ষমু নেই'(প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৮, প্রসূন বসু কর্তৃক কলকাতা ৯ থেকে), 'ভিয়েতনামে কিছুদিন' (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭৪, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, কলকাতা ৯) 'অবার ডাকবাংলার ডাকে' (প্রথম প্রকাশ জানু ১৯৮১, চলতি দুনিয়া প্রকাশনী, কলকাতা ২৯), 'অগ্নিকোণ থেকে ফিরে' (প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪, সপ্তাহ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১২), 'এখন এখানে' (প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা ৯), ' খোলা হাতে খোলা মনে (প্রথম প্রকাশ বইমেলা ১৯৮৭, দরবারী প্রকাশনী, কলকাতা ১২), ''ঢোল গোবিন্দের আত্মদর্শন'' (প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৭, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৬ থেকে), 'কুড়িয়ে ছিটিয়ে' (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯০, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯ থেকে) 'কবিতার বোঝাপড়া' (প্রথম প্রকাশ জানুঃ ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,কলকাতা ৯), 'টানাপোড়েনের মাঝখানে' (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৯) ' ঢোল গোবিন্দের মনে ছিল এই' (প্রথম প্রকাশ জানুঃ ১৯৯৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা -৯) ' ইয়াসিনের কলকাতা'(প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭৮, জটায়ু বকস কলকাতা ৯) ' টো টো কোম্পানী' (প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৪, শ্যামলী প্রকাশনী, কলকাতা ২৯), 'জানো আর দ্যাখো জানোয়ার' (প্রথম প্রকাশ ১৫ই এপ্রিল ১৯৯১, নির্মল বুক এজেন্সী, কলকাতা ৭), 'এলাম আমি কোথা থেকে '(প্রথম প্রকাশ ২৫ শে বৈশাখ ১৩৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৯)

তাঁর গদ্যরচনার প্রকৃতি বিশ্লেষণাত্মক উক্তিতে বিগদ্ধ সমালোচক নীহার রঞ্জন রায় (আমার বাংলা) গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখেন '' তারপর সুভাষ পদাতিক হয়ে বাংলার পথে ঘাটে মাঠে বেরিয়েছিলেন দেশের অগণিত মানুষের পরিচয় সেবার জন্য, তাদের দুঃখ সুখ, আনন্দ বেদনা, আশা আকাঙ্খাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণের জন্য, নিজের যথার্থ পরিচয় পাবার জন্য। সে সুদীর্ঘ কয়েকটি বৎসর সুভাষের অজ্ঞাত বাস, নাগর সাহিত্যের মুখর কোলাহল থেকে আত্মনির্বাসন। এ- অজ্ঞাতবাস, এ-নির্বাসন ব্যর্থ

হয়নি; পদাতিক জীবন তাঁকে নতুন ঐশ্বর্যের সন্ধান দিয়েছে, দেশের মাটির সঙ্গে পরিচয় সাধন করিয়েছে। এইতো যথার্থ আত্মপরিচয়।----- দেশকে ও দেশের মানুষকে জানা, হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করা এর চেয়ে গভীরতর জীবন উৎসের কথা আমি জানিনে। সুভাষ সেই উৎসের সন্ধান পেয়েছেন এবং তার সন্ধান দিয়েছেন।''

সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাংবাদিকতার সূত্রে, শ্রমিক সংগঠনের কাজে, বাংলার মাঠ-ঘাট, গ্রামাঞ্চল-শিল্পাঞ্চল, শহর-বন্দর, ঘুরে ঘুরে জীবনের ও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা জীবনে সঞ্চয় করেছিলেন। সেই পত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট তাঁর বিভিন্ন গদ্য রচনা। গল্প রচনা প্রসঙ্গে স্বয়ং লেখক সেকথা অকপটে স্বীকার করেছেন - ' মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, তাদের জীবনের নানা সমস্যার কথাই আমার লেখায়, কবিতায় তুলে ধরেছি। ঠিক বানানো গল্প আমি কখনো লিখতে পারিনি। আমার লেখা শুরু হয়েছিল গদ্য দিয়ে। ছেলেবেলায় স্কুলের ম্যাগাজিনে প্রথম লেখা বেরিয়েছিল। কথিকা ধরনের লেখা। পরিচিত মহলে তা নিয়ে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। --- চাক্ষুষ দেখাশুনো ও অভিজ্ঞতা থেকে আমার গল্প। যা দেখছি তার বেশি লিখিনি।' (সুভাষ মুখোপাধ্যায় গদ্য সংগ্রহ ২/দেজ পাবলিশিং বৈশাখ ১৪০৩, পৃঃ ৫০৯)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য সংগ্রহ - ১ (দেজ পাবলিশিং ডিসেম্বর ১৯৯৪) গ্রন্থের ভূমিকা অংশে তাঁর গদ্যের শৈলী সম্পর্কে আমিয় দেব লেখেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার মতোই তাঁর গদ্যেরও মূল লক্ষণ সরলতা। জটিলবাক্য তিনি খুব কম লেখেন যৌগিক বাক্যও তেমন না তাঁর প্রবণতা সরল বাক্যেরই দিকে অথচ সরল বাক্যের পৌন:পুনিকতায় যে একঘেয়েমি আসে অনেক সময়, তার এতটুকুও এখানে নেই। শুধু যে একঘেয়েমিই নেই তা নয়, এমন একটা টান আছে এ গদ্যের যে পড়তে শুরু করলে শেষ করতে হয়। সরলতার এই কঠিন পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন নানা ভাবে। তাঁর অনুচ্ছেদ বিভাজন খুব সরল, তাঁর শব্দসম্ভার খুব সরল তৎসব শব্দ নিতান্তই অপ্রতুল তাঁর অন্বয়ও খুব সরল। এলাম, দখলাম, জয় করলাম গোছের এমন একটা স্বাচ্ছন্দ্য আছে সব মিলিয়ে যে মনেই হয় না পড়তে বসে কোনো পরিশ্রম করছি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন গদ্য রচনায় আমরা তাঁর প্রত্যেকটিতেই বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পরিচয় পাই। সেগুলি বিভিন্ন দৈনিক, মাসি, সাপ্তাহিক কিংবা ত্রৈমাসিকে ছাপা হয়েছিল। কোনে কোনোটি আবার 'জনযুদ্ধ' ইত্যাদি সংবাদ পত্রের জন্য লেখা। সেগুলির প্রত্যেকটিতে স্বতন্ত্র বৈচিত্র পাই আমরা। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে একটি নিগুঢ় ঐক্য। যখন সেখানে ছুটে বেড়িয়েছেন সেখানে যা তাঁর মনে দাগ

কেটেছে তাই তিনি গদ্যে শিল্পিত রূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কোনো কোনোটিতে দেখিয়েছেন শ্রম মানুষ কিভাবে বঞ্চিত করছে, কিভাবে কৃষকের ধান মহাজনের আড়তে যাচ্ছে কিংবা কিভাবে গৃদামজাত হচ্ছে কিভাবে কামার কুমোর তাঁতি প্রভৃতি খেটে খাওয়া মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে উঠছে। তিনি কোনো কোনো গদ্যে দেখিয়েছেন কিভাবে মানুষ সংঘবদ্ধ হয় শ্রমিক কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলে, কিভাবে সমবায় সমিতি গড়ে তোলে। কিভাবে বঞ্চিত নিপীড়িত সর্বহারারা সুদখোর জমিদার আড়তদার পাইকার প্রভৃতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। কিভাবে মহামারী দুর্ভিক্ষে মানুষ জীবনের সংগ্রামে জয়ী হয় এসব কিছুকে তিনি ছোট ছোট কাহিনী ধর্মী গদ্যে বৈচিত্র্য দান করেছিলেন।

তাঁর গদ্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে ছোটদের জন্য লেখা রচনাগুলি হল 'বাঙালীর ইতিহাস' (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯, বুক ওআর্ল্ড লিমিটেড, কলকাতা), 'অক্ষরে অক্ষরে' (প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪, স্বাক্ষর, কলকাতা ২০), ' কথার কথা' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, স্বাক্ষর, কলকাতা ২০) 'জগদীশ চন্দ্র বসু' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, স্বাক্ষর, কলকাতা ২০), 'দেশ বিদেশের রূপকথা' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, প্রকাশ ভবন, কলকাতা ১২), 'রূপকথার ঝুড়ি'(প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, ওবিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা ৯) ইত্যাদি।

এছাড়া তাঁর গদ্য সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম হল 'রুশ গল্প সঞ্চয়ন' (প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৬৩, ন্যাশনাল বুক এ জেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ১৩); 'ইভান দেশি সোভিচের জীবনের একদিন' (প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৬৫, ডি এম লাইব্রেরী কলকতা ৬) 'তমস' (প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৮ সাক্ষরতা প্রকাশনী কলকাতা ৯) ইত্যাদি।

তাঁর এই গদ্য রচনাগুলির মধ্যে আমরা তাঁর রসবোধের বৈচিত্র্য পাই। এগুলি ছাড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাঁর বিভিন্ন সময়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য। এই বিপুল সংখ্যক গদ্য রচনার মধ্যে তাঁর সামাজিক চেতনা সংবেদনশীল মননশীলতা উচ্চ জীবন চেতনা শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধ শিল্পবোধের পরিচয় আমরা পাই। এগুলির মধ্যে সাহিত্যেক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন শিল্প প্রতিভার নিদর্শন আমরা পাই। ঘুরে ঘুরে দেশ বিদেশের নানা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত এই রচনাগুলি সমাজ বাস্তব সত্যের ছবি আমরা পাই। লেখক 'আমার বাংলা' গদ্যগ্রন্থ সর্ম্পকে লিখেছেন 'দিন বদলেছে। শালগাছের ছায়ায় ছায়ায় আজ আর গোরা পল্টনের তাঁবু নেই। খালের দুপাশে চিক চিক করে না মানুষের হাড়। লরির রাস্তায় এখন পত্তন হচ্ছে নতুন নতুন গঞ্জ। স্বাধীন দেশে মানুষ এখন নতুন করে দল বাঁধছে, নতুন করে শপথ নিচ্ছে, নতুন করে স্বন্ন দেখছে সুখশান্তির।' 'আমার বাংলা পটভূমি' তাঁর সমাজ মানুষকে দেখার নিখুঁত

অন্তদৃষ্টি সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল। তাঁর গদ্য রচনাগুলির একেকটিতে বৈচিত্রময় সমাজ জীবনের ছবি, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য, সমাজ মানুষের বৈচিত্র্য, বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক পরিবেশ আমরা সাহিত্যের বিষয় রূপে পাই। সেগুলির রচনা শৈলীতে লেখক যুক্ত করেছেন গল্প বলার ভঙ্গি। এতে পাঠকের রসলিপ্সার চাহিদা পূরণ হয় সার্থক রূপে। তাঁর 'আমার বাংলা' গ্রন্থে এরকম এগারোটি শিরোনামাঙ্কিত গদ্যাংশ পাই আমরা 'গারো পাহাড়ের নীচে' 'ছাতির বদলে হাতি' 'দীপঙ্করের দেশে', 'ধন্যার সঙ্গে যুদ্ধ' 'শাল মহুয়ার ছায়ার' 'পাতালপুরীর রাজ্যে' , 'কলের কলকাতা', 'গদ্দল পাথর''চাঁট গায়ের কবি ওয়ালা' 'মেঘের গায়ে জেল খানা ' এবং 'হাত বাড়াও'। এগুলির মধ্যে 'গারো পাহাড়ের নীচে' শিরোনামের গদ্যটিতে অধুনা বাংলা দেশের ময়মনসিংহ জেলার গারো পাহাড়ের এক বিচিত্র্য অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। এখনকার মানুষ চৈত্র মাসে পাহাড়ের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় তখন সেখান কার দুধর্ষ জানোয়ারগুলো প্রাণ ভায়ে ছুটে পালায় । লেখক বলেন - '' আর পাহাড়ী মেয়ে পুরুষরা সেই সুযোগে মনের সুখে হরিণ আর শুয়োর মারে। তারপর সন্ধ্যে বেলা শিকার সেরে গোল হয়ে ঘিয়ে নাচ আর গান।'' 'গারো পাহাড়ের নীচে আমার বাংলা '। লেখক সেই পাহাড়ের বসবাস কারী মানুষের কথায় লেখেন পাহাড়ের নীচে যারা থাকে, তারা আমাদেরই মত হালবদল নিয়ে চাষ আবাদ করে। মুখচোখে তাদের পাহাড়ী ছাপ। হাজং-গারো কোচ বানাই ডালু মার্গান এমনি সব নানা ধরনের জাত। গারোদের আলাদা ভাষা; হাজং ডালুদের ভাষা যদিও বাংলা, কিন্তু তাদের উচ্চারণ আমাদের কানে একটু অদ্ভুত ঠেকে। 'ত' কে তারা 'ট' কে 'ত' আবার 'ড' কে তারা 'দ' বলে, 'দ' কে 'ড' প্রথম শুনলে ভারি হাসি পাবে। ভারো তো, তোমার কাকার বয়সের এখজন হৃষ্টপুষ্ঠ লোক দুধকে ডুড বলছে, তামাককে টামাক।' (গারো পাহাড়ে নীচে/আমার বাংলা) এখান কার মানুষ মাচা করে ঘর বাঁধে। সেই উচ্চাসনেই হাঁসমুরগী, যেখানে শোওয়া রান্নাবান্না সবই। এখানকার সমকালের জমিদারদের হাতী বেগার আইনের প্রতিবাদী মানুষদের কথায় লেখেন লেখক। জমিদারদের সেখানে হাতি ধরার শখ ছিল। সেই কথায় লেখক বলেন - 'আর প্রত্যেক গাঁ থেকে প্রজাদের আসতে হবে নিজের নিজের চাল চিড়ে বেঁধে। সে জঙ্গলে হাতী আছে সেই জঙ্গল বেড় দিয়ে দাঁড়াতে হবে। ছেলে হোক বুড়ো হোক কারো মাপ নেই। যারা হাতী বেড় দিতে যেত তাদের কাউকে সাপের মুখে, কাউকে বাঘের মুখে প্রাণ দিতে হত।

মানুষ কতদিন এ সব সহ্য করতে পারে? তাই প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। গোরাচাঁদ মাষ্টার হলেন তাদের নেতা। চাকলায় চাকলায় বসল মিটিং, কামারশালায় তৈরী হতে লাগল মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র।

শেষ পর্যন্ত জমিদারের পল্টনের হাতে প্রজাদের হার হল।' (গারো পাহাড়ের নীচে/আমার বাংলা)। এখানে বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা চাষবাস পশু শিকার কথা বলার ধরন সেখানকার মানুষের প্রকৃতি জমিদারের অত্যাচার অত্যাচারের প্রতিবাদকে গল্পের ঢঙে শিল্পিত রূপ দিয়েছেন লেখক।

গারো পাহাড়ের নীচে বসবাস কারী সহজ সরল মানুষগুলিকে মহাজন জমিদার ব্যবসায়ী দোকানদার অমানবিক ভাবে শোষণ করতো। তার কয়েকটি নিদর্শন দিয়েছেন লেখক। যেখান কার এক গারো চেংমান। বিপদের সময় উপযাচকে মহাজন মনমোহন চেংমান কে একটি ছাতা দেওয়ার কয়েকবছর পর সুতসমেত তৎকালীন সময়ে হাজার টাকা আদায় করে নেয়। ডালুদের কুমার গাঁতি গ্রামের নিবেদন সরকারের ছেষট্টি বিঘে জমি দু-দশ বছরের মুদির দোকানের বাকির দেনায় মহাজন কুটিশ্বর সাহা কেড়ে নেয়। এক চাষী আর এক ধুরন্ধর মহাজনের কাছ থেকে ধারে একটি কোদাল নেওয়া তার মাসুল হিসেবে পনেরো বিঘে জমি কেড়ে নেয়। সেকালে চাষীর ধান জমিদারের খামারে তুলতে হতো। চুক্তির ধান কর্জার ধান খাজনা ইত্যাদি সমস্ত মিটিয়ে বুকের রক্ত জল করে ফলানো ফসল সমস্ত জমিদার কে দিয়ে চাষীকে খালি হাতে হতাশ হতে হতো। এছাড়া সেখানে ছিল নান্‌কার প্রথা। লেখকের কথায় 'নানকার প্রজাদের জমিতে স্বত্ব ছিল না। জমির আমকাঠালে তাদের অধিকার ছিল না। জমি জরিপের পর আড়াই টাকা পর্যন্ত খাজনা সাব্যস্থ হত। খাজনা দিতে না পারলে তহশীলদার প্রজাদের কাছারিতে ধরে নিয়ে যেত, পিছমেড়ো করে বেঁধে মারত; তারপর মালঘরে আটকে রাখত। নীলামে সব সম্পত্তি খাস করে নিত।' 'ছাতির বদলে হাতী/আমার বাংলা) লেখক ঘুরে ঘুরে সাধারণ চাষীদের ওপর অমানবিক অত্যাচার শোষণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই অত্যাচারের প্রতিবাদের কথায় লেখেন ''কিন্তু নওয়াপাড়া আর দুমুনাকুড়া, ঘোষপাড়া আর ভুবনকুড়ার বিরাট তল্লাটে ডালু চাষীরা আজ জেগে উঠেছে। তারা বলেছে, জমিদারের খামারে আর ধান তুলব না। ধান তারা তোলেনি। পুলিশ - কাছারি কিছুতেই কিছু হয়নি। শেষে জমিদার হার মেনেছে।'' (ছাতির বদলে হাতী/আমার বাংলা)।

লেখক বলেছেন এখন আগের মতো শহর বন্দরে ভদ্রলোকেরা তাদের আর তুই তুকারি করে না। ওরা এখন আর রূপ ছেলে এক সঙ্গে বসে মদ্যপান করে না। ওরা সকলে একসঙ্গে গাঁতায় চাষ করে। চাষ করতে করতে ছেলে মেয়ে সকলে মিলে গান করে ---

'শুনো শুনো বন্দু গো ভায়া
রোয়া লাগাইতে চলো গো এলা।

বন্দুর জমিখানি দাহাকোণা

হাল জরিছে মৈষ মেনা

হাল বো আছে

সি উথি মাতি রে -----।' (ছাতির বদলে হাতি/আমরা বাংলা) লোক জীবন লোক কথা লোক সঙ্গীতের প্রতি লেখদের দরদের পরিচয় একদম পাই আমরা।পদাতিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ের গ্রাম বাংলায় ঘুরে ঘুরে মানুষের কাছাকছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। এক সময় কীর্তিনাশা নদী পথে রানীনগরের এতিমখানা, ঢাকার বিক্রমপুর পরগনা বা মুন্সী গঞ্জে ঘুরে ঘুরে দেখে ছিলেন গ্রামের মানুষ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কালে দেশ ত্যাগী হয়েছে। খাঁ খাঁ করছে জেলে পাড়া য়ুগীপাড়া ঋষি পাড়া। তিনি সেখানে ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন বাড়ীতে বীতে আর সন্ধ্যে জ্বলে না, শাঁখ বাজেনা রাত্রের ঝড়ে ছেলের দল হারিকেন হাতে আম কুড়োতে যায় না পাকা আম মাটিতে পাড়ে পচে যাচ্ছে। লৌহজঙ্গ বন্দরের কথায় লেখক বলেন 'দিঘলীর খাল যেখানটায় পদ্মায় গিয়ে পড়েছে তারই মুখে দোকানপাট, গুদাম আর মহাজনদের গদি। যত লোক না খেয়ে রোগে হাত-পা ফুলে মরেছে, তাদের টেনে টেনে খালের জলে ফেলা হয়েছে। এদিকে স্তুপাকার শবদেহ খালের মুখ পর্যন্ত বুঁজে গিয়েছে। দুগর্ন্ধে বন্দরে টেকা দায়। বন্দরের মহাজনরা মহা ফাঁপরে পড়ল। এ যেন লোকগুলো মরে গিয়ে তাদের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে।' (দীপঙ্করের দেশে/আমার বাংলা)। বানীনগরের এতিমখানার তাঁর সঙ্গে আন্তরিকতা হয় আলি হোসেন, গৌরাঙ্গ, আজিমুন্নেসা, সুকুরবানু, হরিদাসী, মজিদ, রাধাশ্যাম ও আমিনার সঙ্গে। নেত্রাবতী গ্রামে এক বৃদ্ধের নিষেধ সত্ত্বেও সেখানে গিয়ে এক ভয়ঙ্কর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ান তিনি তাঁর কথায় 'কোন্ দেশে আছি আমরা? কোন শতাব্দী এটা? চিন্তার মধ্যে সবকিছু বান এলোমেলো হয়ে গেল। কাটা একটা আঙুল শুধু চোখের ওপর ভেসে উঠল যে আঙুল কেটে নিয়েছে ইংরেজ বেনের ছিল। সে আঙুলে বোনা হত একদিন দুনিয়া জয় করা ঢাকাই মসলিন, সেই কাটা আঙুলের রক্ত আজও বন্ধ হয়নি। চোখ বুঁজে সূর্যের দিকে তাকালাম, সেই রক্ত। আজও ঝোপটার দিকে তাকিয়ে দেখি গাছের ডালে নমকে আছে ফোঁটা ফোঁটা সেই রক্ত।' (দীপঙ্করের দেশে/আমার বাংলা)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলার এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেরিয়েছিলেন অনুসন্ধিৎসা চিত্তে। বন্যাবিধ্বস্ত বর্ধমানে গিয়ে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। বর্ধমানের সাতকাহানিয়া, সাগর পুতুল, সাগিরা, কোটাল ঘোষ, কাঁটাঠি কুরি, আয়না, দর্শিনী, বনবাহিনী গ্রামগুলির বর্ণনায় তিনি লেখেন - ''বোনাবনের ভেতর দিয়ে আলো আলো রাস্তা। সাবধানে যেতে হয় ক্ষুরের মত ধারালো ঘাস পারের পাতা কেটে বসে।

ঘুপচির মধ্যে হল ফুটিয়ে দেয় বিছুটির পাতা। তারপর মাঠ। ধূ ধূ করলে বালি। দুপাশে তাকালে দেখা যায় পোড়োবাড়ীর ভিটে, ভাঙা মন্দির ইঁট ফুঁড়ে বট অশথের গাছ গজিয়েছে। মাঠের মধ্যে বড় বড় খানা খন্দ।'' (বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ/ আমার বাংলা)। লেখক সেই বন্যার কথায় লেখেন '' সেই প্রথম বন্যা দেখলাম। আমি আর সুনীল জানা। আমি গিয়েছি খবর আনতে, সুনীল জানা ফটো তুলতে। সাংবাদিকতায় দুজনেরই প্রথম হাতেখড়ি। সঙ্গে রাঙা বাতলাবার জন্যে আছেন ডাক্তার শরদীশ রায়'' (বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ/আমার বাংলা)। লেখক দেখেছেন বন্যা ও মহামারীতে গ্রামগুলো জনশূন্য ধূ ধূ প্রান্তর। আবার ক্রমশঃ দিন গড়িয়ে গেল সেই মানুষগুলো নিজেরাই একসময় বন্যা মোকাবেলার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাঁধ বাঁধার কাজ করে সংঘবদ্ধ ভাবে। সেই বাঁধের নির্মানের একদিনের অভিজ্ঞতার কথায় লেখক বলেন - ''পুরুচার বাঁধের কাছে বসে সেই পুরনো দিনটার কথা ভাবতে ভাবতে একমাত্র আস্ত জানাগান (বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভা-ঙো, গাইছি, এমন সময় পিঠের ওপর একটা প্রচন্ড কিল পড়ল। ফিরে তাকিয়ে দেখি বিজন ভট্টাচার্য, সঙ্গে শম্ভু মিত্র। 'এই কী হচ্ছে? বর্ধমানে ও -গান বেআইনী জানো না?' এতক্ষণ আমার খেয়ালই ছিল না। কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ! লোকে শুনলে তো বাঁধের নীচের আমাকে জ্যান্ত মাটি চাপা দিত।'' (বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ/আমার বাংলা)

বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন ভৌগোলিক বৈচিত্রপূর্ণ অঞ্চলের বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বাংলার মেদিনীপুর, কেপকুর, চন্দ্রকোণা, পাহাড়তলী, মহিষডুবি, মহিষাদল, সুতাহাটা, তরোপাখিয়ার হাট, নন্দীগ্রাম, খড়কড়িহা প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষের কাছাকাছি পৌছে তিনি বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতার কথা তাঁর গদ্য সাহিত্যের বিষয় করে তুলে ছিলেন। লেখক যেখানকার জীবনের ধ্বংস লীলাকে তাঁর গদ্যের বিষয় করেছেন - ''মহিষাদলে খাবার রাস্তায় শ্মশানের পর শ্মশান। ফাঁকা ফাঁকা মাঠ, মাঝখানে পড়ে আছে অসংখ্য নতুন মাটির কলসী। লোকে বলল, শ্মশানগুলো সবই নতুন হয়েছে। আগে ধান চাষ হত এইসব জমিতে। দুদিন আগে এলে দেখতেন না - খেয়ে মরা মানুষগুলো বাড়ির উঠোনে পচে ভেপসে উঠেছে, তাদের লাশগুলো শেয়াল আর শকুনিতে ছিঁড়ে খাচ্ছে। মাঠে নিয়ে গিয়ে মড়া পোড়ানোরও কারো সামর্থ্য ছিল না।'' (শাল মহুয়ার ছায়ায়/অমরা বাংলা)। লেখক লক্ষ করেছিলেন যেসব জঙ্গালের জনজীবনের পরিবর্তনের প্রকৃতি সাঁওতালদের সামাজিক জীবনে এসেছে বিরাট পরিবর্তন। জঙ্গলের জায়গা দখল করেছিল বিমান ঘাঁটি আর মিলিটারির ছাউনী। লেখকের বর্ণনায় ''শাল মহুয়ার বন উজার করে মিলিটারির ছাউনি পড়েছে মাইলের পর মাইল। ঝড় ভাঙায় তা দেখেছি, দেখলাম সরডিহায়। যে অঞ্চলে মিলিটারি, সে অঞ্চলে বদলে গেছে গাঁয়ের চেহারা। কাঁচা রাস্তা

পাকা হয়েছে। গাঁয়ের আকশ ধুলোয় ধুলো হয়ে থাকে লরির চাকার। যেখানে দোখান ছিল না, সেখানে দোকান, যেখানে ঘর ছিল না। সেখানে পাকা দালান উঠেছে।'' শাল মহুয়ার ছায়ায়/আমার বাংলা)

লেখক তাঁর গদ্যে দেখিয়েছেন আসান সোল দুর্গাপুরের খনি শ্রমিকদের জীবনের কষ্ট পরিশ্রম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কয়লা বনির শ্রমিকদের খনির ভেতরকার কঠিন শ্রমকে তাঁর অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন লেখক। লেখক কয়লা খনির শ্রমিকদের কাছাকাছি পৌছে যান কপিকলের সাহায্যে। খনিতে প্রবেশের ছবি আকতে লেখক বলেন খনির ভেতরের খবর কেউ বাইরের মানুষ জানতে পারে না। মালিকের একেবারে নিজস্ব মানুষ জন ছাড়া কাউকে খনির ভেতরে নামতেও দেওয়া হয় না। খনির ভেতরকার কথা লেখকের ভাষায় ছবি হয়ে ওঠে ''চোখে জমাট অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখা যায় না। নামতে নামতে মনে হয় যেন কোথায় কোন পাতালে তলিয়ে যাচ্ছি। পৃথিবীর জল বায়ু মাটির জন্যে মন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। হঠাৎ পাসের নীচে কপিকলটা সটাং করে আটকায় হাতে আপাদমস্তক ঢাকা সেটি ল্যাম্প আর কাঁধে গাইতি নিয়ে সবাই নেমে দাঁড়ায়।

খাদের গাঁ দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে। গোলক ধাঁ ধাঁর মত অসংখ্য সুরঙ্গ চলে গেছে ডাইনে বাঁয়ে। মোড়ে মোড়ে হাওয়া চলাচলের খোলা দরোজা। একটু দূরে দূরে ইলেকট্রিক আলো।

কয়লা কাটার নানা রকমের ব্যবস্থা। কেউ ড্রিল মেশিনে কয়লা কাটছে, কেউ ডিনামাইট দিয়ে ধসিয়ে দিচ্ছে, কয়লার বড় বড় চাংড়া, কেউ গাঁইতি দিয়ে কয়লা চটাচ্ছে। যারা বারুদের আওয়াজ করে কয়লা (গিরিয়ে) দেয়, তাদের জল শর্ট ফায়াবার। খাদ মজুর দের বলে, মাল কাটা । এখানে এক রকমের কিম্ভূত ভাষা গড়ে উঠেছে। না বাংলা, না হিন্দী এক রকমের পাঁচ মিশেলী ভাষা। এখানকার বাঙালী কুলিকামিনরাও সেই ভাষাতেই কথা বলে। খাদের নীচে টবে কয়লা ভর্তির পর সেই টব দড়ির কলে ওপরে তোলে হলেজ খালাসীরা। টব টেনে তোলার জন্যে আলাদা আলাদা লাইন পাতা সুরঙ্গ। সেই লাইন ঠিক রাখার জন্যে আছে সাফাই কুলি। ভর্তি টব ঠেলে নিয়ে যাওয়া আর খালি টব মালকাটাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ টালোয়ানদের । ওপরের কয়লার চাপ ভেঙে পড়ার মত হলে কাঠের ঠেকো দেয় যারা, তাদের বলে কাঠমিত্রি। এ ছাড়া রাজমিস্ত্রিও আছে; তাদের কাজ ইঁটের গাঁথুনি দেওয়া। খাদের নীচে চোঁয়ানো জল মারার জন্যে আছে পাম্প খালাসী আর বেলিং খালসী।'' (পাতালপুরীর রাজ্যে/আমার বাংলা)। এই খনির ভেতর পদে পদে দুর্ঘটনা এড়িয়ে খাদমজুরদের কাজ করতে হয়। তার ওপর সেখানকার ওভার ম্যান ইনচার্জ ও পিট-সরকারকে ঘুস না দিলে কয়লা খাঁদে কারো বাঁচার উপায় নেই। কিন্তু লেখকের শিল্পী সত্তায় সেই অত্যাচর স্থায়ী হয় না - '' আজ আর সেদিন নেই। খনির অন্ধকারেও

আলোর খবর পৌঁছচ্ছে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দল তৈরি হয়েছে খনিমজুরের। সাঁওতাল বিদ্রোহীদের রক্ত আজও শিরায় শিরায় বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে যারা, আস্তে আস্তে তারা অন্ধকারে উঠে দাঁড়াচ্ছে। বীরশা মুন্ডার বংশধরেরা ভগীরথের মত মাটির নীচে বয়ে নিয়ে যাবে রক্ত গঙ্গাকে। পিতৃপুরুষের ক্ষুধিত আত্মাকে তৃপ্ত করবে তারা '' (পাতাল পুরীর রাজ্যে/আমার বাংলা)।

পদাতিক সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমার বাংলা গ্রন্থে কলকাতা হাওড়া হুগলি চব্বিশ পরগনা থেকে শিলিগুড়ি ও পার্বত্য জীবনের সমকালের বিভিন্ন পরিবর্তন সংগ্রামীন ও নাগরিক জীবনের বৈচিত্র্য এঁকেছে। নন্দীগ্রাম থেকে ফরিদপুর আসমুদ্র হিমাচল অঞ্চলের অধিবাসীদের সামগ্রিক সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রতি লেখক বলেন ''বাংলার বুক জুড়ে সবুজ মাঠের সোনালী ফসলে, চাষীর গোলাভরা ধানে ভরে উঠুক শান্তি। কারখানায় খারখানায় বন্ধনমুক্ত মানুষের আন্দোলিত বাহুতে বাহু মেলাক শান্তি। যুদ্ধ নয়, অনাহারে মৃত্যু নয় আর। কোটি কোটি বলিষ্ঠ হাতে এবার স্বাধীন সুখী জীবন, এবার শান্তি।'' হাত বাড়াও / আমার বাংলা)। জনজীবনের কথা প্রতিবাদ ও প্রতিবোধের কথা, শান্তি ও সুখের কথা মাটির ভাষা শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িতের কথায় জুতসই শব্দ চয়ন করে গদ্য সাহিত্যের শৈল্পিক রস সৃজনে সমর্থ হয়েছিলেন। এখানে লেখকের লেখার ভাষার সঙ্গে অঙ্কিত তাঁর বিশিষ্ট জীবন দর্শন।

আমার বাংলার পর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক সৃষ্টি যখন যেখানে (১৯৬০) ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে এই গদ্যগ্রন্থটি রচিত। এই সময় কালের মধ্যে ১৯৫২ সালে তিনি নাজিম হিকমতের কবিতার অনুবাদ এবং ১৯৫৭ সালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা শীর্ষক একটি কবিতা সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এর আগে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে প্রেসিডেন্সি জেল, দমদম সেন্ট্রাল জেল ও বক্সা জেলে দু বছরের বেশী সময় বন্দী ছিলেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বজবজের চটকল শ্রমিক আন্দলনের সক্রিয়কর্মী ছিলেন। তাঁর এই সময় কালে রচিত যখন যেখানে গ্রন্থের গদ্যাংশ গুলিতে জীবনের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করি আমরা। এই গ্রন্থের রচনা গুলি হল 'এইটুকু, আসমন, জমি, কাঁটাতারের বেড়ায় , বজবজের যে কোন সকাল', বাবর আলির চোখের মত', খবরের খোজে, একুশের সুরে বাঁধা, লিখতে বারন, একটি অমানুষিক কাহিনী, আমাদের গাড়ি, একটি প্রতিবাদ পত্র। আলোচ্য রচনাগুলির শিল্প গুন বিচারে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যাংশ গ্রহ ২য় খন্ড (দেজ পাবলিশিং কলকাতা-১৯৯৪) গ্রন্থের গ্রন্থপরিচয় অংশে উল্লেখিত আনন্দবাজার পত্রিকার সমালোচনা যথার্থ প্রাসঙ্গিক। যেখানে লেখা হয়েছিল .....ছোটগল্পের রীতিনীতি মেনে না চললেও 'এইটুকু' একটি

অমানুষিক কাহিনী কিংবা একটি প্রতিবাদ পত্র -এ গল্পের বসই পাওয়া যায়- যদিও হয়ত আখ্যাংশ বস্তবজীবন থেকেই সংগ্রহীত, এইটুকু স্মৃতিচারনের মেজাজে শুরু, কিন্তু সমাপ্ত গল্পের সংহত ব্যঞ্জনায়। লিখতে বারন' ঠিক স্মৃতিকথাও নয় রিপোর্টজও নয় -যাকে বলা চলে ঈশপীয় রচনা। বারাবারে ইশারা-ইঙ্গিতেও অনেক কথা বলেছেন লেখক, যা সবসময় সোজাসুজি বলা চলে না। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির অতি চতুর এবং সর্থক ব্যাবহারের উদাহারন হিসেবে লেখাটি উল্লেখযোগ্য। (আনন্দবাজার পত্রিকা ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য সংগ্রহ ২য় খন্ড (দেজ পাবলিশিং কলকাতা ১৯৯৪) গ্রন্থের গ্রন্থ পরিচয় অংশে উল্লেখিত কুশল লাহিড়ীর উক্তি যথার্থ- তাঁর সহজ সরল কাব্যময় উপমা কসোনের ভঙ্গি, কথকথার অন্তরঙ্গতা ইত্যাদি সম্মিলিত হয়ে গদ্য রচনাকে একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আমার মনে হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যরচনায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের সহজ সরল অথচ রসোত্তীর্ণ ভঙ্গি অনেক গদ্য শিল্পীর শিক্ষার বিষয়.....। (পরিচয়, জৈষ্ঠ, ১৩৭০পৃ১৪৬১-জ) এই পরিচয় পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক (১৯৫৬-৬৫) বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনা সম্পর্কে যথার্থই লেখেন-''.....না, খবরের মামুলি যোগানদার নয়, প্রথমতো সরকারি বেসরকারি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী হওয়া নয়, এ হল একেবারে সরজমিনে সেকালের অখন্ড বাংলার গ্রামে-গঞ্জে শহরে-হাটে মাঠে ট্রেনে বাসে নৌকোয় চেপে কিংবা মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে পরলোভানি ফসলের খেতে, খাবার রুখু ডাঙা আর বানভাসি নাবালে, কয়লাখনির খাদে আর চটকলের কুলি ধাওড়ায় ঘুরে ঘুরে দেশের মাটি আর তার মালিক মানুষের আসল রুপের সন্ধান, তাদের মনের আসল কথাটি জেনে নেয়া। তারপর সবাইকে তা জানানো।.....ফিরে ফিরে খরা, বন্যা, মনন্তর-মহামারীতে নিরন্ন বাস্তুচ্যুত সর্বস্বান্ত রোগে শোকে জজর ধংস বিপর্যস্ত সমাজের নিচুতলার মানুষজনের তত্ব তল্লাস করতে গিয়ে দেশার কাছের দূরের, এমন কি প্রতন্ত অঞ্চলেরও অন্ধি সন্ধিতে সেঁধিয়ে সুভাষ নতুন একটি আবিস্কার করেছিলেন স্বদেশকে আর তুলে আনছিলেন কলমে আঁকা ছবি আমাদের এই বাংলার আর তার বাসিন্দা বাঙালি অবাঙালি নানা জাতের নানান ভাষার মানুষের আসল রুপটির - মরতে মরতেও মরতে জানেনা যে মানুষ ঘর করতে শিখেছে যারা নিরন্তর মরী মতান্তর নিয়ে। এই গদ্য শৈলী ও রিপোটার্জ ধর্মী রচনা সেকালের বাঙালী

লেখকদের কাছে মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এভাবে বাংলা গদ্যসাহিত্যে সাহিত্যিক সুভাষ তাঁর নিজস্ব গদ্যরীতিতে হয়ে উঠেছিলেন স্বতন্ত্র।

যখন যেখানে গদ্যগ্রন্থের প্রথম গদ্য রচনা এইটুকু। এই-গদ্যাংশে লেখক নিবারণ বাবু ও ফড়িঙের মার ভালোবাসা - দুঃখের কথা বর্ণনাত্মক রীতিতে বলেছেন। একটি কাহিনী বর্ননার মধ্যে লেখকের প্রকৃতি- ও নিত্যনৈমিত্যিক ছোট ছোট বিষয়গুলিকে অসাধরন প্রকাশ ভঙ্গি ও আটপৌড়ে ভাসায় সহজ ভাবে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন। চমকপ্রদ উপমা ও চিত্রধর্মী ছবি আমরা পাই তাঁর বর্ণনায়- '' কিন্তু শীতের সকালে কিংবা এক পশলা বৃষ্টির পর আকাশে যখন রোদ হেসে ওঠে, গায়ে ছোট্ট মেয়ের নাকের নোলকের মত ফোঁটা জল আর বিন্দু বিন্দু শিশির বিপজ্জনক ভাবে ঝুলতে থাকে। একহাত ঘোমটা টানা থাকলেও ঘড় ঘড়ি তুললে সে দৃশ্য চোখ এড়ায় না।'' (এইটুকু/যখন যেখানে) সেই সঙ্গে এই রচনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে ''রাস্তার যে সে জায়গায় খোয়া উঠে গিয়ে খোঁদলের মধ্যে জল জমেছে',পাড়ার বেকিয়া ভাগ বাড়িই পুঁয়ে পাওয়া ক্ষয়াটে।। ময়রার দোকানে গরম জিলিপি ভাজার ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ চুল পাকা বুড়োদের ভিড়ে গিজ গিজ করত তাঁর সে বৈঠকখানা মিষ্টির দোকানের এদিকে খোলার বস্তাটা ভুঁড়িপেট হালইকর, রোগা রোগা ডকের খলাসী, সেঠ ঘন্টানাড়ানো টিকিওয়ালা পুরুষ পানের দোকানদার বুড় ইত্যাদি বিভিন্ন ছবি। লেখকের বাস্তব মতের স্মার্ট লেখদ্দুআমার বাংলার পর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক সৃষ্টি যখন যেখানে (১৯৬০)। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে এই গদ্যগ্রন্থটি রচিত। এই সময় কালের মধ্যে ১৯৫২ সালে তিনি নাজিম হিকমতের কবিতার অনুবাদ এবং ১৯৫৭ সালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা শীর্ষক একটি কবিতা সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এর আগে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে প্রেসিডেন্সি জেল, দমদম সেন্ট্রাল জেল ও বক্স জেলে দু বছদ্দআসমন, জমি, কাঁটাতারের বেড়ায় , বজবজের যে কোন সকাল', বাবর আলির চোখের মত', খবরের খোজে, একুশের সুরে বাঁধা, লিখতে বারন, একটি অমানুষিক কাহিনী, আমাদের গাড়ি, একটি প্রতিবাদ পত্র। আলোচ্য রচনলগুলির শিল্প গুন বিচারে সুভাস মুখোপাধ্যায়ের গদ্যাংশ গ্রহ ২য় খন্ড (দেজ পাবলিশিং কলকাতা-১৯৯৪) গ্রন্থের গ্রন্থপরিচয় অংশে উল্লেখিত আনন্দবাজার পত্রিকার সমালোচনা যথার্থ প্রাসঙ্গিক। যেখানে লেখা হয়েছিল .....ছোটগল্পের রীতিনীতি মেনে না চললেও 'এইটুকু' একটি অমানুষিক কাহিনী কিংবা একটি প্রতিবাদ পত্র -এ গল্পের বসই পাওয়া যায়- যদিও

হয়ত আখ্যাংশ বস্তবজীবন থেকেই সংগ্রহীত, এইটুকু স্মৃতিচারনের মেজাজে শুরু, কিন্তু সমাপ্ত গল্পের সংহত ব্যঞ্জনায়। লিখতে 'বারন' ঠিক স্মৃতিকথাও নয় রিপোর্টজও নয় -যাকে বলা চলে ঈশপীয় রচনা। বারাবারে ইশারা- ইঙ্গিতেও অনেক কথা বলেছেন লেখক, যা সবসময় সোজাসুজি বলা চলে না। অবনীন্দ্র নাথের গদ্যরীতির অতি চতুর এবং সর্থক ব্যাবহারের উদাহারন হিসেবে লেখাটি উল্লেখযোগ্য। (আনন্দবাজার পত্রিকা ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য সংগ্রহ ২য় খন্ড (দেজ পাবলিশিং কলকাতা ১৯৯৪) গ্রন্থের গ্রন্থ পরিচয় অংশে উল্লেখিত কুশল লাহিড়ীর উক্তি যথার্থ- তাঁর সহজ সরল কাব্যসয় উপসা প্রসোনের ভঙ্গি, কথকথার অন্তরঙ্গতা ইত্যাদি সম্মিলিত হয়ে গদ্য রচনাকে একটি বৈশিষ্ট দান করেছে। আমার মনে হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যরচনায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের সহজ সরল অথচ রসোত্তীর্ণ ভঙ্গি অনেক গদ্য শিল্পীর শিক্ষার বিষয়.....। (পরিচয়, জৈষ্ঠ, ১৩৭০পৃ১৪৬১-জ) এই পরিচয় পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক (১৯৫৬-৬৫) বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক মঙ্গলাচরন চট্টপাধ্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনা সম্পর্কে যথার্থই লেখেন-''. . . . . না, খবরের মামুলি যোগানদার নয়, প্রথমতো সরকারি বেসরকারি সংবাদ সরবরাহ 'যখন যেখানে' গদ্য গ্রন্থের তৃতীয় রচনা 'কাঁটাতারের বেড়ায়'। এই লেখক তার সমকালের সংগ্রামী কমরেডদের কথা বলেছেন। তাঁর এই কমরেডদের মধ্যে আলোচ্য গদ্য উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব হলেন - আব্দুল রেজ্জাক খন, সতীশ পাশড়াশী, কমেরেড রামসুরত, লেখকের কালাদা, পরভেজ শহীদী, চারু মজুমদার, চিন্মোহন সেহানবীশ - প্রমুখ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সতীর্থ কমরেড আব্দুল রাজ্জাক খানের কথায় বলেন-খা-সাহেব বক্সার আদিযুগের লোক। প্রায় দু-যুগ আগে ইংরেজ সরকার এই পন্ডববর্জিত দেশে যে প্রথম যে ক-জন বেয়াড়া দেশভক্তকে নির্বাসনের দন্ড দিয়ে পাঠায়,তাদের মধ্যে ছিলেন খা-সাহেব। স্বাধীনতার জন্য দেশে যত আন্দলন হয়েছে, প্রত্যেকটি গণআন্দোলনের সঙ্গেঁ তিনি আশৈশব জড়িত। খিলাফতে তিনি ছিলেন কংগ্রেসে তিনি ছিলেন, শ্রমিক আন্দোলন তার কৃষক আন্দোলনের বীজ বোনা থেকেও তিনি আছেন। (কাঁটাতারের বেড়ায়/ যখন যেখানে)। ছ-ফুট লম্বা এই মানুষটি কথায়-কথায় বলেন বুশতে পারছেন। তার পুরণ দিনের কথা জেলের সবাই অবাক হয়ে শোনে। বৃদ্ধ বয়েসেও বার বার তিনি টানা অনশন আন্দোলনে সক্রিয় থাকেন। সংসারে তার অসম্ভব অভাব।

বাংলা দেশের অর্ধশতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস যার জীবন সেই সতীশ পাকড়াশীর কথায় সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেন — তিনি মুখচোরা মানুষ। তাঁর কথায় লেখক বলেন — সেই কবে প্রথম কৈশরে ঘরবাড়ির মায়া কাটিয়ে দেশ স্বাধীন করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে পথে বেরিয়েছেন, প্রতিজ্ঞা পালন না করে তাঁর বিশ্রাম নেই। চির জীবনটাই তাঁর জেলে জেলে কাটল। যারা তাঁরই সঙ্গে এক দিন পথে বেড়িয়েছিল, কেউ আগে কেউ পরে সবাই ঘরে ফিরেছে। অনেকে তাদের অতীতের নির্যাতনের পুঁজি ভাঙিয়ে গাড়ি করেছে বাড়ি করেছে তার যৌবনটা মাটি হল বলে জীবনের অস্তাচলটা নানা রঙে রাঙিয়ে তুলেছে।

ভালবাসা কতটা গভীর হলে তবে আজীবন লাঞ্ছিত ষাট বছর বয়সেও দেশের হত ভাগ্য মানুষগুলোর জন্য দুচোখের জ্যোতি আস্তে আস্তে স্মান করে দেওয়া যায়, জ্বড়াগ্রস্থ গায়ের চামড়ায় পরমায় ছোট করে আনা জায় এবং তারপরও নতুন জীবনের আশায় আশান্নিত হওয়া যায়, উদ্দীপ্ত হওয়া যায় যৌবনদিপ্ত উৎসাহে। (কাঁটাতারের বেড়ায়/ যখন যেখানে)।

সেকালের মজুর কমরেড দের কথা বলেছেন সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় আলোচ্য গদ্যে। তাদের অনেকেই সেই বক্সা জেলে দু-বছর , আড়াই বছর ধরে বন্দী আছেন। তারা দু:খে পুড়ে আন্দলনে এসেছিল একদিন। বর্তমান জীবনে তাদের লড়াই করে বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তার সতীর্থ বন্দীদের প্রতি অফুরন্তকে সম্বল করে তাঁরা বেচে আছে। লেখক বলেন জেলে তারা কষ্ট করে ভাষা শিখেছেন খুটিয়ে খুটিয়ে বই পড়ে নিজেদের বিশ্ববোধে ব্যপ্ত করে তুলেছে। এদের মধ্যে মিসিরজী অল্পকথায় অন্তরস্পর্শী ভাষণ দেন। লেখকের কালীদা শান্ত - স্নিগ্ধ প্রকৃতির মানুষ। জেলে রামদেওকে দেখলে সকলে চেঁচিয়ে ওঠে। সে চমৎকার বাংলা শিখেছে। এদের মধ্যে রামসুরতের কথায় লেখক বলেন - জীবনের গ্লানির দিকটা দেখে দেখে মনের মধ্যে সে ঘৃনার বারুদ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল আগুনের সামান্যতম স্পর্শে তাতে বিস্ফোরণ ঘটল। টাকার নেশা , নীড় - বাঁধার স্বপ্ন সব তুচ্ছ হয়ে গেল। সর্বস্ব ত্যাগ করে আন্দলনে আকণ্ঠ ডুবে গেল সে। (কাঁটাতারের বেড়ায়/ যখন যেখানে)।

সেই জেল জীবনের কথায় লেখক সেকালের উর্দ সাহিত্যের কবি অধ্যাপক পরভেজ শহিদীর কথা বলেন। সে চমৎকার কবিতা বলতে পারতো। তাদের কবিতা শোনায় মহান হৃদয়ের মানুষ পরভেজ শহিদীকে বিনা বিচারে আটকে রাখা হয়েছিল সেই জেলে।

সেই জেল জীবনে লেখকের সঙ্গে ছিলেন তেভাগা আন্দোলনের নেতা জলপাইগুড়ির চারু মজুমদার। জেলে বন্দী কয়দীরা চারু মজুমদারের মুখে জলপাইগুরির কাথা ও তেভাগা আন্দোলনের কথা শোনে- প্রয় বাড়িতেই সুপারির বাগান। গায়ে গায়ে লতানো গাছ পান। নদী বহুল দেশ পায়ের পাতা ডোবান সরু অগভীর পাহাড়ী নদী। বর্ষায় জলে ভেসে যায়। চষা ভুঁই। মধ্যে মধ্যে ডাঙা, সেসব ডাঙায় খড় শুকান হয় সেই সব খড় বাড়ি। জমিগুলো আল-বাধা সমতল; উওরে হিমালয় - কালো মেঘের মত।করতোয়া বড় নদী কোমর পর্যন্ত জল। গ্রাম বলে কিছু নেই। কয়েকটা বাড়ি নিয়ে একেকটি টাড়ি। বাড়ি বলতে একটা ঘর , একটা রান্নাঘর, আর গোয়াল। ঘরের মধ্যে মাচা করে শোয়া। শিকের উপর কয়েকটা হাঁড়ি কোনটাতে বীজ ধান , কোনঠাতে দই কিংবা চিঁড়ে। একটু সবলিন চাষীদের ঘরে কাঠের বাক্স। চটের উপর ছেঁড়া কাপর পেতে বিছানা। প্রত্যেক বাড়ীতে একটি করে মাটির কুয়ো- এ অঞ্চলে চুয়া। চৈত্র মাসে জল থাকেনা। ঘোলাটে জল। শীতকালে ভাতের সঙ্গেঁ লাফা শাক আর বর্ষায় পাটপাতা। লাফা শাক শলশলা ধরণের - জলে সেদ্ধ করে কিছুটা ক্ষারদেয় তার সঙ্গে লঙ্কা পোড়া আর নুন (কাঁটাতারের বেড়ায়/ যখন যেখানে)। সেই মানুষ গুলোর বাঁচার লড়াইয়ের কথা শোনে তারা চারু মজুমদারের মুখে। তার মুখে শোনেন এখানকার মানুষের ব্যবহৃত সতন্ত্র ভাষা।

জেলে সবাইকে নিয়ে হাসিতে ডুবিয়ে রাখতেন চিনুবাবু অর্থাৎ চিন্মোহন সেহানবীশ। তাদের মধ্যে কাজ পাগল লোক ছিলেন হুগলির গিরিজা মুখার্জী। জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ- সবই তার নখের ডগায়।এই জেল থেকে দমদম সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরের প্রসঙ্গেঁ এই জেল জীবনের ও সেখানকার বিভিন্ন ধরনের ছবি সরস ভষায় তুলে ধরেছেন আলোচ্য গদ্যে। বজবজের শ্রমিক সংগঠনের সময় সেখান কার এক বিশেষ জীবন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর বর্ণনায় আমরা পাই -‘‘ ক্রমেই ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকবে চাড়িয়ালের বাস্তায় হাফ- প্যান্ট পরা কোমরে গামছা বাঁধা মানুষের এক দীর্ঘ মিছিল। কারোহাতে ঝোলান টিফিনের বাক্স, কারো কোমরে

পুটলী বাঁধা শুকন মুড়ি। হাত মোছার জন্যে দড়িতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে কেউ কাটা- ছেড়া পাটের পাকান বান্ডিল। কারো ট্যাকে ঝুলছে ধারাল উলঙ্গ ছুরি। চটকলে কাজ করতে করতে লাগে।

মোড়ে মোড়ে শাখা নদীর মতন ভাগ হয়ে জাবে একেকটি দঙ্গল। কেউ জাবে তেল-ডিপোয় , কেউ জাবে ঠিকে কাজে। যাদের এখন ইস্কুলে পড়বার বয়স, গোঁফের রেখা উঠতে ঢের বাকি - তারাও সেই সকালে মিছিলে সার দেবে। আর গাঁ থেকে আসা স্বামী পুত্রহীন কিছু মেয়ে; হয় কয়লা পুরতে নয় মাটি কাটতে।(বজবজের যে- কোন সকাল/ যখন যেখানে)।

বজবজ, ব্যঞ্জনহেড়িয়া, চাড়িয়াল, হপ্তাবাজার প্রভৃতি স্থানের মানুষের সুখ দু:খ, পরিবার - প্রতিবাদ আন্দোলন মিছিল - সভাসমিতি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। ব্যঞ্জন হেড়িয়ার পাগল বাবর আলির ছোট্ট মেয়ে সালেমন-কে নিয়ে আর্থিক ও মানসিক কষ্ট নিজের উপলব্ধিতে একাত্ম করে সাহিত্যের বিষয় করে তুলেছেন লেখক। আর্থিক অভাবে বাবর আলিকে ত্যাগ করে অর্ধবৃদ্ধ এক রেস্তোলার গলায় ঝুলে পড়ে তার বিবি গোলসন। সেখানে তার নতুন সন্তান আসে- ময়না। বাবর আলির মাথা খারাপের সময় তার এক চাচাতো ভাই গাঁয়ের জায়গাটুকু বেদখল করে নেয়। কেবল বাবর আলির মত মানুষের দু:খ নয় সেখানকার মানুষের হরতাল প্রতিবাদ সভাসমিতি , মজুরদের সম্মিলিত বাঁধ ভাঙা আবেগে উদ্দীপিত হয়েছিলেন সাহিত্যিক সুভাষ। তাঁর উপলব্ধির কথায় লেখক লেখেন — বজবজের মাথায় যে আকাশটাকে দেখেছি তার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে হঠাৎ কেন যেন বাবার আলির চোখের কথাই ফের মনে পড়ল। পাগল বাবার আলি নয়। যে -বাবার আলি ঠক্‌ঠকি তাঁতের সামনে সারা রাত বসে জীবনের সঙ্গে শেষবারের মত বোঝাপড়া করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে, একমাত্র তার চোখের সঙ্গে এই গনগনে আকাশটার তুলনা করা চলে।'' (বাবর আলির চোখের মত/যখন যেখানে)।

মন্নন্তর ও যুদ্ধের বাজারে সাংবাদিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় কলকাতার অদুরের কাঁচরাপাড়া বিষ্ণুপুর থেকে ময়মন সিংহের হালুয়াঘাট-ডুমনাকুড়া-ভুবনকুড়া সর্বত্র দেখেছিলেন একই ছবি এক দিকে এক শ্রেণীর মানুষের চরম অমানবিক ভোগসর্বস্বতা আর এক শ্রেণীর অনাহার ক্লিষ্ট লাশের মিছিল। এক শ্রেণীর মানুষ গ্রাম গুলিকে নিশ্চিহ্ন করে সেখানে বিদেশী বিমান ঘটি, সেনা ছাউনি ও

সাকিলী নাগরিক সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য অসংখ্য গ্রাম্য মানুষকে ভিটে ছারা হতে হয়েছিল। এরকম একই প্রত্যক্ষ ছবির কথায় লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন– ''যাচ্ছিলাম বিষ্ণুপুর গ্রামে। খবরের খোজে। দেখেই রস্তার মধ্যে ছেঁকে ধোরল একগাদা লোক। হাতে জরিপের ফিতে নেই, তবু ভেবেছে আমিন। অনাথ বিধবার দল কেঁদে পড়ল, পথের ভিখিরি বানিয়েছে বাবা।''বলতে বলতে আচলের খুঁট থেকে খুলে দেখায় পোকায় খাওয়া ছেঁড়া উলিডুলি দলিল - পাট্টা।

তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকা এক বুড়ি ঠাকুর ঘড়ে ভাঙা কাঁচের ফ্রেমে বাঁধান সিঁন্দুর লেপা অস্পস্ট ছবির সামনে মাথা ঠোকেন। সাত পুরুষের অসংখ্য স্মৃতি জড়ানো এই ভিটে ধুলোয় মিশে যাবে, প্রাণ থাকতে কেমন করে সহ্য হয়? (খবরের খোঁজে/যখন যেখানে)। এভাবে গ্রামগুলো জনশূণ্য হয়ে এবং মহামারী মন্যন্তরের আঘাতে দলে দলে দুমুঠো অন্নের জন্যে রাজপথে ভিড় করে। লেখক মহিষাদলের এক গ্রামের ছবিতে লেখেন– ''পেছনে ফেলে এসেছি কঙ্কালের খাল। তার দুটো পাশ চিক্ চিক্ করছে রোদ্দুরে। লাইনবন্দী হয়ে পড়ে আছে মানুষের হাড় আর মাথার খুলি। দুভিক্ষে শুরু, মড়ক আর মহামারীতে বয়ে চলেছে মৃত্যুর সেই একটানা স্রোত।'' (খবরের খোঁজে/যখন যেখানে)। লেখক এই খবর সন্ধান এবং সামাজিক মূল্যের সঙ্গে সাহিত্যিকের জীবন দর্শনের পরিচয় নিজেই দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় ''সাধারণ মানুষের তাপদগ্ধ জীবন, সেই জীবন থেকে উৎসারিত তার ভাষার মহাসম্পদ থেকে আমরা যারা বঞ্চিত - তাদের এ নিস্ফলতা অনিবার্য। হয়ত অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যেতে পারলে তবেই পৃথিবীতে আগামী দিনের খবর দেওয়া সম্ভব।'' (খবরের খোঁজে/যখন যেখানে)

এই গদ্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জাত বিষয় হয়ে উঠেছে ১৯৫২ সালের২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলন। সেদিনের বর্ণময় সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন - ''সারা শহরটা থমথমে। দোকানপাট কিছু খোলা কিছু বন্ধ। ছাত্ররা জড়ো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে। রাস্তায় পুলিশ ট্রাকভর্তি। রোদ তেতে উঠেছে মাথার ওপরে। কপালের দুধারে রগ করছে দপ্‌দপ্। মুখগুলো সবাইর উত্তেজনায় চকচকে। চোয়ালগুলো শক্ত হয়র উঠেছে।'' (একুশের সুরে বাঁধা/যখন যেখানে)। লেখক সে দিনের সেই লড়াইএর কথায় ভেবেছিলেন - ''নিজের দেশের প্রতি ভালবাসার আর আত্মবিশ্বাসে সেখানকার সাধারন মানুষ আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছে। পুরনো শৃঙ্খল তারা ছিঁড়বে নতুন করে আর

শিকল পরতে চায় না। ভাষার প্রতি ভালবাসার ভেতর দিয়ে সাড়ে চার কোটি মানুষ আজ বাঁধামুক্ত নতুন জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে।'' (একুশের সুরে বাঁধা/যখন যেখানে)। একুশে ফেব্রুয়ারীতে আবুল বরকত, সালাম রফিক ও জব্বারের আত্মবলিদান লেখকের রাজনৈতিক সত্তায় উত্তাল আলোড়ন তুলেছিল সেদিন। এই সত্তায় তিনি বাংলার মাঠ-ঘাট প্রকৃতি ও পাখির সঙ্গে একাত্ম হয়ে লেখেন ''আমরা আবার হাতে হাত দিয়ে বুকে বুক দিয়ে গলায় গলা মিলিয়ে পাখির ভাষায় বলে উঠলাম, আমরা বরকতের ভাই। আমরা সালামের ভাই।'' (লিখতে বারণ/যখন সেখানে)।

সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যের শৈলীতে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে রচনার আলম্বন বিভাগ হিসাবে গ্রহন করেছেন। বাংলার গাছপালা-মানুষজন-সমাজ প্রকৃতি দেশ প্রভৃতি এমন কি বাড়ির পোষা কুকুর বেড়ালকে নিয়েও কাহিনী নির্মাণ করেছেন লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়। একটি অমানুষিক কাহিনী। গদ্যে তার বাড়ির পোষা কুকুর বিলি ও বেড়াল রুসির সঙ্গে তার পশু প্রমের পরিচয় আমরা পাই। তাঁর বাড়ির বিলির কথায় তিনি লেখেন — '' সেবার চটকলে কী একটা গন্ডগোল হওয়ায় আমাদের দুজনের নামেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরলো। গোটা গ্রাম আমাদের লালকেল্লা। দিনের বেলাটা আমরা বাড়িতেই থাকি। দু-তিন জায়গায় ছেলে মেয়েদের দল আছে পাহারায়। বাড়িরটা শুধু এর বাড়িতে ওর বাড়িতে সরে থাকি। গ্রামের সব বাড়িতেই আমাদের অবারিত দ্বার। সব চেয়ে মুস্কিল করল বিলি। গ্রামে প্রচারে বেরোরার সময় বিলি আমাদের পেছন পেছন ঘুরত, তাড়িয়ে দিলে খানিকক্ষণ পরে ঠিক দেখা যেত ও আমাদের সঙ্গে চলেছে। শেষ পর্যন্ত আমরা হাল ছেড়ে দিলাম।'' (একটি অমানুষিক কাহিনী/যখন সেখানে)।

লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য রচনা ও তার কাব্য রচনাকে সম্পাদকের প্রকাশকের প্রকাশে অনিচ্ছার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ অসাধারন শিল্পগুনে গদ্যরূপ দিয়েছেন তাঁর একটি প্রতিবাদ পত্র শীর্ষক গদ্যে। সেখানে এই বিষয়টি সম্পর্কে তিনি লেখেন - ''কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম, আপনাদের পুজো-সংখ্যায় আমি নাকি গল্প লিখছি। মানতেই হবে, আপনি একজন তুখোড় সম্পাদক, নইলে লেখা এড়াবার এমন একটা কৌশল আপনি খাটালেন কেমন করে ? এই ভেবে আমার মজা লাগছে, আমার কবিতার ভয়ে শেষটায় আমার নামে আপনাকে একটা গল্প খাড়া করতে হল।'' (একটি প্রতিবাদ পত্র/যখন যেখানে)।

দেশের স্বদেশী আন্দোলনের পারিবারিক প্রভাবকে লেখক গদ্যের বিষয় করেছেন। তাঁর স্বদেশী আন্দোলনের উপলব্ধি সম্পর্কে বলেন — ''আমার পা দুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। পুলিশের ভয়ে নয়, পাছে বিজুদির মা ধরে ফেলেন সেই ভয়ে। এ ব্যাপারটাকে পুরোপুরি স্বদেশী বলে আমার কেমন যেন খুব বিশ্বাস হচ্ছিল না। তবে ওপরের কাকিমাদের ছাদের ঘরে বসে দুপুরে বিজুদি আর শঙ্কুদা যে লুকিয়ে লুকিয়ে বিপ্লবীদের বইপত্র পড়ত, ওদের মুখ থেকেই তা আমি জেনেছিলাম। আমার বাবা সরকারী চাকরি করেন বলেই ওসব বই পড়বার সময় শঙ্কুদা কিছুতেই আমাকে ওদের ধারে কাছে থাকতে দিত না।'' (একটি প্রতিবাদ পত্র/যখন যেখানে)।

সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় মাঠ-ঘাট-পথ-প্রান্তর-কলকারখানা-নগর ঘুরে ঘুরে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভান্ডারকে পূর্ণতার মাত্রা সমৃদ্ধ করেছিলেন; সেইসব ভ্রমণ কাহিনী সংক্রান্ত রচনার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য তাঁর ডাকবাংলার ডায়েরী। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১লা ভাদ্র ১৩৭২, নবপত্র প্রকাশন, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ থেকে। লেখক 'ডাকবাংলার ডায়েরী' লিখতে শুরু করেছিলেন ১৯৫৮-র শেষ দিকে সুবচনী চদ্ম নামে আনন্দবাজার পত্রিকায়। এই গ্রন্থের রচনাগুলি হল — 'এপার বাংলা', 'সানালি সুতোর পাকে পাকে', 'ছুরি কাঁচি ট্র্যাক্টর', 'মানচিত্র ও মানহানি', 'তাল দীঘি লাল মাটি', 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা', 'হামনাবাদ', 'ফুলের লোক্যালে ফেরা', 'নিম নয়, তিতা নয়', 'ক্যাকটাসের ফুল' এবং 'নাম ছিল মন্ত্রেশ্বর'। বংলার ডাকে সাড়া দিয়ে লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় সোনার বাংলার মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়ে লিখে ছিলেন আমার বাংলা। তারপর এক যুগ কেটে যায়, সেই বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলোক পরিবর্তনের প্রকৃতি অন্বেষণের সুতীব্র আগ্রহে ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন বাংলার শহর বন্দর গ্রাম ও গঞ্জেও, সেই অভিজ্ঞাতা প্রকাশের মূল্যবান গ্রন্থ ডাক বাংলার ডায়েরী। সেকথা ব্যক্ত করে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ও পটভুমিকা অংশ স্বয়ং লেখক বলেন — ''আমার বংলার পর ডাকবাংলার ডায়েরী।'' এক যুগ গিয়ে আরেক যুগ। মাঝখানে দাঁড়িয়ে দ্বিখন্ডিত দেশ। স্বাধীনতার সমবয়সী দুটি দশক।

আস্ত অটুট ষোলআনা বাংলা দেশ নয় আর। এখন পূর্বে পশ্চিমে দশ আনা ছ-আনার দুভাগ হওয়া বাংলার জল-হাওয়া-মাটি। ভাই ভাই এখন দুই ঠাঁই। দুদিকে পৃথক দুই রাজ্যপাট। ভিন্ন নাম নিশান। কিন্তু নাম আলাদা হলেও ডাক এক, ডাক বাংলা। এ তাই সেই এপারের একালের দিগ দেশ

চিহ্নিত ডাকবাংলার ডায়েরী। লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তি জীবনের বনগাঁ বর্ডারের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত 'এপার বাংলা'। সেই সীমান্ত বা বর্ডার শব্দ তার মানে গভীর রেখাপাত করেছিল ''বর্ডার। তার মানে, সীমান্তে এসেছি। হঠাৎ মনটার মধ্যে কেমন যেন করে উঠল। এই অবধি তাহলে আমাদের আপন। কিন্তু তারপর ? তারপর কি পর হয়ে গেছে ?

স্টেশনের রাস্তাটা দেখে চেনা যায় না। সামনে ফুটবলের মাঠটা গেল কোথায় ? আর সেই শিমুলগাছ ? কালবোশেখির ঝড় উঠলে পট্ পট্ আওয়াজে তুলোর পাখা মেলে বীজ ছড়ানোর দৃশ্য ? আকাশ থেকে বরফ পড়তে দেখলে আজও সে দৃশ্য মনে পড়ে যায়। রাস্তার দুপাশে রুজু রুজু দোকান। যতদূর দেখা যায় কোথাও এতটুকু ফাঁকা নেই। ছেলেবেলার যে ছবিটা মনে মনে এঁকে এনেছিলাম, সেটা মিলিয়ে নেবার কোনো উপায় নেই।'' (এপার বাংলা/ ডাকবাংলার ডায়েরী)। বনগাঁর সেই সীমান্তে ভ্রমণের সুবাদে তাঁর সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে আজহার, মাদার মন্ডল, ওয়াজেদ আলি প্রমুখ সীমান্তে বসবাসকারী মানুষের সঙ্গে। এখানকার বিভিন্ন জায়গার— হরিদাসপুর, বরাকপুর গ্রাম, বেলেডাঙ্গা গ্রাম, নাতিডাঙ্গা, সন্দরপুর, নিশ্চিন্দিপুর, চাঁদপাড়া প্রভৃতি বিচিত্র জীবনের পরিচয় সমকালের পটভুমিতে আমাদের কাছে সত্যরূপে শিল্পের বিষয় করে তুলেছেন লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়।সীমান্তে বসবাস কারি মানুষের সঙ্গে তাদের মুখের জীবন্ত ভষায় নানা টুকর টুকর গল্প ও সংলাপে গদ্যটি আমাদের হৃদয়ে রস সঞ্চারে সমর্থ হয়ে ওঠে। বাংলা ভাগের পর সীমান্তে এলাকা বাসীর সুপারী - নরকেল প্রভৃতি দ্রব্যের চোরাকারবার তাদের অর্থ সামাজিক জীবনচিত্র তুলেধরেছেন লেখক। সেখানকার মানুষ গুলোর জীবন সত্যের নানা কথা গল্পের শৈলীতে যুক্ত করে এই জীবন বৃত্তান্তে- পাঠকের নিরবিছিন্ন পাঠের আগ্রহ আদ্যপান্ত বজায় রেখেছেন তিনি। কথা সাহিত্যিক বিভুতিভূষন বন্দোপ্যাধায়ের বাড়ি দেখার অভিজ্ঞতায় তিনি লেখেন— ''চারিদিকে লতাপাতায় এমন ভাবে ঢাকা যে, স্পষ্ট করে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কলা গাছের ডাল আমডাল জড়িয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি। বাঁদিকে বিভূতিভূষণের বাড়ি। আলো জ্বলছে। কারা যেন এখন থাকে।

ডানদিকে আঁশশেওড়ার বন পেরিয়ে ইন্দুভূষণ রায়ের বাড়ি। ভদ্রলোক দুঘন্টা ধরে বিভুতি ভূষনের কত গল্পই যে করলেন। বাড়ির অবস্থা ভালো নয়। মেয়েটি শহরের হাসপাতালে নার্সের কাজ করে। ভারি সুন্দর গানের গলা। নিশ্চিন্দি পুর আজ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। দ্বিতীয় অকু আর জন্ম

নেবে না। তা নিয়ে দু:খ করেও খুব লাভ নেই। দেশ-কাল-পাত্রের রূপান্তরে সাহিত্যেও নবযুগ না এসে কারে না।'' (এপার বাংলা / ডাকবাংলার ডাকে)।

অনেক দিনপর আবার তার পুরনো বজবজের মানুষ-সমাজপ্রেক্ষিত-অর্থসামাজিক জীবনের বিভিন্ন পরিবর্তন-শিল্পে ধরে রেখেছে তাঁর 'সোনালী সুতোর পাকে পাকে' শীর্ষক গদ্যে। কলকাতা থেকে বাস ধরে তিনি একবালপুর-মোমিনপুর-টাকশাল-মহেশতলা-সন্তোষপুর হয়ে তিনি বজবজ পৌছান। বজবজ যাবার পথে রাস্তার দুপাশের প্রকৃতি-জনজীবন নানা ছবি তাঁর এই গদ্যে তুলে ধরেছেন। বজবজের পুরনো চোখেদেখা মানুষ ও জনজীবনের স্মৃতিকথার ঢঙে নতুন জীবনের কথা বদলেছেন সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনায়। সেখানকার ব্যাঞ্জনহেড়িয়ার কথায় তিনি লেখেন আজ ব্যাঞ্জনহোড়িয়া গ্রামের চেহারাই আলাদা। আগে একটা চিঠি লিখতে হলে ছুটতে হত ফকির মহম্মদের ছেলের কাছে। লিখতে না জানার জন্যে লোক ঠকেছেও খুব। এখন চিঠি লেখার লোক বলতে গেলে ঘরে ঘরে আছে। এই ক-বছরে ম্যাট্রিক পাসের সংখাও এ গ্রামে নেহাত কম হল না।'' (সোনালি সুতোর পাকে পাকে/ডাকবাংলার ডায়েরী)। এই বর্ণনায় লেখক বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন অবস্থানের বিভিন্ন জীবনের পরিচয় দিয়েছেন লেখক। এই গদ্যে বিভিন্ন ছোট ছোট ঘটনার প্রসঙ্গে ছবিগুলি এঁকেছেন লেখক। স্বাভাবিক ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে- ভূবন, টমাস, জহিরন, আতর, সাজ্জাদ, ময়না আমিনা,গোলবাবু,আহম্মদ প্রভৃতি চরিত্র।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য সাহিত্যের ভিত্তি হল মানুষ ও দেশ। মানুষ বলতে খেটে খাওয়া মানুষ এবং দেশের জন্যে নিবেদিত প্রাণের সংগ্রামী মানুষ। এই সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনে সমিতি গঠনের প্রয়াসকে শিল্পের বিষয় করে লিখেছেন 'ছুরি কাঁচি ট্রাক্টর'। লুপ লাইনে বর্ধমান থেকে বনপাশে ভ্রমণ করে বনবাসের কামারপাড়ার রামগোপাল মাথুর-এর তরোয়াল তৈরী কিংবদন্তি মুর্শিদাবাদের রাজবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। সেই বনপাশের কালের নিয়মে পরিবর্তনের রূপটি তাঁর এই গদ্যে পাই আমরা-''গ্রামে বৃত্তি বদলের ইতিহাসটা ভারি মজার। কর্মকারের বাস হলেও এখন বেশির ভাগ ঘরেই হয় সোনা-রুপোর কাজ। ঝরিয়া, ধানবাদ, কাতরাসে যেমন, তেমনি আসানসোল, বর্ধমান আর কলকাতায় গিয়ে এখানকার কারবারীরা সোনা-রুপোর দোকানে কাজ করে। কামারের এক ঘা কী করে সেকরার ঠুকঠাকে দাঁড়িয়ে গেছে তার পুরো ছবি এখন আর পাবার উপায় নেই। এই বদল

হয়েছে ধাপে ধাপে।''(ছুঁরি কাঁচি ট্রাক্টর/ডাকবাংলার ডায়েরি)। ডায়েরির সাধারণ অর্থ-অতিক্রম করে লেখক ব্যক্তি জীবনের দিনলিপির বর্ণনার উর্দ্ধে সামাজিক পরিবর্তনের লিপিকে সাহিত্যে লিপিবদ্ধ করেছেন এখানে। তাই ডাক বাংলার ডায়েরী সামাজিক প্রভৃতি ও পরিবর্তনের রূপ বদলের লিপিবদ্ধে স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্য সৃজনের নিদর্শন হয়ে ওঠে।

সামাজিক পরিবর্তনের ভিন্ন প্রকৃতির সমাজ ডায়েরীতে সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন - ''গ্রামের যারা ছোট জাত, তাদের বাড়ি থেকে তাঁত শিখতে কেউ আসে না। একে সারাক্ষণ পেটের ধান্ধা, তার ওপর সমাজে ছোঁয়াছুয়ির বিচার। গোড়ায় গোড়ায় সাধারণ চাষীর ঘরের মেয়েদেরও সহজে কর্ম কেন্দ্রে আনা যায়নি। যেসব পরিবারে রাজনীতির চর্চা আছে, তাদের বাড়ির মেয়েরাই কর্মকেন্দ্রে যাওয়ার চক্ষুলজ্জাটা প্রথম ঘুচিয়েছে।'' (ছুরি কাঁচি ট্র্যাক্টর/ডাকবাংলার ডায়েরী) সমাজ তাত্তিক পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে বাংলার জনজীবনের গতিপ্রকৃতির পালাবদলের ছবি একেঁছেন সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

সমকালের বিপর্যস্ত বাংলার কথায় লেখক বলেন - ''তিন ভাগের এক ভাগ চাষী পরিবার লাঙলগরু বেচে সর্বস্বান্ত হয়ে এখান থেকে চলে গেছে। কেউ গেছে পাকিস্তানে, কেউ গেছে এদিক-ওদিকের আশ্রয়-শিবিরে।'' (নামচিত্র ও মানহানি/ডাকবাংলার ডায়েরি)। মানুষ ক্রমশ বিপর্যয় কাটিয়ে জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়। কোথাও কোথাও সরকারী সাহায্যে কলোনী গড়ে তোলে। সামাজিক জীবনের গঠনমূখী ছবিও সেই সমাজ ডায়েরীতে স্বাভাবিক ভেবে উঠে আসে। ''সে জায়গায় ধরে এনে বসানো হল উদ্বাস্তুদের যারা এক ফোঁটা জমির জন্যে মরে যাচ্ছিল। সাড়ে চারশো ঘর লোক নিয়ে গড়ে উঠল বিরাট এক কলোনি। বারো আনা পরিবার চাষ করবে আর বাকি সবাই দোকানপসার করে খাবে। যারা চাষী পরিবার তারা চাষের জন্যে ন-বিঘে আর ভিটের জন্যে পেল এক বিঘে জমি। ব্যবসায়ী পরিবারদের দশ কাঠা করে বসতের জায়গা। ঘর তুলবার জন্যে সকলেই পেল পাঁচশো টাকা করে ঋণ। এ ছাড়া চাষবাস আর ব্যবসার পুঁজি পাটার জন্যে আরও কিছু টাকা কর্জ দেরার বাবস্থা হল।'' (মানচিত্র ও মানহানি/ডাকবাংলার ডায়েরী)। নবদ্বীপের বেথুয়াডহরী, চকহাতীশালা, যুগপুর প্রভৃতি মৌজা ভ্রমণের বাস্তব অভিজ্ঞালব্ধ সে কালের বাংলার সমাজ গঠনের ছবিটি লেখক সামাজিক ডায়েরির

অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সেই সঙ্গে কৃষ্ণনগর, রানাঘাট ঘুরে শান্তিপুরের কাপড়ের শিল্পীদের বাজার ও শিল্পের বিরোধের ছবিটিও লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক মানচিত্র ও মানহানি শীর্ষক ডায়েরিতে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর এমন ডায়েরিতে সমকালের বাংলার বিপর্যয়ের ও বাংলার দীনতার ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হননি। তার সাহিত্যে আমরা একজন সহৃদয় লোক সাহিত্যিকের জীবন চেতনার শিল্পরচনার নিদর্শন পাই। তাঁর রচনায় জীবন্ত ছবি হয়ে ফুটে ওঠে গ্রাম্য মেলা-গরুর গাড়ি-মাটির হাঁড়িকুঁড়ি হুঁকোর দোকান-মাছ ধরার জাল ধান মাপার ধামা আমোদ প্রমোদের আড্ডা, বাউল গান, গাঁজার আখড়া ইত্যাদি। বোলপুরের মেলার কথায় লেখক বলেন — '' পৌষ-সংক্রান্তির দিন আজ। গেরস্থরা লক্ষ্মীপূজো, পিঠেপরব নিয়ে ব্যস্ত। সাঁওতালদের বাঁধনা পরব, পয়লামাঘ, ডোমহাড়িদের এখ্যান-পুজো। মেলা কাল থেকে জমবে। লোকে জিনিস কিনবে ভাঙার মুখে। এখন দাম বেশির ভয়। দুপুরটা গড়িয়ে নিয়ে বিকেলে চা খেতে খেতে টীকরবেতায় আড্ডা বেশ জমল। পাড়ার এক বৃদ্ধ জয়দেবের মেলার গল্প বলছিলেন। আগে দু-তিনটে জেলার বিত্তবানেরা মিলে কেঁদুলিতে মচ্ছব করতেন। আখড়াও ছিল শতখানেকের ওপর। এখন বিশ পঁচিশটায় এসে ঠেকেছে।'' (তাল দীঘি লাল মাটি/ডাকবাংলার ডায়েরী)। বাউলের গানে লেখকের সৃজনীমন সিক্ত হয়ে ওঠে —

''হরি, তোমায় ডাকিবার
আমার সময় কই ?
কোথা কে দিবানিশি
আমি থাকি দিবানিশি কাজে মত্ত
আমি তোমার তত্ত্ব ভুলে রই।'' (তাল দীঘি লাল মাটি/ডাকবাংলার ডায়েরী)।

লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই ভ্রমণধর্মী ও ডায়েরি ধর্মী গদ্য সাহিত্যে বাংলার জনজীবন ও বাংলার নিসর্গ প্রকৃতির বৈচিত্র্য বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভান্ডারকে বাক্‌ময় করে তুলেছে। লেখক সুন্দরবন, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ডহারবার, ফ্রেজারগঞ্জ বা নারায়ণতলা মুকুন্দপুর, কাঁটিবেড়ে, মশামারি কুলপি ট্যাংরার চড়াকরঞ্জলি প্রভৃতি স্থানের নানা অভিজ্ঞতা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য রচনায় পাই আমরা। সেখানকার নানা লোককথা উপাখ্যান কৃষি বানিজ্য আর্থসামাজিক জীবনের ছবি তাঁর রচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। সুন্দর বনের নিসর্গ প্রকৃতির বর্ণনার সঙ্গে একাত্ম করে ছোট ছোট গল্প কথায় লেখকের শৈলী

রচনা পাঠের বিরামহীন ঐক্যসূত্র অটুট রেখেছেন লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়— ''ঢেউয়ের ছিটে আর ঝিরঝিরে হাওয়া খেতে খেতে নৌকোর টঙে বসে যেতে আমার বেশ ভাল লাগছিল। ভয়টাও আস্তে আস্তে গা-সওয়া হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে চলেছে কমবয়সী একটা ছেলে। বছর বাইশ বয়স। মেছেদায় পানের বরজ আছে। নিজে হাতে চাষ করে। এটা ওটা তাকে জিগ্যেস করছিলাম।

আছিপুর জানেন তো ? গঙ্গা যেখান থেকে বাঁক নিয়েছে। দামোদর আর রূপনারায়ণের জল পড়ে হুগলী পুবে আট মাইল বেঁকে গেছে। ডায়মন্ডহারবারের পর থেকে হুগলী আবার দক্ষিণবাহিনী। সাগরে পড়বার আগে মোহনাটা প্রায় ষোল মাইল চওড়া। এই মুখকে লোকে বলে বুঢ়া মন্ত্রেশ্বর। সাগরে পড়বার আগে হুগলী দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এরই জোড়ের মুখে সাগরদ্বীপ। সাগরদ্বীপের পুবে যেটা গেছে সেইটাই বারতলার মোহনা। লোকে বলে মুড়িগঙ্গা। নানা খাঁড়ির জল নিয়ে এই ধারাটা ধোবলাটের পুবে সমুদ্রে পড়ে।'' (এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা/ডাকবাংলার ডায়েরি)। এখানকার মাছের কারবার পানের চাষ বিভিন্ন কাঠ ও পাটের সঙ্গে আর্থ সামাজিক সামগ্রিক ছবিতে লেখকের ডায়েরির প্রকৃতি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য পূর্ণ রচনাশৈলী নির্মাণের সার্থকতা লাভকরি। লেখক সেখানকার রানীচক রত্নার চক ঘুরে ঘুরে সামাজিক জীবনের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মন্বন্তরের বছরগুলোতে সেকালের হিন্দুরা বাড়িতে মুরগির চাষ করতো কিন্তু এখনকার হিন্দুরা বাড়িতে মুরগি পোষে। সেখানে বেশীর ভাগ চাষী ভাগচাষী। এই চাষী কৃষকদের দুর্যোগের মোকাবিলার উপায় হিসাবে লেখক বলেন— ''বছর পনেরো ষোল আগে এখানে বাড়ি বাড়ি মুষ্টিভিক্ষা তুলে ধর্মগোলা করা হয়। ধর্মগোলায় জমার পরিমাণ এখন বেড়ে হয়েছে সাড়ে তিনশো মণ। ফলে, আজ আর কাউকে মহাজনের বাড়িতে দাদন নিতে যেতে হয় না।'' (এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা/ডাকবাংলার ডায়েরি)।

ভ্রমণ কাহিনী ধর্মী ও রিপোর্টাজ মূলক রচনার প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন লেখকের স্বীকৃতি — ''আমার চোখ আমার পা দুটোতে বাঁধা। পা নাড়িয়ে নাড়িয়ে আমি দেখি। ব্যাসদেবকে নয়, আমি দেখি বাংলা দেশের মুখ।'' (হাসনাবাদ/ডাকবাংলার ডয়েরী)। ইছামতীর ধার হাসনাবাদ হিঞ্জলগঞ্জ প্রকৃতি এলাকায় জনজীবন ব্যবসা বানিজ্য আনন্দ উৎসব সংস্কার কুসংস্কার প্রভৃতি জনজীবনের সামগ্রিক পরিচয় সাহিত্যভুক্ত করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় — ''নদীর ধারে জেলে পাড়া। পুজোর পর মহাজনের কাছ থেকে দাদন নিয়ে জেলেরা যায় সুন্দরবনে মধুর চাক কাটতে, মাছ ধরতে। বনের মধ্যে ওপর

দিকে মৌমাছির দিকে চেয়ে মৌচাকের খোঁজ করতে করতে অনেক সময় তারা সটান গিয়ে পড়ে বাঘের পেটে। যে ক-মাস তারা বাইরে থাকে, বাড়ির মেয়েদের হয় হাঁড়ির হাল। অভাবে স্বভাবও নষ্ট হয়। ওদিকে আবার ঘরের মানুষেরা বাড়ি ফেরে রোগব্যাধি আর মনে কু-সন্দেহ নিয়ে।

জেলে পাড়ায় তাই কখনও সুখ এলে শান্তি আসে না। অন্ধ কুসংস্কারগুলোও যায় না। ছোট ছেলেদের নাকি বনদেবী মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেন; নাকি বলে দেন নদীর ঠিক কোন জায়গায় মাছের ঝাঁক আছে। বছর চারেক আগে বনদেবীর নাকি আদেশ হয়েছিল একটি শিশুকে হত্যা করবার।'' (হাসনাবাদ/ডাকবাংলার ডায়েরি)। সেখানে যাদের জায়গা জমি নেই তারা কষ্টে শাপলার নল সেদ্ধ করে খায়। শাপলার নোনতা নোনতা ঢ্যাপের দানার খৈ, কচু শাক, বীচিকলা সেদ্ধ করে খায়, নদী পাড়ের মানুষের জীবনযাত্রা অনিসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে সাহিত্যের রস সৃজনে অসাধারণ সম্পদ করে তুলেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

লেখকের বিভিন্ন স্থানের ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনার সূত্রে আমরা বাংলার স্থানের বর্ণময় পরিচয় পাই। সেইসব স্থানের বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত অসংখ্য চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই আমরা। লেখক বাননান-বৈদ্যনাথপুর-দেউল গ্রাম-ফুলবেনিয়ার ফুলচাষী, কামার কুমোর জেলে অঙ্ককার চিরুনিকার চর্মকার প্রভৃতি পেশার মানুষের জীবনযাত্রা তাঁর লেখায় চিত্ররূপ দান করেছেন। অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে সেই মানুষগুলোর সামগ্রিক রূপান্তর তাঁর গদ্যে বিষয়রূপে স্থান দিয়েছেন লেখক - ''যারা ছিল স্বাধীন শিল্পী, এখন তারা ক্রমেই মহাজনদের কারখানার মজুর হচ্ছে। কেউ কেউ বাড়ি বসে কাজ করলেও মজুরি নিচ্ছে মহাজনের কাছ থেকে।'' (ফুলের লোক্যালে ফেরা/ডাকবাংলার ডায়েরি)।

ডায়েরিধর্মী রচনার মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য সাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করেছে লেখকের ভৌগোলিক চেতনা। এই ভৌগোলিক চেতনায় খাঁটিমানুষ ও মানুষের জীবিকা সিংহভাগ অধিকার করে বসে। ধুলিয়ান স্টেশন হয়ে লেখক ঔরঙ্গাবাদ, নিমতিতা প্রভৃতি জায়গায় জনজীবনকে সাহিত্যের সত্য বিষয় করেছেন লেখক। চাষীর আর্থিক অবস্থানের বর্ণীকরণ করে লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— ''উনিশশো একচল্লিশের ভাঙনের পর থেকে এ পর্যন্ত দু-আড়াই হাজার বিঘে জমি গেছে নদীর পেটে। জোত খুঁইয়ে পাঁচ-ছশো চাষী পরিবারকে জাতও খোয়াতে হল। এরা এখন কেউ মোট বয়, কেউ বাগান

নিড়োয়, কেউ ঘরামির কাজ করে, কেউ গাড়ি চালায়, কেউ আনাজপাতি বেচে। তবে এদের মধ্যে পনেরো আনা লোকই এখন বিড়ি বাঁধে।

চাষীদের মধ্যে এখানে মোটামুটি তিন জাত। মুসলমান, মাহিষ্য আর ধানুক। মুসলমান চাষীরা বেশির ভাগ থাকে বাগড়ী এলাকায়। নদীর ধারে ধারে। মেটাল এলাকায় থাকে মোটামুটি মাহিষ্য আর ধানুক। ধানুকরা এসেছে বিহার থেকে। রাঢ় এলাকায় হিন্দু-মুসলমান দুয়েরই বাস। আরেকটা জাত আছে, তাদের বলে 'চাঁই'। তারা সাধারণত তরিতরকারির আবাদ করে।'' (নিম নয়, তিতা নয়/ডাকবাংলার ডায়েরি)।

এই বাংলাদেশ ও এখানকার প্রকৃতি লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সৃজনী বোধকে অধিক আলোড়িত করেছিল। মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে অধিষ্ঠান তার সত্তা। তাঁর ব্যক্তি জীবনের প্রত্যক্ষ করা বাংলাদেশের কথা ডায়েরি ধর্মী ভ্রমণ কাহিনী মূলক-রিপোর্টাজ ধর্মী রচনার প্রধান বিষয়। সেকথায় তিনি লেখেন — ''আসলে আমাদের প্রত্যেকের মনেই বাংলাদেশের একটা করে ছবি আছে। আমরা যদি প্রত্যেকে এঁকে দেখাই, কারো ছবির সঙ্গে কারো ছবি মিলবে না। যদি কোনো মিল পাওয়াও যায়, তার মূলে যতটা না বাংলাদেশ —তার চেয়ে বেশি রেলের লাইন। ট্রেনে করে আসতে যেতে দেখা বাংলাদেশ। ছোট বড় ডোবা। আম কাঁঠালের বাগান। খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘর। ঘুঁটে-লাগানো দেয়াল। ঋতুভেদে আকাশ আর মাঠের রকমারি রূপ। কোথাও গরু চরাচ্ছে রাখাল। কোথাও পাঠশালায় ছেলেরা পড়ছে। টেলিগ্রাফের তারে বসে আছে ল্যাজ-ঝোলা পাখি।'' (ক্যাকটাসের ফুল/ডাকবাংলার ডায়েরি)। বাংলার তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় এবং একেবারে সাধারণ ছবি সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য শিল্পিতরূপ দানে অসাধারণ করে তোলার মহতী প্রয়াস এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঁকুড়ায় ঘুরে ঘুরে দেখা সেখানকার বেলেতোড়, বনগ্রাম, বিষ্ণুপুর, ফকিরডাঙ্গা, পাঁচমুড়া, বহড়ামুড়ি, বনকাটা, ইঁদপুর, পাথরডিহি, খাতরা প্রভৃতি স্থান শুশুনিয়া পাহাড়, কংসাবতী ও দ্বারকেশ্বর নদী তীরবর্তী জনজীবনের বৈচিত্র্যময় ছবি বর্ণনা ধর্মী আঙ্গিকে সহজ ভাসায় অসাধারণ ছবি এঁকেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন স্থানের বিচিত্র জনজীবন চাষবাস-বনজঙ্গলময় প্রকৃতিকে শিল্পের বিষয় করে তুলেছেন লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

নিসর্গ প্রকৃতির বর্ণনায় লেখক জনজীবনের ছোট ছোট কাহিনীর মাধ্যমে জীবন ভাবনা ও সমাজচেতনার মূলে পৌঁছে যাবার প্রয়াসে তথ্যানুসন্ধান করেছেন। হুগলী জেলার তারকেশ্বরের বাবাজীদের কথায় লেখক বলেছেন — ''বেশ্যাসক্তি, পরদারগমন, ফুসলানো, বলাৎকার, খুন— বাবাজীদের গুণের ঘাট ছিল না। কারো ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে ফাঁসিকাঠে, কেউ বা জেলে ঘানি টেনে এসে গদিতে আবার গ্যাঁট হয়ে বসেছে। আজ আর সে বাবাজী মোহান্তরা নেই, কিন্তু বাবা তারকনাথের দবদবা যেমন তেমনিই আছে। শুধু হাওড়া স্টেশনে কেন, শহরের সর্বত্রই দেখবেন বাসন্তী রঙে ছোপানো কাপড়ে টুং টাং টুং টুং করতে করতে কাঁধে বাঁক নিয়ে চলেছে দলে দলে লোক। যাবে তারকেশ্বরে। বাবার থানে।'' (নাম ছিল মন্ত্রেশ্বর/ডাকবাংলার ডায়েরি)। তারকেশ্বরের সাধারণ বর্ণনায় আমরা দেখি বাবাজীদের জীবনের ধর্মীয় চেতনার গভীরে ডুব দিয়ে মূলের তথ্যানুসন্ধান করা লেখকের গভীর অনুসন্ধিৎসা।

ভ্রমণ কাহিনীধর্মী ও রিপোর্টাজমূলক রচনা লেখকের রচনার গুণে পাঠকের মনে অহৈতুকী রসের সঞ্চার ঘটে। লেখক বর্ণনাত্মক আঙ্গিকে কোন স্থানের পরিচয়ের সঙ্গে সেখানকার মানুষের জীবনের টুকরো কাহিনী যুক্ত করে বিস্তৃত একটি ফ্রেম নির্মিত করে চলেন অবলীলায় — ''আমাদের ঐ যে অমুকের ভাই গো, সে মুখপোড়াও এখন মাস্টার হয়েছে। কোন্নগরের কাছে কোথায় পড়ায়। ওর দাদা দিন মজুরি করে কত কষ্টে ওকে পড়াল। এম.এসসি পাশ করাল। বুড়ো মা, ভাই, দাদা — কারো দিকে সে আজ একবার চেয়েও দেখে না। কলকাতার ভদ্দরলোকদের তো জানেন . . . আজকাল এক কায়দা হয়েছে। মেয়ের জন্যে মাস্টার রাখে, তারপর সেই বড়শিতেই মাস্টারকে জামাই হিসেবে গেঁথে তোলে। ওর তাই হল। এক উঁচু জাতের মেয়ে বিয়ে করেছে। তাও দেখতে ভাল হলে কথা ছিল। বাপটা বিনি পয়সায় মেয়ে পার করে দিয়েছে। বোকা আর কাকে বলে। কেন ? বাপদী সমাজে কি মেয়ে জুটত না! দু-পাঁচ হাজার টাকা দেবার মত লোকও পাওয়া যেত। কী হবে ছেলেপুলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে? লেখাপড়া শিখে তো এই হাল . . . . ফিরে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল — সমস্যাটা জাতের নয়, লেখাপড়া শেখা না শেখারও নয়। সমস্যাটা শ্রেণীর। কাছের লোক দূরে চলে যাবার। যাকে ধরে বাকি সবাই উঠে দাঁড়াবে ভাবছিল, হঠাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে তার ওপরে উঠে আপন বাঁচার পন্থা নেওয়া। সত্যিই তো। একে বাঁচা বলে না। পালানো বলে।'' (নাম ছিল মন্ত্রেশ্বর/ডাকবাংলার ডায়েরি)।

এই দৃষ্টান্তে আমরা দেখি লেখক তার ভ্রমণের বর্ণনাগুলিতে কাহিনী যুক্ত করে অধিক আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। সেই সঙ্গে সেগুলিতে তাঁর নিজের সত্তায় সমাজ ভাবনা, প্রকৃতি চেতনা, মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সমাজ মানস ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ ভ্রমণ কাহিনীধর্মী রচনার প্রকরণের অভিনব বৈশিষ্ট্য রূপে তাঁর হাত ধরে নির্মিতরূপ লাভ করেছে।

ভ্রমণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে সুন্দরবন থেকে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত তাঁর নারদের ডায়েরি গ্রন্থটি। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে, ৪২ বিধান সরনী, কোলকাতা ৬, ডি. এম লাইব্রেরী থেকে। এই গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত দশটি গদ্য হল — 'না রদবদল', 'সমুদ্র সাধ', পারগঙ্গা', 'কুকুরের নাম মিঠু', 'বিপদ গ্রস্ত হলে', 'বকুল গাছের তলায়', 'যে দিকে দুচোখ যায়', 'সভারোহী', 'মরশুমের দিনে' এবং 'যখন রাস্তাই একমাত্র রাস্তা' শীর্ষক গদ্য। জীবনকে দেখা ও সত্যকে বিশেষ রূপে জানার আগ্রহ নিয়ে লেখক রাস্তাকেই একমাত্র রাস্তা করে নিয়েছিলেন। সেই জীবনকে জানার ও সত্যকে বিশেষরূপে উপলব্ধি করার সুতীব্র আগ্রহ নিয়ে ছুটে বেড়িয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'না-রদবদল' গদ্যাংশে লেখক পৌরাণিক নারদ ও সনৎকুমার কম্পিত চরিত্রের কথোপকথনে বলেন মানুষ নিজের নামের জন্যই সব কিছু করে। কিন্তু কথা তার থেকাও বড়। আবার কথার চেয়ে বড় সংকল্প। কিন্তু সংকল্পের চেয়ে বড় চিত্ত। চিত্তের চেয়ে বড় ধ্যান। আর ধ্যানের চেয়ে বড় বিজ্ঞান। আর বিজ্ঞানের চেয়েও বড় বল। বলের চেয়ে বড় অন্ন। যদিও অন্নের চেয়ে বড় জল। জলের থেকে বড় তেজ। তেজের চেয়ে বড় আকাশ। আকাশেরর চেয়ে বড় স্মৃতি এবং স্মৃতির চেয়ে বড় আশা। কিন্তু জীবন আসার চেয়েও বড়। সেই জীবন সম্পর্কে লেখক লিখেছেন — ''জীবন আশার চেয়েও বড়। জীবনই সবকিছুর গোড়ায়। রথচক্রের নাভিতে যেমন শলাকার পর শলাকা গাঁথা থাকে, তেমনি সমস্ত কিছুই জীবনের সঙ্গে লেগে থাকে।'' (না রদবদল/নারদের ডায়েরি)। গদ্য শিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ভাবনা ও জগৎসত্যের বৃহৎ তত্ত্ব এই গদ্যাংশে আচার্য সনৎ কুমার ও ব্রহ্মাপুত্র নারদের কথোপকথনে সহজ ভাব ও সরল ভাষার অসাধারণ শিল্পরূপ পেয়েছে।

গদ্যশিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ডায়েরীধর্মী রচনাগুলির দিন তারিখ দিয়ে গতানুগতিক ডায়েরী রচনা নয়। তাঁর গ্রাম বাংলার বিভিন্ন স্থানে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছবিগুলিকে তুলে ধরেছেন

এই সব রচনায়। সমুদ্র সাধ শীর্ষক গদ্যাঅংশে তিনি হুগলী হলদিয়া কাকদ্বীপ মাডপয়েন্ট, ফেরিনটোপ, ট্রাওয়ার ল্যান্ড, শিকারপুর, ধোবলাট প্রভৃতি স্থানে ঘুরে ঘুরে দেখার প্রত্যক্ষ জীবনকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। তার সেই ডায়েরি ধর্মী রচনাগুলিতে আমরা দেখি স্থানভেদে তাঁর মানস পটের বর্ণময় প্রকাশ— ''পরে মাডপয়েন্টে দুবার গিয়েছি। একমাত্র গ্রীষ্মের শুরুতে একবার শীতের গোড়ায়। শেষের বারে লঙা ছিল ফ্রেজারগঞ্জ যাবার পথে একটা রাত থেকে। মার্চ মাসে যা দেখে গিয়েছিলাম, ডিসেম্বরে দেখে কান্না পেল।'' (সমুদ্র সাধ/নারদের ডায়েরি) সেই সব রচনায় লেখক নিখুঁত পর্যবেক্ষনী সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে বিভিন্ন স্থানের জীবন পটের অবস্থানের শিল্পরূপদান করেছেন — ''এত বড় মৌজায় সাপে কাটুক, ওলা উঠা হোক — চিকিৎসার তেমন ব্যবস্থা নেই। কাজেই মা-মনসা, মা-শীতলার ভরসাতেই এই নির্বাসিত জনপদের বেঁচে থাকতে হয়। সাপ আছে সব রকমেরই। শিয়রচাঁদা, কালকেউটে, গোখরো, তেঁতুলে, কেউটে। চন্দ্রবোড়া, বিষধর, প্রায় সব সাপই।'' (সমুদ্র সাধ/নারদের ডায়েরি)। ডায়েরী ধর্মী এইসব রচনায় আমরা দেখি লেখক জীবনকে দেখার মৌলিক সত্ত্বা। সেই সব স্থানের বিপদসঙ্কুল জীবনকে বেছে নেবার হেতু অন্বেষণে তিনি প্রামাণ্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন— ''বন কেটে বসত একানে। কাজেই এসব করে গোড়ায় গোড়ায় লোকে শখ করে আসেনি। এসেছিলেন দায়ে পড়ে — নিরুপায় হয়ে।'' (সমুদ্র সাধ/নারদের ডায়েরি)। আর তুলনা মূলক অনুন্নত সেই সব স্থানের অনগ্রসর জনজীবনের পরিবর্তনের প্রকৃতি তাঁর নর এড়ায়নি— ''এতদিন এমনিভাবেই চলে এসেছে। এখন গোল বাধাতে শুরু করেছে ছোকরার দল। তারা স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখছে। পুরনো রাস্তায় আর তারা চলতে রাজি নয়। গ্রামের মাতব্বরদের কারসাজি তারা ধরে ফেলছে। তাদের ন্যায়-অন্যায়ের বোধগুলো ছোট-বড় ধনী-গরীবের বাছবিচার করে না। আজকাল অন্যায় দেখলেই তারা জোট বেঁধে রুখে দাঁড়াচ্ছে।'' (সমুদ্র সাধ/নারদের ডায়েরি)।

তাঁর ডায়েরীধর্মী রচনায় বিভিন্ন স্থানের চোখে দেখা জীবন' গ্রাম বাংলা-মাঠ- ঘাট-ঐতিহাসিক বোধ-জাতীয়তা বোধ এমনকি বাড়ির লোকজন পোষা কুকুর, বেড়ালের কথাও ঠাঁই পেয়েছে। এর পোষা কুকুর মিঠুর কথায় তাঁর ডায়রী ধর্মী রচনায় লিখেছেন — '' ইলেকসনের সময় মিঠুয় আমাদের সঙ্গে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছে। কোথাও তাতে ফলও যে ভালো হয় নি তা বলা যায় না- কোন কোন ভোট দাতাকে খুব কম সময়ের মধ্যে আমরা সহমতে আনতে পেরেছিলাম। পাড়ার কোন কোন লোক

আবার আড়ালে ঠাট্টা করে চলেছে, বাপ রে এ-যে দেখছি খুব স্বদেশী কুকুর।''(কুকুরের নাম মিঠু/নারদের ডায়েরী)।

জীবনেই ইতি-নেতি সব ঘটনা-দুর্ঘটনা জাত সত্যই ডায়েরীধর্মী রচনার অঙ্গ। জীবনের দুর্ঘটনার সত্য তাঁর গদ্য রচনার সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে —''আর আমার চোখও জলে ভরে আসছে। তার ছেলেকে আমিই কোলে নিয়ে বসে আছি। . . . কখনও মনে হচ্ছে — না, সব শেষ। ওর মাকে কি বলে আমি সান্তনা দেব? ছেলেটা চাপা পড়ারার সময় যে গাড়ি চালাচ্ছিল, সে ভাল গাড়ি চালায় বটে— কিন্তু সদ্য দেশে ফিরেছে বলে লাইসেন্সটা আর করে ওঠা হয়নি। কাজেই চলতে চলতেই ঠিক করে ফেলা হল, দোষটা অন্য একজন নিজের ঘাড়ে নেবে। সারা গড়িটাতে এখন একটা থমথমে অস্বস্তিকর ভাব। প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে এখন অনেক কিছু ভাঙা-গড়া চলছে। মাঝে মাঝে উপছে পড়ছে দয়ামায়া। ছেলেটার মাকে কীভাবে সাহায্য করা হবে, তার সহৃদয় জল্পনা।'' (বিপদস্থ হলে/নারদের ডায়েরী)।

তাঁর ডায়েরীধর্মী রচনা নিজের জীবনের সঙ্গে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে আছে সাধারণের জীবন। সেই সাহিত্য ধর্মের কথায় কবিসাহিত্যিক বিষ্ণু দে লিখেছেন — ''বলা যেতে পারে আমাদের সাহিত্যের শৈশব অতিক্রান্ত এবং সাহিত্যিকরা বিষয় ও কলা কৌশল, ভব ও রূপের ভিন্নতায় সন্দেহহীন। কলা কৌশল বা টেক্‌নিকের প্রগতি নির্ভর করে মানসের ব্যাপ্তি বা রূপান্তরে। আর এই মানের সামাজিক সৃষ্টির আবেগ থাকবে কী করে যদি সে জীবনের দিকে না তাকায়, সাধারণের জীবনেইত এ — মানসসরোবরের উৎস, যদিচ তার নীল জলে আকাশের ছবি প্রতিফলিত।'' (বিষ্ণু দে প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম খন্ড, ১ম প্রকাশ, দেজ পাবলিশিং, পৃ: ১৩) সাধারণের কথার সঙ্গে তার শিল্পসত্ত্বা সুনিবিড় রূপে একাত্ম। তার কাব্য-উপন্যাস-গল্প-ডায়েরিধর্মী-ভ্রমণ কাহিনীধর্মী বা রিপোর্টাজধর্মী রচনার কেন্দ্রীয় উপাদান সমাজ মানুষের জীবন। সেই সমাজে একেবারে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত ফুটপাতের জীবন তাঁর সাহিত্যের অঙ্গ হিসেবে মূল্য স্বীকৃত। সেই কথায় তাঁর ডায়েরিধর্মী রচনায় আমরা দেখি — ''কোলে দুধের বাচ্চা নিয়ে ফুটপাথ সম্বল করেছিল স্বামিপরিত্যক্ত একটি মেয়ে। মাকে বাড়ি বাড়ি কাজ করতে পাঠিয়ে সেই বাচ্চা ফুটপাথে হামা দিতে শিখল। তারপর দাঁড়াতেও শিখল। তারপর আবার একদিন দেখলাম ফুটপাথে মেয়েটি শুয়ে। তার কোলে আবার একটি টুকটুকে বাচ্চা।'' (বকুল গাছের

তলায়/নারদের ডায়েরি) বৃত্তাকার এই ফুটপাত জীবন শিল্পীর চেতনায় নাড়া দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। শিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ডায়েরিধর্মী রচনায় সুন্দর্যময় চিত্রশিল্প রূপ। সেই বিশিষ্ট চিত্রকল্পই হয়ে ওঠে তার রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই শিল্পচিত্রকলাময়তা সম্পর্কে কবি-সাহিত্যিক বীরেন্দ্র দত্ত লিখেছেন —''আসলে কথাশিল্পের যে চিত্র ধর্ম, চিত্রাত্মকতা, গভীরতলাশ্রিত ব্যঞ্জনা—সে সমস্ত কথাকারের ব্যক্তিত্ব, বিষয়ের গুরত্বে, রচনার স্বভাব স্বতন্ত্র্যে ও গদ্যভঙ্গির বিশিষ্টতায় রূপ পায়।..... কল্পনাময়তাই আসল, প্রয়োগ তুলির রঙে বৈচিত্র্য আনে। ছবির তুলি রঙ চিত্রীর ব্যক্তিত্বের ও আপন মনের মাধুরী আনে, কবির হাতে ছবির তুলি — রঙ কবিকে আত্মমগ্ন করে, কথাকারের হাতের রঙ-তুলি অভিজ্ঞতার বিস্তার ঘটায়, স্রষ্টার যাবতীয় সৃষ্টিকে করে ভিন্ন স্বাদ ও অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান।'' (বীরেন্দ্র দত্তের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, ১ম প্রকাশ, ২০০৪, পুস্তক বিপনি, পৃ:৪৪)

গদ্যশিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভ্রমণ কাহিনি শীর্ষক কোন গ্রন্থ না লিখলেও ভ্রমণ কাহিনীর আস্বাদ তাঁর গ্রন্থ সার্থকরূপে পাঠকের রসতৃপ্তি পূরণ করে। তার একাধিক গদ্যে আমরা বাংলাদেশের-বর্ধমান-হাওড়া-হুগলী-বাঁকুরা-পুরুলিয়া-সুন্দরবন-কলকাতা-নবদ্বীপ সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের ভ্রমণের অনুপম কাহিনীধর্মী বর্ণনা পাই। সেই রচনা বাংলা ভ্রমণকাহিনীগুলির অনন্য সাধারণ সম্পদ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ বাস ভ্রমণের অসাধারণ অভিজ্ঞতার কথায় আমরা দেখি—''..... তাহলেও বলে কয়ে সাতসকালে রায়গঞ্জের বাসে রোওনা হলাম। শিলিগুড়ি হয়ে বাসে বসেই জলপাইগুড়ি যাব। বালুর ঘাট থেকে জলপাইগুড়ি বাসরাস্তায় পাকা দু-শো মাইল।

তেত্রিশ মাইল পেরিয়ে এসে আবার সেই বুনিয়াদপুর। নেমে একটু হাত-পা টান করে গরম গরম চা খেয়ে নেওয়া গেল। বাস এবার ডানদিকে মোড় ঘুরে টানা জাতীয় সরক বরাবর ছুটল। খানিকটা যেতেই ট্রাক-লরির একটা লম্বা কনভয়। মানিক চকে গঙ্গা পার হবে। ত্রিপলে ঢাকা থাকায় কী জিনিস বোঝা গেল না। শব্দ শুনে মনেহল চায়ের পেটি।আসাম থেকে আসছে। অমনি একটা কনভয়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ার আমার অনেক দিনের শখ। সুযোগ পেলেই একবার ভিড়ে পড়তে হবে।

বাস চলছে কালিয়ামোড়, বুড়িপুকুর, লক্ষীপুর হয়ে কুশমুন্ডি। ছোটবন্দর মত জায়গাটা। তার পর আবার দু-পাশে এক টানা ধান জমি। সর্ষে খেতে বাসন্তি রঙের ফুল। কোনকোন মাঠে খড় এখন সব কাটা হয়নি। রোদ পড়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। কোথাও আছে রবিবারের হাট। গরুর গাড়িতে করে

সওদা চলছে।''(যেদিক দুচোখ যায়/নারদের ডায়েরী)। এই ভ্রমণ কাহিনী ধর্মী রচনায় আমরা তাঁর বর্ণনায় পাই বিভিন্ন স্থানের ভৌগলিক, কৃষিজ-অর্থনৈতিক-সংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ঠ, যোগাযোগ ব্যাবস্থা-শিক্ষা- সাস্থ্য ও জীবন জীবিকার বিস্ময় কর পরিচয়। লেখকের ভ্রমন কাহিনীধর্মী রচনার অঙ্গ হিসেবে মানুষ ও প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত ছিল। উত্তরবঙ্গের শীমান্ত বিহার রাজ্য উত্তরবঙ্গের সঙ্গে একই রুপে জুড়ে রয়েছে। এর বর্ণনা তিনি লেখেন — ''দেওগাঁর পর কানকি বড়সড় গ্রাম। হাটোয়ার পেরিয়ে কিষানগঞ্জ। সবকিছুতেই বিহারী ছাপ। বিহার যে কোথায় কখন ছাড়িয়ে আবার বাংলাদেশে পা দিলাম, ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না।

কিষানগঞ্জ থেকেই রেললাইন গেছে বাস রাস্তার পাশ বরাবর। হাসমুন্ডনালা , ইকরছানা পেরিয়ে মনে হল প্রকৃতির দেহারা বদলে গেছে। চারদিকে অফুরন্তু গাছ। বাঁশঝাড়ের পর বাঁশঝাড়। আমবাগান, শালবন, আদিগন্ত চাষের মাঠ। কয়েক মাইল যাবার পর মাঠ শেষ হয়ে ঘন জঙ্গল। উঁচু উঁচু শাল - সেগুন। (যেদিকে দুচোখ যায়/নারদের ডায়েরি)। উত্তরবঙ্গের ভ্রমণে আমরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, মালবাজার, লাটাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি স্থানের ভৌগলিক প্রকৃতি - প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষজন, ঘরবাড়ি, নদনদী, পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচয় আমরা পাই। ১৯৪৮ এর আগের ও পরের কথায় মালবাজার ভ্রমণ করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন — ''মালবাজার বদলাতে লাগল উনপঞ্চাশ থেকে। দলে দলে রিফিউজিরা এসে পড়ে ত্রিপল টাঙিয়ে খুলতে লাগল মুদিখানা, কাপড়ের দোকান, মনোহরি দোকান। আরও কত কী ? স্টেশনের পাশে জমি পড়ে ছিল, সেখানে বসে গেল রিফিউজি কলোনি। চা বাগানের অনেক বাবুও সেই সুযোগেকলোনিতে বাড়ি তুলে মাথা গুজবার একটু ঠাঁই করে নিলেন।

আটচল্লিশের আগে রেলস্টাফ, আধিকারী ইত্যাদি নিয়ে মালবাজারে লোক ছিল শ দুই আড়াই। জ্বরজ্বারিত ছিল খুব। ম্যালেরিয়া, পিলে, লিভারের রোগ এ তো ছিলই। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক ছিল কালাজ্বরের দাপট। প্রকান্ড একটা গাছ ছিল— লোকে তার ছাল জ্বাল দিয়ে নিজেরাই রস বানিয়ে খেত। কালাজ্বরের সেই ছিল একমাত্র ওষুধ। ডাক্তারখানা বলে কিছু ছিল না। জেলা বোর্ডের ছিল একটা দাতব্য চিকিৎসালয়। (যেদিকে দুচোখ জায়/নারদের ডায়েরি)।

লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমন কাহিনীধর্মী রচনা সৃষ্টির মূলে নিহিত আশৈশব সত্ত্বায় অন্বিষ্ট ভ্রমণপিপাসা। বড় হয়ে লেখক সভাসমিতি সূত্রে খবরের কাগজের সাংবাদিকতার সূত্রে সেই ভ্রমণ পিপাসা আসক্তির পরিতৃপ্তি সম্পন্ন করেছিলেন। তার আশৈশব ভ্রমণের চাহিদার কথা তার ভ্রমণ কাহিনীধর্মী রচনায় সেই প্রকাশ আমরা পাই — ''ছেলে বেলায় ছুটি ছাটায় দেশের বাড়িতে যেতে যা দু-চারবার ট্রেনে উঠেছি। নইলে বড় একটা ঠাঁইনাড়া হইনি। হাওয়া বদলাতে কিংবা শখ করে কোথাও বেড়াতে যাওয়া রেস্তর অভাবেই আমাদের কখনও হয়ে ওঠেনি। কখনও হবে কিনা জানি না।'' (সভারোহী / নাটদের ডায়েরি)। গতানুগতিক ভ্রমণ কাহিনীর তুলনা তাঁর জীবনের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার প্রকৃতি সম্পর্কে স্বয়ং লেখক লিখেছিলেন — ''সত্যি বলতে কী, ভ্রমণকারীদের মত ঘুরতে আমার আদৌ ভাল লাগে না। অর্থসামর্থের কথা ছেড়েই দিলাম। কবে যাবেন কোথায় যাবেন — সব তাদের আগে থেকে ঠিক। কোনো অনিশ্চয়তা, কোনো সংশয় নেই।

উঠবেন কোথায় ? হয় কোনো জানা বাড়িতে, নয় হোটেলে। যার যেমন প্রয়োজন, যার যেমন রুচি। আমার সেসব কোনো বালাই নেই। কোথায় উঠব ? যেখানে ওঠাবে। বাড়ি না হলে হোটেল, হোটেল না হলে বাড়ি। থাকার জায়গা অসম্ভব ভাল হতে পারে, আবার অবিশ্বাস্য রকমের খারাপও হতে পারে।'' (সভারোহী/নারদের ডায়েরি)।

গদ্যশিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পাঁচটি উপন্যাস, কয়েকটি ছোটগল্প ও কবিতা ব্যতীত অন্যান্য গদ্য রচনাগুলির অধিকাংশ সাংবাদিকতার সূত্রে ঘুরে ঘুরে লেখা। খুব স্বাভাবিক ভাবে সেগুলির মধ্যে আমরা পাই তাঁর দায়বদ্ধ সাংবাদিকের সচেতন শিল্পীমানস। সেগুলির অনেক রচনাই হয়ে উঠেছে রিপোর্টাজ ধর্মী গদ্য রচনা। এই শ্রেণীর রচনায় আমরা দেখি তাঁর সাবলীল ভাষাও ভাবের গভীরতা — ''বর্ষার শেষাশেষি মেয়েরা করে ভাদুলি ব্রত। মাটিতে আঁকে আল্পনা, সাত সমুদ্র, তেরো নদী, নদীর চড়া, কাঁটার পর্বত, বন, ভেলা, বাঘ, মোষ, কাক, বক, তালগাছে বাবুইয়ের বাসা। — এ ব্রত সেই দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন এদেশে সওদাগররা সাতডিঙা ভাসিয়ে সমুদ্রে বানিজ্যে যেত। ব্রত ও ছড়ায় আজও সে ছবি ধরা আছে। 'বাপ গেছেন বানিজ্যে', 'ভাই গেছেন বানিজ্যে', 'সোয়ামি গেছেন বানিজ্যে' — তারা মেন নিরাপদে ফিরে আসে। ভাদ্রের ভরা নদীকে ডেকে দুরুদুরু বক্ষে তারা ব্যগ্রতা জানায় — নদী! নদী! কোথায় যাও

বাপ ভাইয়ের বার্ত দাও

নদী! নদী! কোথায় যাও

স্বামী শ্বশুরের বার্তা দাও।

আজ সেই সওদাগরও নেই, সেই বানিজ্যও নেই। কিন্তু এই ব্রতের ভেতর দিয়ে মনে পড়ে যায় সেই আপনজনদের কথা, যারা দূরে আছে।'' (মরশুমের দিনে/নারদের ডায়েরি)। এই রচনাগুলির মধ্যে সাংবাদিকতা ধর্মের সঙ্গে লেখকের প্রকৃতি চেতনা সমাজভাবনা - বাংলার প্রকৃতি প্রভৃতি একাত্ম হয়ে উঠেছিল। কখন তাঁর ব্যক্তি জীবনের টুকরো স্মৃতিকথা সেই সাংবাদিকতার বিষয় হয়ে উঠেছিল। তাঁর জেলে বন্দীজীবনের কথায় তিনি লিখেছিলেন ''সব দলের, সব মতের লোক নিয়ে তৈরী হয়ে গেল জেলে আমাদের যুক্তফ্রন্ট কমিটি। খাদ্য, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সংস্কৃতি, খেলাধুলার জন্যে আলাদা আলাদা দপ্তর। জেলের মধ্যে টাকা পয়সার যেহেতু চল নেই, সেইজন্যে অর্থদপ্তর বলে কিছু থাকল না। মন্ত্রী, এম.এল.এ , কাউন্সিলার জেলে কিছুরই আমাদের অভাব ছিল না। তার ওপর ছিল লেখক, শিল্পী, অভিনেতা, অধ্যাপক, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, মিস্ত্রি, দোকানদার, ব্যবসায়ী, স্কুল কলেজের ছাত্র, ছাঁটাই মজুর, ওষুধের ক্যানভাসার, বীমার দালাল, চাকুরি প্রার্থী যুবক এমনি রকমারি পেশার এবং বাংলা হিন্দি উদু মৈথিলী নেপালী রাজস্থানী এমনি রকমারী ভাষার লোক। কেউ ঘোর নাস্তিক, কারো বা দেবদ্বিজে অচলা ভক্তি।

লোকও সব মজার মজার। একজন স্নান করেননি চল্লিশ বছর, বলতেন ওটা তার একটা এক্সপেরিমেন্ট। বৈঠক খানার বাজারে একজনের ফুলের দোকান, আজকালকার বোমায় কেন এত ধোয়া হয় সে দিত তার ফিরিস্তি। ঘোরতর সংসারী একজন লোক, তিনি জেলে এসেছেন বাড়ির কাউকে না বলে। আজ বাদে কাল যার বিয়ে হবে, সটান সে কয়েদগাড়ীতে উঠে চলে এসেছে ভাবী স্ত্রীর ফটো পকেটে নিয়ে।'' (যখন রাস্তাই একমাত্র রাস্তা/নারদের ডায়েরি)।

এই রিপোর্টাজধর্মী লেখাগুলি সম্পর্কে সুভাষ মুখোপাধ্যায় গদ্যসংগ্রহের প্রথম খন্ডের ভূমিকা অংশে লিখেছেন — ''গ্রামাঞ্চল আর শিল্পাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে পার্টির কাগজে সেই সময় কয়েকটা রিপোর্টাজ লিখেছিলাম। জেল থেকে বেরিয়ে বন্ধু দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তাড়নায় ছোটদের কথা মনে রেখে কিছু কিছু সেই রিপোর্টাজের অন্তর্বস্তু নিয়ে 'রংমশালের জন্যে', 'আমার বাংলা' লিখি।'' সেই

সাংবাদিকতা ও ডায়েরিধর্মীতার নিদর্শন পাই তাঁর 'ক্ষমা নেই' শীর্ষক গ্রন্থটিতে। তাঁর গদ্য সংগ্রহের ভূমিকা অংশে তিনি 'ক্ষমা নেই' গ্রন্থটি সম্পর্কে লিখেছেন — ''বাংলাদেশের যশোর-খুলনায় মুক্তিযুদ্ধের শেষপদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে লেখা 'ক্ষমা নেই'। তখনকার তাৎক্ষণিক ক্রোধ এতদিনের ব্যবধানে কারো কারো কর্কষ লাগতে পারে। লেখক এক্ষনে নিরুপায়। আজকের মন দিয়ে সেদিনের মনের অবস্থা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।'' কবি বন্ধু হিমাচলবাসী শের জঙ্গকে উৎসর্গ করে গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে, প্রকাশক প্রসুন বসু, ৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কোলকাতা ৯ থেকে। প্রকাশকালে এই গ্রন্থে গদ্য ছিল আটটি। সেগুলি হল — 'সকালের অপেক্ষায়', 'ক্ষমা ? ক্ষমা নেই', 'এক নির্দয় দয়েল পাখি', 'ভয় নেই', 'এইবার হাসি ফুটুক', 'ভাই জাহির রায়হান', ' দুই টিল, এক পাখি' এবং 'অপুতপু কে'। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ প্রথম খন্ডের গ্রন্থপরিচয় অংশে 'ক্ষমা নেই' গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখা হয়েছে — ''বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আর পাঁচজন সচেতন বুদ্ধিজীবীর মতই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সঙ্গত কারণে মুক্তিকামী মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ে বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান)-এর বেশ কিছু লেখক, শিল্পী, কবি কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ ভাব বিনিময়ও হয়েছিল সে সময়ে। এই মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই তিনি সদ্যমুক্ত বাংলাদেশে গিয়ে যা দেখেছিলেন তারই লেখচিত্র তুলে ধরেন 'আনন্দ বাজারে'র পাতায়, ধারাবাহিক কয়েকটি রচনায়। তখন একদিকে মুক্তিকামী গরিষ্ঠ মানুষ আর অন্যদিকে মিলিটারি ও তার অনুগৃহীতদের জান্তব দাপট, এটাই ছিল মুক্তিপূর্ব বাংলাদেশের ইতিহাস। এই সংগ্রাম ও তাকে দাবিয়ে দেবার জন্য নিষ্ঠুরতম নির্যাতন চালানো হয়। এমনকি নির্বিচারে গণহত্যাও চলে। যুদ্ধ, হিংসা আর লোভ মানুষকে পশুত্বের কোন নিম্নতম স্তরে যে পৌছে দেয় তা দেখলেন সুভাষ। তাঁর মানবতাবাদী মন— ক্রোধ আর ঘৃণায় জ্বলে উঠল।''

গদ্য শিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনাধর্ম প্রায়ই তাঁকে বিতর্কিত করে তুলেছিল। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন — ''কোনো কাগজের লোক হলে একটা হোল্লে হয়ত হয়র যেত। কিন্তু কাগজের রাজ্যে আমি নাম কাটা সেপাই। কাজেই আমার সামনে কোনো সোজা পথ খোলা ছিল না।'' (সকালের অপেক্ষায়/ক্ষমা নেই)। ক্রমে তার চাক্ষুস দেখা মুক্তিযুদ্ধের অনেক ছবি নানা কথা নিজের ভ্রমণ কথা ও ডায়েরিতে জায়গা পেয়েছে। তার রিপোর্টাজধর্মী রচনায় আমরা দেখি মুক্তি যোদ্ধার

বিরুদ্ধে ও বাংলাদেশের নরনারীর ওপর পাকসেনার অমানবিক অত্যাচারের চিত্ররূপ। লেখক লিখেছিলেন - গাঁয়ের সমস্ত মেয়ে পুরুষকে কুলিয়া ব্রিজের তলায় নিয়ে গিয়ে নৌকোয় বসিয়ে পাক ফৌজ ছবি তুলে কাগজে ছেপেছিলেন এই বলে যে, রিফিউজির দল আবার সব গ্রামে ফিরে আসছে। কিন্তু এই সাজানো রিফিউজিরাও সেদিন সবাই তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারেনি। পরে পাক ফৌজের হাতে পড়া সেদিনের নিখোঁজ পাঁচটি মেয়ের লাশ নদীর জলে ভেসে উঠতে দেখা গিয়েছিল।'' (সকালের অপেক্ষায়/ক্ষমা নেই)। পাকিস্তানী সেনারা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর শারিরীক নিগরহ ও পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে ছিল সেদিন। সেই অত্যাচারের বর্ণনা লেখকের দরদী হৃদয়ে ব্যাথিত করেছিল - ''একজন তার শার্টের বোতাম খুলে ডান কাঁধের দিকে কন্টার হাড়ের কাছটা দেখান। ডুমো ডুমো হওয়া ক্ষতবিক্ষত দাগ। ঘা এখনও পুরো শুকোয়নি। তার পাকিয়ে যাওয়া দুর্বল শরীরটার দিকে তাকিয়ে বর মায়া লাগছিল।'' (এক নির্দয় দয়েল পাখী/ক্ষমা নেই)।

একজন শিল্পীর লেখায় ক্ষমার অযোগ্য অসহিষ্ণু হয়ে ওঠা বিষয়কে অনেকেই অন্যায় বলে শিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে ভৎসনা করেছিলেন। ২২-১২-১৯৭১ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের ওপর চরম অমানবিক পৈশাচিক ধর্ষনকারী, লুঠনকারী ও হত্যাকারীদের সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঙমা না ক্ষমা নেই রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচকদের মধ্যে মৈত্রেয়ী দেবী কলকাতা ১৯ - ১৯৭১ সালের ২৮শৈ ডিসেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় একজন শিল্পীর ক্ষমা না করার অসহিষ্ণুতা শিক্ষার অভাব সংস্কৃতির অভাব বলে সমালোচিত করেছিলেন। সেইসব সমালোচকদের উদ্দশ্যে লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষোভ - ''মশাইরা, যান। তাড়াতাড়ি গিয়ে গ্রাম শহর মাঠ ঘাট পুকুর খাল নর্দমা কুয়ো থেকে পচাগলা লাশ আর মাথার খুলি মড়ার হাড় চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলুন। পাড়ায় পাড়ায় মাঠ হয়ে যাওয়া জায়গাগুলোতে রাতারাতি বাড়ি তুলে ফেলুন। গাছে চড়ার লোক না পেয়ে ডাব খাওয়ার জন্যে পাক-ফৌজ যে গাছগুলো গোড়া কেটে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে গেছে, সেগুলো চটপট মাটিতে খাড়া করে দিন।'' (এইবার হাসি ফুটুক/ক্ষমা নেই)।

গদ্য শিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অসহিষ্ণুতার মূলে নিহিত তাঁর দায়বদ্ধ সামাজিক বোধ। সেই বোধে তাঁর রচনা হয়ে উঠেছিল সাংবাদিকতাপূর্ণ। তিনি লিখেছিলেন - ''এ পর্যন্ত আমি আমার একটা লেখাতেও বাংলাদেশে হত্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর এক সত্যের কথা বলিনি। তার কারন, লিখতে গিয়ে

লজ্জায় আমার কলম থেমে গেছে। পৃথিবীতে আর কোনো সৈন্যবাহিনী, এমনকি নাৎসীরাও এমন ব্যাপক হাতে বাড়ি ঢুকে নারীধর্ষণ করেনি। শুধু ধর্ষণ নয়, ধর্ষণের পর হত্যা। ধর্ষণের পর সবাইকে মেরেছে তা নয়। বড় একটা দলকে ক্যান্টনমেন্টে রেখে তারা নিজেদের বেশ্যালয় খুলেছিল। বেশ্যাদেরও চলাফেরার স্বাধীনতা থাকে, এরা ছিল খাঁচায় বন্দী। ..... পাক ফৌজ ধর্ষণ করে মৃত মনে করে যাদের ফেলে রেখে গিয়েছিল, পরে তাদের অনেকেই অপমানে আত্মঘাতী হয়েছে। আজও বেঁচে আছে এমন ধর্ষিতা মেয়ের সংখ্যাও কম নয়। .....। ত মেয়ে মরেনি, কিন্তু বাড়িতে মুখ দেখাতে পারবে না বলে দূরে কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।'' (এইবার হাসি ফুটুক/ক্ষমা নেই)। এই পাশবিক অত্যাচারীদের প্রতি সহিষ্ণু ও নমনীয় না হবার মধ্যে লেখকের সত্যবোধ সচেতন শিল্পী সত্ত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতারই পরিচয় হয়ে ওঠে বলে আমরা মনে করি। তাঁর লেখায় সাংবাদিকতা ধর্মের সঙ্গে আমরা শৈলীতে ডায়েরি ধর্মিতার নিদর্শন পাই ক্ষমা নেই গ্রন্থে - ''মাঠে মাঠে ছড়ানো বীভৎস মৃত্যুর মিছিল দেখার পর যশোরে অবাঙালীদের বসতি নিউটাউনের পাশদিয়ে আসছিলাম। দু-পাশে খাঁ খাঁ করছে বাড়ি।'' (ভয় নেই/ক্ষমা নেই)। ব্যক্য বিন্যাস শব্দচয়ন ও বর্ণনা ভঙ্গিমায় আমরা তাঁর ডায়েরিধর্মি রচনার শিল্পরুপের আভাষ পাই। সেই সঙ্গে এইসব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সহায়ক হয়ে উঠেছিল তার ভ্রমণ পিপাসা। সেই ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কছায় লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন - ''বাসে আসতে আসতে দেখলাম হাজার হাজার শরণার্থী নদীর ধারে সারবাঁধা নৌকোয় রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায়। আর তাদেরই ঘরের মানুষেরা বাংলাদেশের মাঠে মাঠে রাত জেগে আগুনের মুখে ঘনিয়ে আনছে স্বাধীনতার নতুন দিন।'' (সকালের অপেক্ষায়/ক্ষমা নেই)।

গ) অন্যান্য গদ্য গ্রন্থ ও অগন্থিত রচনা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভূতের বেগার , আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন , অক্ষরে অক্ষরে , কথার কথায় , দেশ বিদেশের রূপকথায় এবং বিভিন্ন অনুবাদ গ্রন্থছ এবং কিছু অগ্রন্থিত কবিতা , আখ্যান , গল্প ও নিবন্ধ সাহিত্য তাঁর গদ্য সাহিত্যের ভান্ডারকে বৈচিত্র ও প্রাচুর্যে পূর্ণ করে তুলেছে । তাঁর গদ্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে ছোটদের জন্য লেখা রচনাগুলি হল 'বাঙালীর ইতিহাস' (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯, বুক ওআর্ল্ড লিমিটেড, কলকাতা), 'অক্ষরে অক্ষরে' (প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর ১৯৫৪, স্বাক্ষর, কলকাতা ২০), ' কথার কথা' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, স্বাক্ষর, কলকাতা ২০) 'জগদীশ চন্দ্র বসু' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, স্বাক্ষর, কলকাতা ২০), 'দেশ বিদেশের রূপকথা' (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, প্রকাশ ভবন, কলকাতা ১২), 'রূপকথার ঝুড়ি'(প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, ওবিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা ৯) ইত্যাদি।এছাড়া তাঁর গদ্য সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম হল 'রুশ গল্প সঞ্চয়ন' (প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৬৩, ন্যাশনাল বুক এ জেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ১৩); 'ইভান দেশি সোভিচের জীবনের একদিন' (প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৬৫, ডি এম লাইব্রেরী কলকতা ৬) 'তমস' (প্রথম প্রকাশ মে ১৯৮৮ সাক্ষরতা প্রকাশনী কলকাতা ৯) ইত্যাদি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় এর আগে 'জনযুদ্ধ' এবং 'স্বাধীনতা' পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে গদ্যরচনায় সমাজ সত্যের ছবি নিয়ে গদ্যশিল্পে ক্রমশ: পরিণত হয়ে উঠেছিলেন । এর মধ্যে ১৯৪৪ সালে 'গণনাট্য সংঘ'-এ নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য নাট্যসাহিত্যেও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন । রিপোর্টার সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলার অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতিবাদী ও প্রতিরোধমুখী সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়েছিলেন তাঁর লেখনীতে । ১৯৪২ সালের ১৫ই জুলাই তিনি 'জনযুদ্ধে' প্রকাশ করেছিলেন তাঁর প্রথম গদ্যরচনা --''জাপানকে রোখা চাই । চীন ভারত ভাই - ভাই'' । এই পত্রিকায় ১৯৪৩ সালের ২৮শে জুলাই বাংলার মানুষকে জ্ঞাত করেছিলেন — ''বর্দ্ধমানের ভয়াবহ বন্যায় হাজার হাজার নরনারী বিপন্ন '' শীর্ষক গদ্য রচনায় । এর পরের বছর 'জনযুদ্ধে' লিখেছিলেন তাঁর গদ্যরচনা —''বিক্রমপুরের বুকে সংকটের ছায়া , জমি ও জাত ব্যবসা হারাইয়া লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী আজ নি:স্ব '' (১৯৪৪ সালের ১৪ই জুন) । এই পত্রিকায় এই বছরের ৮ই নভেম্বর তিনি প্রকাশ করেছিলেন — '' বাংলার বিস্মৃত বন্দীরা'' এবং ''কলের কলকাতা'' শীর্ষক গদ্য রচনা । এই গদ্যরচনাগুলির শীর্ষনামেই আমরা তাঁর গদ্যরচনার উদ্দেশ্যমুলকতা উপলব্ধি করতে পারি । সাংবাদিক হিসেবে কাজ করার সঙ্গে তাঁর সাহিত্য জীবনের সম্পর্কের স্বীকৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন — ''আমি বলেছিলাম কাগজ কীভাবে আমাকে গ্রামশহরের সাধারণ মানুষের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল । সেখানে শুধু যে নন্দনতত্ত্বের মূলসূত্র খুঁজে পেয়েছিলাম তাই নয় — বাংলা ভাষার প্রাণপুরুষেরও সন্ধান পেয়েছিলাম ।

পার্টির কাগজে কাজ করার সুবিধে অসুবিধে দুটোই আছে । সবচেয়ে বড় সুবিধে , সাধারণ লোকের কাছে নিজেকে বাইরের মানুষ বলে মনে হয় না । তারাও বিশ্বাস করে নিজেদের মনের কথা খুলে বলে ।'' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ , প্রথম খণ্ড , দে'জ পাবলিশিং , কল -৭৩ , প্রথম

প্রকাশ , পৃষ্ঠা ৫৪৪) । সংবাদ পত্রে কাজ করার সুবাদে তিনি অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন । আবার কাগজের সাংবাদিকতার সূত্রে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে বাংলার মানুষের বন্যা - খরা - মহামারি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন — ''সেই প্রথম বন্যা দেখলাম । আমি আর সুনীল জানা । আমি গিয়েছি খবর আনতে , সুনীল জানা ফটো তুলতে । সাংবাদিকতায় দুজনেরই প্রথম হাতেখড়ি । সঙ্গে রাস্তা বাতলাবার জন্যে আছেন ডাক্তার শরদীশ রায় । যেতে হবে আরও মাইল চার - পাঁচ দূরে । একেবারে হানার মুখে । মওকা বুঝে নৌকো জুটেছে অনেক । তিনগুণ চারগুণ ভাড়া । পকেটে আমাদের যা রেস্ত — তাতে শুধু যাওয়াই যায় , ফেরা যায় না ।'' (দীপঙ্করের দেশে , আমার বাংলা , ঈগল পাবলিশার্স , প্রথম প্রকাশ , পৃষ্ঠা ২৩) । আবার তিনি লিখেছেন — ''.....পুরু চার বাঁধের কাছে বসে সেই পুরনো দিনটার কথা ভাবতে ভাবতে একমাত্র আস্ত জানা গান 'বাঁধ ভেঙে দাও , বাঁধ ভেঙে দাও , ভা—ঙো' গাইছি , এমন সময় পিঠের ওপর একটা প্রচণ্ড কিল পড়ল । ফিরে তাকিয়ে দেখি বিজন ভট্টাচার্য, সঙ্গে শম্ভু মিত্র।'' (দীপঙ্করের দেশে , আমার বাংলা , ঈগল পাবলিশার্স , প্রথম প্রকাশ , পৃষ্ঠা ২৫) ।

গদ্যশিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণ পিপাসু মন নিয়ে গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে ফিরে রচিত রিপোর্টাজধর্মী প্রবন্ধ গ্রন্থ 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' । তাঁর এই ধরণের গদ্য নির্মাণের প্রকৃতি সম্বন্ধে গদ্য সংগ্রহের প্রথম খণ্ডের 'গ্রন্থপরিচয়' শীর্ষক অংশে লেখা হয়েছে --''একালের বাঙালি লেখক কবিদের মধ্যে গোটা বাংলার গ্রামজীবনের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয়ই সব চেয়ে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ বললে হয়তো আত্যুক্তি হবে না । চল্লিশের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তাঁকে বার বার সাড়া দিতে হয়েছে ডাকবাংলার ডাকে । এবং যা তিনি দেখেছেন , শুনেছেন , অনুভব করেছেন তারই ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অনবদ্য ভাষায় । 'আমার বাংলা' থেকে 'আবার ডাকবাংলার ডাকে'-এ পর্যন্ত প্রকাশিত এই ছ'টি গ্রন্থে গ্রন্থিত এই নিবন্ধমালা সংখ্যায় ৭০ । এছাড়া অগ্রন্থিত রয়েছে এরকম আরো অসংখ্য রচনা । এইসব রচনা সাধারণভাবে 'রিপোর্টাস' নামেই পরিচিতি পেয়েছে । ..... সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একান্তভাবে নিজস্ব , সহজ , সবলীল ও চিত্ররূপময় গদ্যরীতির সঙ্গে একাকার হয়ে আছে তাঁর অনুভবী মন , গভীর জীবনানুরাগ আর দৃঢ়প্রত্যয় পদযাত্রার অন্তরঙ্গ পরিচয় । তাই গত চল্লিশ বেশি সময় ধরে তিনি যে অসংখ্য 'রিপোর্টাজ' লিখলেন তা শুধুমাত্র 'রিপোর্টাজ' না থেকে হয়ে উঠল এক গভীর মানবিক উচ্চারণ যা বাংলা গদ্যসাহিত্যেরও অনন্য সম্পদ ।''

এই গদ্য গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৯৮১ সালে । প্রকাশক এ. চক্রবর্তী চলতি দুনিয়া প্রকাশনী থেকে এই গ্রন্থটির প্রকাশ করেছিলেন । প্রকাশকালে নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়কে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এই গ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন । আলোচ্য গ্রন্থের নিবন্ধের সংখ্যা কুড়িটি -- 'যাচ্ছি বনগাঁয়' , 'এবার বনগাঁয় গিয়ে', 'হালছাড়া শহর', 'অপুদুর্গার জগৎ' , 'দেখার মত বর্ডার' , 'কাছেই বজবজ' , 'বজবজের অসুখ' , 'আগে ছিল বাহান্ন বাজার' , 'আগে ছিল জঙ্গল মহল' 'উপরে কাঁটা নিচে কাটা ,' 'মাটির কাজ মাটি না হয় ' , ' নদেয় এল বান ' , 'সুতোর জট জঙ্গলে ' , অথ বাঘ - ছাগল কথা ' , ' মরা ডালে ফুল ' , ' নাম রেখেছি নবজীবনপুর ' , 'পৌষ পেরিয়ে ' , 'এক যাত্রায় ' , 'ভূবননগর এড়িয়ে ' এবং 'তামাম শোধ', আলোচ্য নিবন্ধগুলির বিষয় সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব উক্তি -- ''তারপর দেশ ভাগ হয়ে দেশ স্বাধীন হল। দেখা জায়গাগুলো অনেকদিন পরে নতুন করে দেখব মনে মনে ইচ্ছে ছিল । কিন্তু দেশ আর কালের পাঁচিল পেরোতে পারিনি।

'আনন্দবাজারে' যখন 'ডাকবাংলার ডায়েরি' শুরু করি , তখন আমার ইচ্ছে ছিল একটাই। প্রত্যেকটা জেলারি একটা-দুটো অঞ্চলে যাব। দেখার চেষ্টা করব স্বাধীনতার পর কোথায় কতটা কী বদলেছে। পুরোপুরি না হলেও , সে ইচ্ছে খনিকটা পূরণ করেছিলাম।'' (যাচ্ছি বনগাঁয় / আবার ডাকবাংলার ডাকে)। অনেকদিন পর আবার বনগাঁয় গিয়ে সেখানকার জনজীবনের পরিবর্তনের প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন প্রাবন্ধিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় । তাঁর দৃষ্টিতে বনগাঁর রেললাইনের দুপাশে আগে ছিল জঙ্গল। সেখানে লোকালয় ছিল খুব কম। সেসময় প্রত্যেক স্টেশনে অপেক্ষারত যান বলতে ছিল গরুর গাড়ি। সেখানকার বদলে যাওয়া জীবনের কথায় তিনি লিখেছেন -- ''এখন দুপাশে একটানা লোকালয়। জঙ্গলের বদলে ফসলের মাঠ। এর প্রায় সবটা জুড়েই এখন পূর্ববাংলা থেকে আসা মানুষের বাস। আজ আর তাদের ছিন্নমূল বলা যায় না। নিজেদের তারা রোপণ করেছে নতুন জমিতে । গোটা এলাকা জুড়ে শুধু তাদের ঘরবন্ধন নয় , রক্তেরও সম্বন্ধ।'' (যাচ্ছি বনগাঁয় / আবার ডাকবাংলার ডাকে)। তিনি অসাধারণ পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিতে বনগাঁর জনজীবনের উন্নতি প্রত্যক্ষ করেছেন। সেখানকার উন্নয়নের কথায় তিনি বলেছেন --''দেখলাম বাড়িতে গোবর গ্যাসের প্ল্যান্ট বসছে। ফেরার সময় রাস্তায় ফটো তোলা হল। গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে তার ছবি। ভূমিহীনেরা বাস্তু পেয়েছে ,জমি পাচ্ছে সেচের জল , গ্রামে তৈরী হয়েছে স্বাস্থ্য কেন্দ্র।'' (এবার বনগাঁয় গিয়ে / আবার ডাকবাংলার ডাকে)। 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' নিবন্ধ গ্রন্থে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হৃদয়ে সাংবাদিকতার প্রখর দৃষ্টি সক্রিয় ছিল। সেই দৃষ্টিতে সকালের বৃহৎ সামাজিক ছবি তাঁর লেখায় বাঁধা পড়েছে --'' পাকিস্তান হওয়ার পর শুধু হিন্দু নয় , নিরাপত্তার অভাবে খ্রিষ্টানরাও দল বেঁধে চলে এসেছিল। বনগাঁ শহরে তো খ্রিষ্টানদের দুটো

আলাদা পাড়া গড়ে উঠেছে ।এক পাড়ায় ক্যাথলিক , অন্য পাড়ায় প্রোটেস্টান্ট। জাত ঠেলাঠেলির ব্যাপার এদের ভেতরেও আছে । একটু টোকা দিলেই ধরা পড়ে। যারা শুয়োর পালে , কাছিমের মাংস বেচে তাঁদের সম্পর্কে বলা হয় ওরা এসেছে নিচু জাত থেকে তাদের আলাদা গির্জা । নইলে এখানকার দেশী খ্রিষ্টানেরা সবাই গরীব । হয় রিক্শা চালায় , নয় জন খাটে ।'' (দেখার মত বর্ডার / আবার ডাকবাংলার ডাকে) । এই গদ্যের শৈলিতে ডায়িরিধর্মিতা অসাধারণ শিল্পদক্ষতায় তিনি রচনার অঙ্গ করে তুলেছেন । এই রচনাধর্মীর ভঙিমার কথায় বর্ণনাত্মক রীতিতে তিনি লিখেছেন --'' বসে বসে ওদের তীর ধনুকে আমরা হাতের টিপ পরীক্ষা করলাম । বুড়ো হাড়ে ভেলকি খেলা দেখালেন সরোজ বাবু । দেখলাম লক্ষ্যভেদে একেবারে অব্যর্থ ।

রাত্তিরে যখন গড়বেতায় ফিরলাম মাঠঘাট ঘরদুয়োর ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার জোয়ারে । অনেক রাত অবধি ঠান্ডার ভয়ে ঘর বন্ধ করে ছোট সরোজের কাছে শুনলাম একানকার জেলখানার গল্প ।'' (আগে ছিল জঙ্গলমহাল / আবার ডাকবাংলার ডাকে) । এই নিবন্ধগ্রন্থে লেখক পারিপার্শ্বিক অবস্থান , সামাজিক রীতিনীতি , নৈসর্গিক ও প্রাকৃতিক পরিমন্ডল সমাজমানুষের জীবনযাত্রার ক্রমপরিবর্তনের প্রকৃতি সমাজতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে সাহিত্যের বিষয় করে তুলেছেন । যা বাংলা নিবন্ধসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হয়ে উঠেছে । এছাড়াও এই গ্রন্থটিতে তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থান ও সেখানকার মানুষের কথাকে বিষয় নির্বাচন করেছেন । সেই বিষয় বর্ণনায় বিচক্ষণতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি যুক্ত করেছেন বনগাঁ , জঙ্গমহল , গরবেতা , বেলেডাঙা , বজবজ , চন্দ্রকোণা , শান্তিপুর , গৌরীপুর , খেজুরডাঙা প্রভৃতি স্থান ভ্রমণের বিভিন্ন কাহিনী ।

'আবার ডাকবাংলার ডাকে ' গ্রন্থের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ হল ' নাম রেখেছি নবজীবনপুর ' শিরোনামাঙ্কিত নিবন্ধটি । এই নিবন্ধে আমরা তাঁর আন্যতম 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ 'উপন্যাস সৃষ্টির সূত্রটি পাই । এই নবজীবনপুরের কুষ্ঠরোগীদের আরোগ্যনিকেতন যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল , সেই মহৎপ্রাণ সুকুমার সেনগুপ্ত ও শেফালী সেনগুপ্তকেই উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছিলেন ঔপন্যাসিক। আলোচ্য নিবন্ধটিতে আমরা দেখি বাঁকুড়ার গৌরীপুর কুষ্ঠ হাসপতাল এবং খেজুরডাঙার আরোগ্যনিকেতন তিনি ঘুরেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতায় লেখক সেখানকার অর্ধেকমানুষের জীবনকে উপন্যাসের বিষয় করে তুলেছেন। ''জনযুদ্ধ' পত্রিকায় সাংবাদিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেসব রিপোর্টাজধর্মী নিবন্ধ লিখেছিলেন, সেগুলিতে তাঁর মহৎকর্মপরয়াস, জীবনদর্শন, সমাজভাবনা, দেশকাল সচেতন,জাতীয়তাবাদী ও ভ্রমণপিপাসু শিল্পীমানসের নিদর্শন পাই। আবার বিভিন্ন সময়ে 'জনযুদ্ধ'পত্রিকায় প্রকাশিত আমরা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ পাই । সেগুলি হল -' জাপানকে রোখা চাই

!চীন ভারত ভাই ভাই '(১৫ই জুলাই ১৯৪২) , ' বর্দ্ধমানের ভয়াবহ বন্যায় হাজার হাজার নরনারী বিপন্ন ' (২৮শে জুলাই ১৯৪২) , 'অপরাজিত ' (৬ই অক্টো: ১৯৪৩) , বিক্রমপুরের বুকে সংকটের ছায়া / জমি ও জাত- ব্যাবসা হারাইয়া লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী আজ নি:স্ব '(১৪ই জুন ১৯৪৪) , কয়লা উৎপাদনে ঘাটতি কেন ? / আসানসোলে কয়লা মজুরের হালচাল ' (১৪ই জুন ১৯৪৪) , 'চাটগাঁয়ের কবিওয়ালা' (২২শে সেপ্টে: ১৯৪৪) , 'বাংলার বিস্মৃত বন্দীরা ' (৮ই নভে: ১৯৪৪) , 'লাইন / চটকল মজুরের জীবন চিত্র '(৮ই নভে : ১৯৪৪) , ' চালের দর পড়তে আমার ক্ষতি কিন্তু সমাজের মঙ্গল হবে '/ -ঘাটতি জেলা ২৪ পরগণার স্বচ্ছল চাষীর উক্তি ' (১৯শে নভে : ১৯৪৪) ।এই নিবন্ধগুলিতে লেখকের হৃদয়ের তীব্র অনুভূতি দিয়ে অঙ্কিত সামাজিক ছবি সমকালের সাহিত্যের দলিল হয়ে রয়েছে । বাংলার সমাজ ইতিহাসে এগুলির গুরুত্ব অনন্য সাধারণ । এই নিবন্ধগুলির বিষয়-আঙ্গিক ও ভাবপ্রকাশের ভঙিমায় আমরা ছোট গল্পের বিভিন্ন শর্তের আভাষ পাই । প্রচলিত ছোটগল্প না লিখলেও , সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় পাঠকের ছোটগল্প পাঠের রস তৃপ্তির চাহিদা মেটাতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর প্রবন্ধগুলিতে বিভিন্ন টুকরো কাহিনী যুক্তকরে ।

গদ্যশিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সৃজনীধারায় দেশ-কাল-জাতপাত-স্থান-বয়স প্রভৃতি গন্ডী উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন । তাঁর বিভিন্ন গদ্য নিবন্ধ গ্রন্থ বাংলার সর্বস্তরের পাঠকের অসাধারণ জনপ্রিয়তা আদায়ে সমর্থ হয়েছে । শিশু -কিশোরদের কচিমনে সৃষ্টিস্বাদ ঢেলে দেবার জন্যে তিনি 'অক্ষরে অক্ষরে ' গদ্য-নিবন্ধ গ্রন্থটি লিখেছিলেন । প্রকাশক সুধংশুশেখর দে কলকাতা দে'জ পাবলিশিং থেকে১৯৫৪ সালে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন । এর উৎসর্গ অংশে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন - '' যারা দুনিয়াকে জেনে দুনিয়াকে বদলাবে / যারা আলো জ্বেলে অন্ধকার তাড়াবে / নতুন ভবিষ্যৎ মুঠোয় আনবে / আমাদের দেশের সেই ছোটো ছোটো / হেলে মেয়েদের / উদ্দেশে '' । এর বিষয় সূচিতে আমরা পাই -- 'ভাষা' , 'সবকিছুর গোড়ায় ', 'ছিরি -ছাঁদ' 'নকল থেকে নাচ', 'গান বাজনা', 'পালা বদলের পালা' ,'যম - নিয়তি যক্ষ' এবং 'পালট পুরাণ' । ছোট কিশোর-কিশোরীর বৌদ্ধিক বিকাশে এই গ্রন্থের মুল্য অসাধারণ । এই গ্রন্থ সৃষ্টির লক্ষ্য ছোটোরা হলেও এর শিল্পগুণ অনেক উঁচুদরের । এতে ছোটোদের মানসিক চাহিদা পূরণ , গ্রন্থ পাঠের সময় তাদের আগ্রহ ও আকর্ষণ বজায় রাখা , বাক্য বিন্যাস , ভাষা প্রয়োগ ও নানা মজাদার কাহিনী যুক্তকরার ক্ষেত্রে লেখক অত্যন্ত সচেতন শিল্পীসত্ত্বার পরিচয় দিয়েছেন । ভাষা , ভাব , কথা , কাজ , শব্দ , অর্থ , চিহ্ন , ছবি , লেখা , লিপি , হরফ , সৌন্দর্য , ছন্দ, নৃত্য , সঙ্গীত , সুর , জগৎ , জীবন , মৃত্যু প্রভৃতি গুরু-গম্ভীর বিষয়কে লেখকন অত্যন্ত দক্ষতার

অক্ষরে অক্ষরে গ্রন্থটিতে তাঁর রচনাভঙ্গির সারল্যে ছোটদের উপযোগী ও আর্কষণীয় করে তুলেছিলেন। এই গ্রন্থে লেখক 'ভাষা'র মতো একটি বিজ্ঞাননির্ভর বিষয় সম্পর্কে লেখক লিখেছেন --'' ফুস্‌ফুসের হাওয়াটাকে গলা , জিভ , টাক্‌রা , দাঁত , ঠোঁট-মুখের ভেতর নানা জায়গায় খেলিয়ে মানুষ যতো রকমের খুশি আওয়াজ করতে পারে । হাত জোড়া থাকলেও মুখে আওয়াজ করতে কোনোই বাধা নেই ।

তাহলে দেখে যাচ্ছে , ইশারা করার চেয়ে আওয়াজ করলে সব দিক থেকেই জানাবার সুবিধে। আওয়াজ করে জানাবার নামই হলো ভাষা ।'' (হাতে নয় , মুখে / ভাষা / অক্ষরে অক্ষরে)।

এই গ্রন্থটিতে লেখক বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নানা ছড়া যুক্ত করে বিষয়কে আকর্ষণীয় করেছেন। তাঁর রচনার নিপুণ দক্ষতায় গভীর তাত্ত্বিক বিষয় হয়ে উঠেছে গ্রহণযোগ্য ও সরল -- '' তুঁষ , গোবর আর খড়কুটো একসঙ্গে মেখে আগুনে পুড়িয়ে তারপর জলে ভাসাতে হবে । আর সেই সঙ্গে আছে ছড়া : কুলকুলনি এয়োরানী , মাঘমাসে শীতল পানি ।

শীতল শীতল ধাই লো , বড়গঙ্গা নাই লো
শীতল শীতল জাগে , রাই বিয়ে মাগে ।
আমাদের রায়ের বিয়ে ঝাম-কুর-কুর দিয়ে ।।

তোষলার সরায় করে মৃত্যুর যে কুশপুত্তলিকা জলে ভাসানো হচ্ছে , সেটা আসলে সারমাটি -- যা নতুন ফসল ফলাবে । মৃত্যুর মধ্যেই আছে জীবন । সূর্যের নাম করে সবটাই আসলে ফসলের ক্রিয়াকর্ম । সে যুগে মানুষ মনে করতো বীজ রোয়া মানেই হলো বীজটার মৃত্যু হওয়া -- বীজটাকে মাটির নিচে কবর দেওয়া । সেই বীজ থেকে উঠবে অঙ্কুর । মৃত্যু থেকে জীবন । শীত হলো মৃত্যু , বসন্ত জীবন ।'' (মৃত্যু থেকে জীবন / পালাবদলের পালা / অক্ষরে অক্ষরে । এই গ্রন্থটি বাংলা শিশু-সাহিত্যের ধারায় একটি মূল্যবান সম্পদ ।

সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ হল জীবনী সাহিত্য । জীবনী সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম হল মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জীবনী নিয়ে রচিত 'ভারত স্বাধীন হল' , নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনী নিয়ে রচিত 'ব্যাঘ্রকেতন' , বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনী নিয়ে রচিত গ্রন্থ 'জগদীশচন্দ্র বসু' , তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ , 'ঢোলগোবিন্দের আত্মদর্শন' এবং 'ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই' প্রভৃতি । এই জীবনীমূলক ও আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থগুলিতে আমরা

তাঁর সত্যনিষ্ঠা , জাতীয়তা বোধ । ইতিহাস চেতনা , বিজ্ঞানচেতনা , স্বদেশপ্রেম , সমকাল ভাবনা ও সমাজভাবনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাই ।

উল্লেখিত গদ্যসাহিত্য নিবন্ধগুলিতে তাঁর বাংলা ভাষা সাহিত্যের প্রতি দায়বদ্ধ চেতনা ও মননশীল বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় আমরা পাই । এগুলির মধ্যে 'জগদীশচন্দ্র বসু' গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৫৫-স্বাক্ষর-কলকাতা ২০ থেকে প্রকাশ , 'ব্যাঘ্রকেতন'-এর প্রকাশ কাল ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ -- এলাইড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড -- কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত , 'ঢোলগোবিন্দের আত্মদর্শন' -- জুলাই ১৯৮৭ -- অরুণা প্রকাশনী -- কলকাতা ৬ থেকে প্রকাশিত , 'ভারত স্বাধীন হল' -- পূর্ণাঙ্গ বাংলা সংস্করণের প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯ -- ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড -- কলকাতা ৭২ থেকে প্রকাশিত , এবং 'ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই' -- জানু : ১৯৯৪ আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত ।

এগুলির মধ্যে তাঁর 'ভারত স্বাধীন হল' গ্রন্থটি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে 'বন্ধু ও কমরেড' সম্বোধনে উৎসর্গ করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় । গ্রন্থটির কেন্দ্রীয় বিষয় স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মৌলনা আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) । আজাদ উর্দূ সাপ্তাহিক 'আল-হিলাল' (১৯১২) এবং 'আল-বালঘ' (১৯১৫) পত্রিকা প্রকাশ করেন । ১৯১৬তে তাঁকে কলকাতা , বোম্বাই , পাঞ্জাব , দিল্লী , উত্তরপ্রদেশ প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলে ১৯২০ সাল পর্যন্ত রাঁচীতে অন্তরীন থাকেন । ১৯২১ সালে ভারত খিলাফত কমিটির সভাপতি , ১৯২৮ সালে জাতীয় মুসলিম অধিবেশনের সভাপতি , ১৯২৩ ও ১৯৪০ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন । আবার ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এই ভূমিকা পালন করেন ।

তাঁর মহৎ জীবনী নিয়ে ইংরেজিতে তার জীবনালেখ্য রচনা করেন কবি-সাহিত্যিক হুমায়ুন কবীর । সেই জীবনীর সরল ও সুপাঠ্য বাংলা অনুবাদ করেন শিল্পী-সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় । এই গ্রন্থে তিনি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক সত্য রহস্য এই গ্রন্থো উন্মোচিত করেছেন । গ্রন্থের পূর্বাভাষ , উত্তরভাগ , পরিশিষ্ঠ ও নির্ঘন্ট ছাড়া মোট ষোলটি অধ্যায়ের আবুল কালাম আজাদের জীবনালেখ্য অনুবাদ করেছিলেন । সেগুলির শীর্ষনাম হল (১) সরকারে কংগ্রেস (২) ইউরোপে যুদ্ধ (৩) আমি কংগ্রেস সভাপতি হলাম (৪) একটি চীনা গর্ভনাটিকা (৫) ক্রিপস মিশন (৬)অস্বস্তিকর বিরতি (৭) ভারত ছাড় (৮) আমেদনগর কোর্ট জেল (৯) সিমলা সম্মেলন (১০) সাধারণ নির্বাচন (১১) ব্রিটিশ কেবিনেট মিশন

(১২) পাকিস্তানের প্রস্তাবন (১৩) অন্তর্বর্তী সরকার (১৪) মাউন্টব্যাটেন মিশন (১৫) একটি স্বপ্নের সমাধি এবং (১৬) বিভক্ত ভারত ।

এই গ্রন্থে ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনা এবং ব্যক্তি মৌলানা আবুল কালামের জীবনের ঐতিহাসিক নানা তথ্য আমরা পাই। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধানের প্রয়াস আলোচ্য গ্রন্থে পাই আমরা। এই গ্রন্থের কথক স্বয়ং আবুল কালাম আজাদ। তাঁর মুখে আমরা ভারতীয় জাতীয় রাজনীতির গোপন অলিন্দের নানা সত্যতা। ১৯৩৫ সালের 'ভারত সরকার আইন' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য -- ''কাজেই এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, এদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছে যে কংগ্রেস, সে এই বিধিব্যবস্থা মেনে নিতে চাইবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্যে প্রস্তাবিত ফেডারেশনের ধাঁচটিকে কংগ্রেস সঙ্গে সঙ্গে ধিক্কার জানিয়েছিল। প্রদেশের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ছক সম্পর্কেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বহুদিন ধরে বিরুদ্ধতা করেছে। কমিটির একটি শক্তিশালী অংশ এমন কি নির্বাচনে যোগ দেওয়ারও ঘোর বিরোধী ছিল। আমি একেবারেই ভিন্ন মত পোষণ করতাম। আমি বলেছিলাম নির্বাচন বয়কট করাটা ভুল কাজ হবে।'' (সরকারে কংগ্রেস / ভারত স্বাধীন হল) ।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে জাতীয় নেতাদের বিভিন্ন স্বতন্ত্র মতভেদ এই গ্রন্থে উঠে এসেছে । উঠে এসেছে আন্দোলন ও আন্দোলনকারীদের নানা উত্থান পতন । উঠে এসেছে অত্যাচার ও অত্যাচারীর দমন এবং এমনকি জাতির জনকেরও মর্মান্তিক হত্যালীলার সত্য স্বীকার -- '' ১৯৪৮ -এর ৩০শে জানুয়ারি দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে আমি গান্ধীজীর কাছে যাই । ..... গেটের কাছে গাড়ি থেকে নেমে আমি তাঁর বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম । বাড়ির সমস্ত দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল । বাড়ির একজন জানালার শার্সি দিয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে বেরিয়ে এসে ভেতরে নিয়ে গেল । ঢোকার মুখে একজন কাঁদতে কাঁদতে বলল , 'গান্ধীজীকে গুলি করেছে , এখনও তাঁর জ্ঞান ফেরেনি।' খবরটা এমনই শোচনীয় আর আচমকা যে , কথাগুলোর অর্থ আমার মাথায় কিছুই ঢুকল না । আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন অবস্থায় গান্ধীজীর ঘরের দিকে হেঁটে চললাম । দেখলাম মেঝের ওপর তিনি সটান পড়ে আছেন । তাঁর মুখ ফ্যাকাশে আর চোখদুটো বন্ধ । তাঁর দুই নাতি তাঁর পা দুটো ধরে থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে । স্বপ্নাচ্ছন্নতার মধ্যে আমি শুনলাম কেউ বলল , 'গান্ধীজী মারা গেছেন ।'

'ভারত স্বাধীন হল' গ্রন্থ বাংলা অনুবাদ সাহিত্য ও জীবনীসাহিত্যের ধারায় একটি অনন্য সাধারণ সম্পদ । এই গ্রন্থের অনন্যতার মধ্যে নিহিত রয়েছে মৌলানা আবুল কালামের মহৎ জীবন ,

সেই জীবনকে উপস্থাপনের ভাষা , বাক্য গঠন , সমকালের সামগ্রিক জাতীয় জীবনের বাস্তব সত্য নির্ভর মূল্যবান তথ্য প্রভৃতি ।

সাংবাদিকতার নিদর্শন পাই তাঁর 'ক্ষমা নেই' শীর্ষক গ্রন্থটিতে। তাঁর গদ্য সংগ্রহের ভূমিকা অংশে তিনি 'ক্ষমা নেই' গ্রন্থটি সম্পর্কে লিখেছেন — ''বাংলাদেশের যশোর-খুলনায় মুক্তিযুদ্ধের শেষপদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে লেখা 'ক্ষমা নেই'। তখনকার তাৎক্ষণিক ক্রোধ এতদিনের ব্যবধানে কারো কারো কর্কষ লাগতে পারে। লেখক এক্ষনে নিরুপায়। আজকের মন দিয়ে সেদিনের মনের অবস্থা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।'' কবি বন্ধু হিমাচলবাসী শের জঙ্গকে উৎসর্গ করে গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে, প্রকাশক প্রসুন বসু, ৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কোলকাতা ৯ থেকে। প্রকাশকালে এই গ্রন্থে গদ্য ছিল আটটি। সেগুলি হল — 'সকালের অপেক্ষায়', 'ক্ষমা ? ক্ষমা নেই', 'এক নির্দয় দয়েল পাখি', 'ভয় নেই', 'এইবার হাসি ফুটুক', 'ভাই জাহির রায়হান', ' দুই টিল, এক পাখি' এবং 'অপুতপু কে'। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ প্রথম খন্ডের গ্রন্থপরিচয় অংশে 'ক্ষমা নেই' গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখা হয়েছে — ''বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আর পাঁচজন সচেতন বুদ্ধিজীবীর মতই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সঙ্গত কারণে মুক্তিকামী মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ে বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান)-এর বেশ কিছু লেখক, শিল্পী, কবি কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ ভাব বিনিময়ও হয়েছিল সে সময়ে। এই মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই তিনি সদ্যমুক্ত বাংলাদেশে গিয়ে যা দেখেছিলেন তারই লেখচিত্র তুলে ধরেন 'আনন্দ বাজারে'র পাতায়, ধারাবাহিক কয়েকটি রচনায়। তখন একদিকে মুক্তিকামী গরিষ্ঠ মানুষ আর অন্যদিকে মিলিটারি ও তার অনুগৃহীতদের জান্তব দাপট, এটাই ছিল মুক্তিপূর্ব বাংলাদেশের ইতিহাস। এই সংগ্রাম ও তাকে দাবিয়ে দেবার জন্য নিষ্ঠুরতম নির্যাতন চালানো হয়। এমনকি নির্বিচারে গণহত্যাও চলে। যুদ্ধ, হিংসা আর লোভ মানুষকে পশুত্বের কোন নিম্নতম স্তরে যে পৌছে দেয় তা দেখলেন সুভাষ। তাঁর মানবতাবাদী মন— ক্রোধ আর ঘৃণায় জ্বলে উঠল।''

গদ্য শিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনাধর্ম প্রায়ই তাঁকে বিতর্কিত করে তুলেছিল। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন — ''কোনো কাগজের লোক হলে একটা হোল্লে হয়ত হয়র যেত। কিন্তু কাগজের রাজ্যে আমি নাম কাটা সেপাই। কাজেই আমার সামনে কোনো সোজা পথ খোলা ছিল না।''

(সকালের অপেক্ষায়/ক্ষমা নেই)। ক্রমে তার চাক্ষুস দেখা মুক্তিযুদ্ধের অনেক ছবি নানা কথা নিজের ভ্রমণ কথা ও ডায়েরিতে জায়গা পেয়েছে। তার রিপোর্টাজধর্মী রচনায় আমরা দেখি মুক্তি যোদ্ধার বিরুদ্ধে ও বাংলাদেশের নরনারীর ওপর পাকসেনার অমানবিক অত্যাচারের চিত্ররূপ। লেখক লিখেছিলেন - গাঁয়ের সমস্ত মেয়ে পুরুষকে কুলিয়া ব্রিজের তলায় নিয়ে গিয়ে নৌকোয় বসিয়ে পাক ফৌজ ছবি তুলে কাগজে ছেপেছিলেন এই বলে যে, রিফিউজির দল আবার সব গ্রামে ফিরে আসছে। কিন্তু এই সাজানো রিফিউজিরাও সেদিন সবাই তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারেনি। পরে পাক ফৌজের হাতে পড়া সেদিনের নিখোঁজ পাঁচটি মেয়ের লাশ নদীর জলে ভেসে উঠতে দেখা গিয়েছিল।'' (সকালের অপেক্ষায়/ক্ষমা নেই)। পাকিস্তানী সেনারা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর শারিরীক নিগরহ ও পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে ছিল সেদিন। সেই অত্যাচারের বর্ণনা লেখকের দরদী হৃদয়ে ব্যাথিত করেছিল - ''একজন তার শার্টের বোতাম খুলে ডান কাঁধের দিকে কন্টার হাড়ের কাছটা দেখান। ডুমো ডুমো হওয়া ক্ষতবিক্ষত দাগ। ঘা এখনও পুরো শুকোয়নি। তার পাকিয়ে যাওয়া দুর্বল শরীরটার দিকে তাকিয়ে বর মায়া লাগছিল।'' (এক নির্দয় দয়েল পাখী/ক্ষমা নেই)।

একজন শিল্পীর লেখায় ক্ষমার অযোগ্য অসহিষ্ণু হয়ে ওঠা বিষয়কে অনেকেই অন্যায় বলে শিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে ভৎসনা করেছিলেন। ২২-১২-১৯৭১ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের ওপর চরম অমানবিক পৈশাচিক ধর্ষনকারী, লুঠনকারী ও হতাকারীদের সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঙমা না ক্ষমা নেই রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচকদের মধ্যে মৈত্রেয়ী দেবী কলকাতা ১৯ - ১৯৭১ সালের ২৮শৈ ডিসেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় একজন শিল্পীর ক্ষমা না করার অসহিষ্ণুতা শিক্ষার অভাব সংস্কৃতির অভাব বলে সমালোচিত করেছিলেন। সেইসব সমালোচকদের উদ্দশ্যে লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষোভ - ''মশাইরা, যান। তাড়াতাড়ি গিয়ে গ্রাম শহর মাঠ ঘাট পুকুর খাল নর্দমা কুয়ো থেকে পচাগলা লাশ আর মাথার খুলি মড়ার হাড় চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলুন। পাড়ায় পাড়ায় মাঠ হয়ে যাওয়া জায়গাগুলোতে রাতারাতি বাড়ি তুলে ফেলুন। গাছে চড়ার লোক না পেয়ে ডাব খাওয়ার জন্যে পাক-ফৌজ যে গাছগুলো গোড়া কেটে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে গেছে, সেগুলো চটপট মাটিতে খাড়া করে দিন।'' (এইবার হাসি ফুটুক/ক্ষমা নেই)।

গদ্য শিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অসহিষ্ণুতার মূলে নিহিত তাঁর দায়বদ্ধ সামাজিক বোধ। সেই বোধে তাঁর রচনা হয়ে উঠেছিল সাংবাদিকতাপূর্ণ। তিনি লিখেছিলেন - ''এ পর্যন্ত আমি আমার একটা লেখাতেও বাংলাদেশে হত্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর এক সত্যের কথা বলিনি। তার কারন, লিখতে গিয়ে লজ্জায় আমার কলম থেমে গেছে। পৃথিবীতে আর কোনো সৈন্যবাহিনী, এমনকি নাৎসীরাও এমন ব্যাপক হাতে বাড়ি ঢুকে নারীধর্ষণ করেনি। শুধু ধর্ষণ নয়, ধর্ষণের পর হত্যা। ধর্ষণের পর সবাইকে মেরেছে তা নয়। বড় একটা দলকে ক্যান্টনমেন্টে রেখে তারা নিজেদের বেশ্যালয় খুলেছিল। বেশ্যাদেরও চলাফেরার স্বাধীনতা থাকে, এরা ছিল খাঁচায় বন্দী। ..... পাক ফৌজ ধর্ষণ করে মৃত মনে করে যাদের ফেলে রেখে গিয়েছিল, পরে তাদের অনেকেই অপমানে আত্মঘাতী হয়েছে। আজও বেঁচে আছে এমন ধর্ষিতা মেয়ের সংখ্যাও কম নয়। .....। ত মেয়ে মরেনি, কিন্তু বাড়িতে মুখ দেখাতে পারবে না বলে দূরে কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।'' (এইবার হাসি ফুটুক/ক্ষমা নেই)। এই পাশবিক অত্যাচারীদের প্রতি সহিষ্ণু ও নমনীয় না হবার মধ্যে লেখকের সত্যবোধ সচেতন শিল্পী সত্ত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতারই পরিচয় হয়ে ওঠে বলে আমরা মনে করি। তাঁর লেখায় সাংবাদিকতা ধর্মের সঙ্গে আমরা শৈলীতে ডায়েরি ধর্মিতার নিদর্শন পাই ক্ষমা নেই গ্রন্থে - ''মাঠে মাঠে ছড়ানো বীভৎস মৃত্যুর মিছিল দেখার পর যশোরে অবাঙালীদের বসতি নিউটাউনের পাশদিয়ে আসছিলাম। দু-পাশে খাঁ খাঁ করছে বাড়ি।'' (ভয় নেই/ক্ষমা নেই)। ব্যক্য বিন্যাস শব্দচয়ন ও বর্ণনা ভঙ্গিমায় আমরা তাঁর ডায়েরিধর্মি রচনার শিল্পরুপের আভাষ পাই। সেই সঙ্গে এইসব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সহায়ক হয়ে উঠেছিল তার ভ্রমণ পিপাসা। সেই ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কছায় লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন - ''বাসে আসতে আসতে দেখলাম হাজার হাজার শরণার্থী নদীর ধারে সারবাঁধা নৌকোয় রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায়। আর তাদেরই ঘরের মানুষেরা বাংলাদেশের মাঠে মাঠে রাত জেগে আগুনের মুখে ঘনিয়ে আনছে স্বাধীনতার নতুন দিন।'' (সকালের অপেক্ষায়/ক্ষমা নেই)।

ঔপন্যাসি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস শিল্পের আরেকটি ভিন্ন প্রয়াস 'কতক্ষুধা'। এই উপন্যাসটি তাঁর মৌলিক সৃষ্টি নয়। সাহিত্যিক ভনানী ভট্টাচার্যের (১৯০৬-১৯৮৮) প্রথম ইংরেজি উপন্যাস 'So many Hungers' (১৯৪৭- বোম্বাই এ প্রকাশিত) এর অনুবাদ উপন্যাস 'কত ক্ষুধা' ভবানী ভট্ট াচার্যের 'So many Hungers' এর অনুবাদ করে কত ক্ষুধা শীর্ষক উপন্যাস সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৫৩ সালে র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব থেকে প্রকাশিত করেন।

চল্লিশের দশকের প্রথম পর্বে ভারতীয় সাহিত্যিকদের ইংরেজিতে উপন্যাস রচনার প্রবণতা জেগেছিল রাজনৈতিক উদ্দীপনা থেকে। সেকালে ইংরেজি উপন্যাস সৃস্টিতে অগ্রগণ্য ছিলেন মুলকরাজ আনন্দ আর কে নারায়ণ রাজরাও ভবানী ভট্টাচার্য তাঁর Shadow from Ladakh (১৯৬৬) উপন্যাসটির জন্য ১৯৬৮ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হন। বাংলা ভাষায় সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে তাঁর অন্যতম রচনা হল 'কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ (কল্লোল শ্রাবণ ১৩৩৪), 'সাহিত্যিক সংহতি' শীর্ষক গল্প (কল্লোল মাঘ- ১৩৩৪) 'ওষ্ঠের জ্যোৎস্না এক কণা ' 'এত ঘণা করি তবু' 'কালো চোখে এত আলো ' শীর্ষক কবিতাগুলি। তিনি ১৯৪১ সালে 'Music for Mohini' শীর্ষক উপন্যাসটি লিখতে শুরু করে ও সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। ১৯০৪ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পি এইচ ডি হন। 'দি হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলি নিয়ে প্রকাশিত দ্বিতীয় গ্রন্থ Some Memorable yesterday গ্রন্থ। ১৯৪৯ সালে ভারত সরকারের ভারতীয় দূতাবাসের প্রেস অ্যাটাশে তিনি ওফশিংটন ভি সি তে যান। সাহিত্য সম্মেলন ও বিভিন্ন সেমিনারে যোগ দিতে জিনি হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় সহ জাপান, টোকিও, নিউমিল্যান্ড দেশে বিভিন্ন সময়ে গিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে ভবানী ভট্টাচার্য প্রফেসর নিযুক্ত হন ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে, সিয়াটল-এ। তিনি জীবনদর্শনে গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতির জনক মহাত্মাগান্ধীকে।

ভাবনী ভট্টাচার্য ১৯৭২ সালে নিউ ইয়র্কের St. Martins Press Contemporary Novelists in the English language শীর্ষক আলোচনায় বলেন - '' তারপর মহামন্বন্তর বিনাশের ঝাঁটা নিয়ে এসে পড়ল বাংলার ওপর। অনুভবগত উত্তেজনা যা পেয়েছিলাম (দুই মিলিয়নের অধিক পুরুষ, নারী, শিশু মানবসৃস্ট অভাবে ধীরগতি অনাহারে মরে গেল'' তার চাপ এসে গেল সৃজনের ওপর। তার ফলশ্রুতি হল So Many Hungers কত ক্ষুধা প্রথম দেজ সংস্করণ আগস্ট ২০১০ পৃঃ ৭-৮) এই উপন্যাসটি দেশী বিদেশী বহু পত্র পত্রিকায় সমাদৃত হয়েছিল। এই উপন্যাস সম্পদে The times Literary supplement পত্রিকা লিখেছিল "Stneere, bitter.... a factual and vivid account of one of the most shocking disasters in history" (কত ক্ষুধা পথম দেজ সংস্ক রণ ২০১০, পৃঃ ১০)

এই উপন্যাসটিতে লেখকের দায়বদ্ধ সৃজনী প্রতিভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মনুষ্য সৃস্ট মর্মান্তিক মন্বন্তর, জীবন সংকট, দ্রব্য মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি - কালোবাজাবিদের নির্মমতা, ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি পোড়ামাটি নীতি, যুদ্ধের দেশীয় ও অন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট, ভারতছাড়ো

আন্দোলন ইংরেজ সৈন্যের পাশবিক লালসা - মন্বন্তরের তথ্যানুসন্ধান অসংখ্য নিরন্ন মানুষের হাহাকার প্রভৃতি। এই উপন্যাসে লেখক ব্যক্তিক পারিবারিক দেশীয় ভাবনার সঙ্গে জাগতিক চেতনার সমন্বয় খাটিয়েছেন। সেই সঙ্গে যুক্ত হবে প্রচন্ড আশাবাদিতায় আদর্শ বাদী দেশপ্রেম স্বার্থমুক্ত উদার মানবতার মহান জীবনদর্শন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কত ক্ষুধা উপন্যাসের অনুবাদ সম্পর্কে উপন্যাসটির ভূমিকা অংশে রবিন পাল লেখেন ''তাঁর অনুবাদ কবিতায় যেমন উপন্যাসটি অনুবাদেও আমরা দেখব একান্ত ঘরোয়া বাংলা লোক শ্রুতি প্রবচন ব্যবহৃত যা অনুবাদকে প্রায় উদ্দিষ্ট ভাষার মৌলিক রচনার কাছাকাছি নিয়ে চলে। খুব কম বাঙালি অনুবাদকই সুভাষের মতো এই ঈর্ষানীয় দক্ষতার অধিকারী। এই বইটিতে ঘরচলতি বাংলা ব্যবহারের কিছু নমুনা - চিমড়ে পরা কৌটো, ট্যাখ ভারী করো, যা হয়ে গেলাম, কুঁচকি কণ্ঠা ভর্তি করে যাক, জবর, আঙুল ফুলিয়ে কলা গাছ, বেখাপ্পা, দাবার বড়ে, গাধা পিটিয়ে মানুষ, টিউশনির যাঁতায় পেশা, কিংখাবের ব্লাউজ, ফোঁৎ ফোঁৎ কয়সা হল ডানা গজানো পাখি, চ্যাটাং চ্যাটাং কথা, সাঁক সাঁক করে উঠল ইত্যাদি। এগুলি ইংরেজির কাছাকাছি, অথচ এই ব্যহারে অনুবাদ টিকে আর অনুবাদ বলে মনে হয় না। যেখানে ইংরেজি না রাখলেই নয় সেখানে তা রাখা হয়েছে।'' কত ক্ষুধা - প্রথম সংস্ক্রণ ২০১০ পৃঃ ১২।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কত ক্ষুধা' উপন্যাসটি সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত আঠারেটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। এই উপন্যাসটিতে আমরা 'ক্ষুধা' শব্দটির ব্যাপ্তি অনেকভাবে হয়ে উঠেছে - মানুষের শরীরী ক্ষুধা, ঘর বাঁধার ক্ষুধা - ছোট ছোট আশা পুরনের ক্ষুধা সাম্রাজ্য বৃদ্ধির ক্ষুধা যুদ্ধে জয়ের ক্ষুধা স্ত্রী পুরুষ পিতা সন্তানের ক্ষুধা শান্তি স্থাপনের ক্ষুধা আত্মপূর্ণতার ক্ষুধা সৃষ্টি ক্ষুধা প্রভৃতি।

আলোচ্য কত 'ক্ষুধা ' উপন্যাসটির প্রথম পরিচ্ছেদেই আমরা দেখি রাহুলের পরিবারে তার স্ত্রী মঞ্জু একটা সন্তান প্রসব করছে। সেই পরিবারে এই সন্তান প্রথমের আনন্দের সঙ্গী হয়েছে তার ভাই কুনাল, সচেতন পিতা সমরেন্দ্র বাবু ও তার মা। গত প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের প্রথম সপ্তাহেই জন্ম নিয়েছিল রাহুল। তার সন্তানের জন্ম হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কানে। মহাযুদ্ধে আয় একটি পরিবারের মানুষগুলোর বেঁচে থাকার সংগ্রাম প্রকাক হয়ে যায়। পরিবারের মানুষ জনের মধ্যে মহাযুদ্ধ প্রভাব ফেলে। জনজীবনে এই মহাযুদ্ধের মতো ভয়াবহ ঘটনাগুলি ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছিল। রাহুল জীসেন্ বেতার কেন্দ্রে এক ফ্যাসিস্টের বক্তৃতার শুনছিল। লেখকের ভাষায় সেই ফ্যাসিস্ট ''দুনিয়াসুদ্ধ লোককে শাসাচ্ছে। এক দল গুন্ডা এক মহান জাতিকে কান ধরে ওউ বস করাচ্ছে, তাকে দিয়ে দুনিয়াটাকে তছনছ করে দিতে চাইছে। ফলে, তার মাথায় ঢুকেছে যুদ্ধ ছাড়া সে বাঁচবে না। কারণ, পরাজয়ের গ্লানি তার বুকে জগদ্দল পাথরের

মতো চেপে আছে, দম বন্ধ হয়ে সে ভাবছে ইউরোপের কোন যুদ্ধ ক্ষেত্রে সে তার হৃত মর্যাদা ফিরে পাবে। মানুষের এমন ভুলও হয়। জার্মান জাতি নিশ্চয়ই বাঁচবে - যুদ্ধে যদি সে হারে। ইংলন্ডের প্রতিক্রিয়ার বাহিনী তার নাৎসী জাত ভাইদের খতম করুক। তবেই যদি জার্মেনি বাঁচে।

ইংলন্ডও তাতে বাঁচবে। ঝানু রাজনীতিক দের পাল্লায় পড়ে মানুষের ভালমন্দ বোধের বাইরে চলে গেছে সে। সেখান থেকে তাকে টেনে এনে গায়ের ময়লা ঝেড়ে ফেলতে হবে, গড়ে তুলতে হবে সুশিক্ষিত এক দল নেতা -'' এক -কতক্ষুধা পারিবারিক চরিত্রগুলোর সাধারণ কথাবার্তায় আসে যুদ্ধের প্রসঙ্গ। রাহুলের মা ফিরে দালানের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলেন --'' আমাদের জীবনকালে এইবার নিয়ে দুবার গ্রেট ব্রিটেনকে জার্মানির সঙ্গে লড়তে হচ্ছে''। রাহুল মনে মনে উপহাস করে তার মাকে বলে - '' যাও না, আরও ভাল করে শয়তানের ট্যাঁক ভারি করো - প্রতিক্রিয়ার এমন বিষদাঁত আর পাবো না। দুর দেশি মানুষগুলোর স্বানীনতা লুটে পুটে নিয়ে - যাও, খুব করে শয়তানের ঝুলি ভরো। এতদিন পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙে নিয়ে ইতিহাসের একি বিষয় ঠাট্টা! '' (এক - কত ক্ষুধা)। রাহুল জ্যোতিবিজ্ঞান পদার্থ বিজ্ঞানের একজন জাঁদরেল অধ্যাপক - কেম্ব্রিজের ডি এস সি। তার ভাই কুণালের মাটিতে পা দিয়ে চলা স্বভাব। সে সিদ্ধান্ত নিতে এতটুকু দেরি করেনা। সে ন্যায় অন্যায় বিচার করে না - যুদ্ধ তার কাছে একটা মস্ত অ্যাড্‌ভেঞ্চার। রাহুল ফ্যাশিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মনে প্রাণে সংকল্পিত। রাহুলের বাবার পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স বলিষ্ঠ চেহারা, তার সাহেবি পোশাক । রাহুলের মা কিনছেন চাল আর সর্ষের তেল। বাবা সমরেন্দ্র বাবু কিনছেন শেয়ার । আর ভাবছেন যুদ্ধের বাজারে হয় সোনা নয়তো লোহা কিনতে হবে। সে যুদ্ধের সুযোগে আর্থিক দুনিয়ার নেপোলিয়ন হবার স্বপ্ন দেখে। এই পরিচ্ছেদের শেষে লেখক মঞ্জুর গর্ভের সন্তান প্রসবের নতুন এক অর্থ বহনের কথা ভাবে। লেখকের কথা - ''যখন এক রাস্ট্রনায়ক ভেঙে পড়া পচাঁগলা সমাজ ব্যবস্থার তল্পিদার হয়েও অনিচ্ছুক কণ্ঠে সেই সমাজ ব্যবস্থাকে স্বখাত সলিলে ডুবে মরার নির্দেশ দিচ্ছে, ঠিক সেই শুভ মুহূর্তে তার সন্তানের জন্মগ্রহণ তার কাছে বিশেষ অর্থবহ বলে মনে হয়।

হ্যাঁ হবে। যুদ্ধের রক্তগঙ্গায় স্বস্তিকা ছাড়াও আরও অনেক কিছুর সমাধি হবে। লক্ষ লক্ষ তরুণের আত্ম বলিদান বৃথা যাবে না।'' (এক-কত ক্ষুধা)

'কত ক্ষুধা ' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখি রাহুলের পরিবারে মানুষ জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সমকালের আন্তজার্তিক পেক্ষিত। মঞ্জুর সদ্য প্রসব হয়েছে। তার শরীরের বর্ণনায় আমরা রাহুল ও মঞ্জুর শরীরী ক্ষুধার পরিচয় পাই। ঔপন্যাসি লিখেছেন - ''মঞ্জুর ফিতে খোলা শাদা

জামার ভেতর দিয়ে তার উদ্ধত বুক আসুল অনাবৃত। স্তনাগ্রে চুঁইয়ে পড়া এক ফোঁটা দুধ। পাকা ফলের মতো বক্ষদেশে তার নতুন সরসতা। রাহুলের দৃষ্টি অনুসরণ করে মুখ লিচু করে তাকাতেই বুকের দিকে চোখ পড়ল মঞ্জু। লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি সে দুটো হাত দিয়ে নিজেকে ঢাকল। কিন্তু রাহুলের মানসপটে অনেকক্ষণ ভেসে থাকল চুঁইয়ে পড়া এক ফোঁটা দুধ।'' (দুই - কত ক্ষুধা)

আরেক ক্ষুধার তাড়নায় কুণাল লড়াইতে যোগ দিতে চাইছে। মঞ্জুর যেমন সন্তানকে ভালোবাসে তেমনি এক অব্যক্ত ভালেবাসার ক্ষুধিত মা কুণালকে যুদ্ধে যেতে বারণ করে। কিন্তু কুণাল তার মা কে আস্বস্ত করে বলে ''ভাববে কেন মা? দুনিয়ার দেশে দেশে আজ লক্ষ লক্ষ মা যে তাদের লড়তে পাঠাচ্ছে।'' (দুই-কত ক্ষুধা)

রাহুলের দাদুকে জীবনের ভিন্ন ক্ষুধা পেয়ে বসেছে। তিনি ''শহরে ইস্কুল মাস্টারি থেকে অবসর নিয়েই সোজা চলে গেছেন সমুদ্রের কাছাকাছি একটা গাঁয়ে। সেখানে চাষিদের মধ্যে মিশে গিয়ে একা হাত পুড়িয়ে বেঁধে খাচ্ছেন। বছর কয়েক আগে হার কারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে বুড়ো ঝাঁপিয়ে পড়ে চাষি আর জেলেদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। তাদের নিয়ে আইন অমান্য করে সমুদ্রের ধারে গেলেন নুন তৈরী করতে জেল হল। মেয়েরাও বাদ গেল না। রাহুলের তখন ছাত্রজীবন। রাহুল মাথা গরম করে কিছু একটা করে বসত, আস্তে আস্তে সেই দিকেই পা বাড়াচ্ছিল।'' (দুই-কত ক্ষুধা) রাহুল ও এখন মনে একটা খচ্ খচ্ উপলব্ধি করে। পৃথিবীর মুক্তি সংগ্রামে সে যোগ দেবার কথা ভাবে। এই পরিচ্ছেদে বিশ্বের যুদ্ধের বাজার কে সাহিত্যের রূপ দিয়েছেন। বাজারে ছুটোছুটি করে দালান তস্য দালাল দালালস্য দালাল। সমগ্র দুনিয়ায় একটা বৃহৎ ক্ষুধা - ''খরিদ করো যুদ্ধের অস্ত্র। কামান বন্দুক, গোলাগুলির মালমশলা। কোনো যুদ্ধ জাহাজের সাজ সরঞ্জাম। লোহা কেনো। লড়াই বেঁচে থাকে লোহা খেয়ে। টাটা স্টিল্স্, বেঙ্গল করপোরেশন স্টিল্স্ - কোবার কেনো, শেয়ার। এক লাখ টন লোহায় বড় একটা শহর গুঁড়িয়ে যায়। পৃথিবী টাকে গুঁড়িয়ে দিতে লাগবে দশ কোটি টন লোহা। কয়লা কেনো, কয়লা। যুদ্ধের হাত পা গরম রাখবে কয়লা। জন্তুর চেয়ে ঢের বেশি নীচে মাটি খুঁড়তে পারে মানুষে। ইস্পাতের নখ দিয়ে পৃথিবীর পেট চিড়ে দিতে পারে। .... একশোতে একশো লভ্যাংশ লাভের টাকায় মৃত্যুর কল তৈরী হবে। গোলা ফাটলে তা থেকে টুকরো টুকরো লোহা মিলবে মাসে দশ লাখ টন। লোক মরবে লাখ দশেক। লোক মরবে আর মনাফা হবে''। মাথা পিছু মুনাফা। পুঁজিবাদী মানুষ ধনের ক্ষুধায় মানুষের মৃত্যু কামনা করেছিল সেদিন। মানুষ সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় দীর্ঘমেয়াদী সেই মহাযুদ্ধের বিশ্বের সবকিছু কিনে নিতে চেয়েছিল।

(কতক্ষুধা) উপন্যাসের তৃতীয় সংখ্যক পরিচ্ছেদে রাহুলের পিতা তাকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর চেষ্ঠা করে। কিন্তু এই সময় তার দাদুর সন্ধান করে। সেই খোঁজে পথে দুজন চাষীকে জিজ্ঞেস করায় তারা তার দাদুকে ভগবান হিসেবে মেনে নেবার। কারণ হিসেবে তার প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কথা জানায়। তাদের হাত ধরে রাহুল দাদুর গ্রাম বারুনীতে পৌছায়। সেখানে তার দাদু সেখান কার চাষা ভুষো মানুষ গুলোকে নাইট স্কুলে পড়াশুনা করায়, চরকার সতী কাটায়, চাষে উৎসাহ দেয় ও কংগ্রেসের ডাকে দেশের মুক্তি ডাকে ঝাপিয়ে পড়ে। তাদের কথায় রাহুলের দাদু তাকে বলে - ''বারুনীতে আমার ছেলেমেয়ের ছড়াছড়ি। এখানকার গ্রামবাসীরা আমার গর্বের বিষয়। তোরা শহরের মানুষ হয়েছিস, তোদের মতো বুদ্ধির চাকচিক্য এদের নেই - সভ্য নয়। জানেশোনেও কম। কিন্তু লোক খুব ভাল এরা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধএর জানোয়ারের মতো খাটতে হয়েছে তাদের, হাড় - ভাঙা খাটুনি; তবু মনুষ্যত্বের ওপর বিশ্বাস পষ্ট হয়নি তাদের! '' (তিন-কত ক্ষুধা)।

ভারতের কৃষিভিত্তিক জনজীবনের কথায় রাহুলকে তার দাদু জানায় ''আর কিষাণদের খাওয়া জোটে বছরে দুতিন মাস, যখন মাঠের কাজে মজুরি পায়। বছরের বাকি কমাস তারা শুকিয়ে থাকে। ভারতেরদশ কোটি কিষাণের কপালে নিত্য উপবাস। কালে ভদ্রে তারা ভরপেট খেতে পায়। .... পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই দশ কোটি মানুষ কী দিয়ে মাটিতে কোঁচা লোটানো ধুতি কিনবে? এ থেকেই তুই চরকার মর্ম বুঝতে পারবি, রাহুল - যে চরকা হল আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রতীক। দুখানা রোজ হফ না যাদের, ভারতের সেই কোটি কোটি মানুষ চরকা কেটে শরীরের লজ্জা ঢাকতে পারে।'' (তিন - কত ক্ষুধা) এই প্রসঙ্গে চাষীদের ওপর খাজনার জুলুম ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসঙ্গ এখানে যুক্ত করেছেন ঔপন্যাসি। সেই সঙ্গে এই পরিচ্ছেদে দাদু জাতীয় আন্দোলনের মর্মকথায় বলেন - '' জাতীয় আন্দোলন সব চেয়ে আগে যে কাজটা হাতে পিতে চায়, সেটা হল গ্রামোন্নয়নের কাজ। যে জীবন ভবিষ্যতে আমরা গড়ে তুলব, এটা হবে তার বনিয়াদ।'' (তিন/কত ক্ষুধা)। এখানে জাতীয় উন্নয়ন কৃষিভিত্তিক দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ঔপন্যাসিকের মহৎ জীবনদর্শনের নিদর্শন আমরা পাই। উপন্যাসের এই তৃতীয় সংখ্যক পরিচ্ছেদে কানু, কাজলী ও মঙ্গলী চরিত্রের পরিচয় পাই। তার দাদুর কাছে রাহুলের পরিচয় পেয়ে কাজলী হাঁটু গেড়ে বসে রাহুলকে প্রণাম করে। রাহুলের পা থেকে জুতো খুলে কলসির ঠান্ডা জল দিয়ে পা ধুইয়ে দেয় কাজলী। সে কাজে রাহুল আপত্তি জানালে দাদু তাকে জানায় - '' চাষির ঘরের আদব কায়দা জানা মেয়ে ও। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন আচার ব্যবহার গুলো জন্মে থেকে দেখে আসছে। তোমাদের হাল - আমলের শহুরে ভাবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে ও-ই ওর দেশাচার কেমন করে

ছাড়ে? এ বাড়িতে তুমি এসেছ একজন মান্যগণ্য অতিথি -''। (তিনি - কত ক্ষুধা)। এখানে হাল আসলের শহরে অভি সভয জনজীবনের সঙ্গে লেখক গাম্য মূল্যবোধের ইবসাদৃশ্য কে শিল্পিত রূপ দান করেছেন।

আলোচ্য উপন্যাসের চতুর্থ সংখ্যক পরিচ্ছেদে সমরেন্দ্র বাবু গ্রেট ব্রিটেনের মহাযুদ্ধে জয়ের সঙ্গে নিজের ভাগ্য কে জুড়ে দেবার কথা বলেন। বিশ্বযুদ্ধে মিত্র পক্ষ জয়ী হলে শেয়ার বাজার চড় চড় করে উঠে যাবে। তাঁর মনে হয় তিনি হবেন রায় বাহাদুর - রায়বাহাদুর সমরেন্দ্র বসু। তিনি জানেন ''ফটকা বাজারের তজি মন্দার লড়াই। ব্রিটিশের বেগত্তিক হলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সঙ্কটে পড়লে অমনি শেয়ারের দাম হু হু করে পড়তে থাকে। তারপর সেই নার্ভিকে ব্রিটিশ ফৌজ নামে, সুমেরু বৃত্তে রাজকীয় বিমান বহরের পাখা গুড়ে অমনি চড় চড় করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে। শত্রুপক্ষ ঘা খাবার জন্যেই গলা বাড়িয়ে দিয়েছে ফাট্কা বাজারে তা হাড়ে হাড়ে বোঝা যায়। (চার-কত ক্ষুধা) ফাটকা শেয়ার বাজারের ওঠানামা দেখেই সমরেন্দ্র বাবুরা বিশ্বের যুদ্ধের পরিস্থিতি টের পেয়ে যান। তারপর পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি চাল ব্যবসার কথা বিবেচনা করেন।''

আলোচ্য উপন্যাসের পাঁচ সংখ্যক পরিচ্ছেদে উচ্চবিত্ত স্ট্যাটাচের মানুষের পচন ধরা সভ্যতা শিল্পে তুলে ধরার প্রয়াসী দেখি আমরা। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী নোবেল পুরস্কার পায় পদার্থবিদ্যার গবেষণার কাজে সেই বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাহুল স্ত্রীর সঙ্গে উচ্চবিত্তের আমোদ প্রমোদের ছবিতে আমরা দেখি মদ্যপান ও অশালীন মৃত্য। সেই নাচের মেয়েটির তালে তালে গুরু নিতম্ব হাঁসফাঁস করে, তার পৃষ্ঠ দেশ নগ্ন - ''শাড়িটা এসম করে পরেছে যাতে বাহুমূলি পর্যন্ত দুটো হাত আর ঘাড় দেখা যায়। ব্লাউজের লম্বা (কাট) গলায় সন্তনরেখা থেকে অন্তঃপাড়ী গুভীর প্রদেশটুকু পর্যন্ত অনাবৃত।'' (পাঁচ - কত ক্ষুধা) এখানে আমরা মঞ্জু ও রাহুলের ঘনিষ্ঠ হবার ছবি পাই। দাম্পত্ত জীবনের শরীরী ক্ষুধার স্বাভাবিক চাওয়া পাওয়ার পরিচয় এখানে পাই আমরা। তাদের ভোগবাসিনা চরিতার্থ করার ও শরীরে আনন্দের তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হবার - পরিচয় এখানে পাই আমরা।

'কতক্ষুধা ' উপন্যাসের ছয় সংখ্যক পরিচ্ছেদে দেখি যুদ্ধের বাজারে ছোটো ছোটো নৌকোর অস্বাভাবিক মূল্য ও অধিক চাহিদার কথা-- ''জেলেদের এই নৌকো না হলে ঘরে আলো জ্বলে না, পেটে খাবার যায় না। চাষীরা এই নৌকো করেই চর জমিতে করে ফসল নিয়ে হাট যায়। যুদ্ধের বাজারে জেলেদের কাছ থেকে সেই নৌকো কেড়ে নেওয়া হয়। বারুনী গ্রামের বুড়ো বটের নীচে গ্রামসুদ্ধ লোক জুড়ো হয়। সেখানে তারা প্রতিরোধে সংখব্ধ হয়। কেননা শত্রুরা দিন দিন তাদের ঘরে হানা দিচ্ছে বর্বরের দল মানুষের রক্ত চায়। তারা মানুষের চোখের দিকে গুলি ছুঁড়ে হাতের টিপ পরীক্ষা করে। তারা

বাপমাদের হাত পা বেঁধে চোখের সামনে তাদের ছেলেমেয়েদের গায়ে সঙ্গীনের ফলা ঢুকিয়ে দেয়। মা বউ আর কচি মেয়েদের মাথায় কলঙ্কের ডালি তুলে দিয়ে সমস্ত জীবনটাই তাদের বরবাদ করে দেয়। কী ভয়ঙ্কর! '' (ছয়-কত ক্ষুধা)। ভারতের সঙ্গে যেন নাৎসী বাহিনীর যুদ্ধ লেগেছে। পরাধীন ভারতের আইন অমান্য আন্দোলন ও ভারত ছাড়ো আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছে। গ্রেট ব্রিটেন পরাজিত হলে ভারত নাৎসী বাহিনীর অধীন আরো পরাধীনতার হস্তান্তর হবে। ব্রিটিশ সেনারা গ্রামগুলো তছনছ করে দিয়েছে। গ্রামগুলোতে মিলিটারির ছাউনি ও উড়োজাহাজের খাঁটিতে পরিণত হয়েছে। বড় লোকদের পাশ দালান, সাধারণ মানুষের মাটির ঘর সেনারা দখল করে নিয়েছে। মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়া হবে। পড়েছে। দেশের নৌকোগুলো পুড়িয়েছে খাবার ফসলেও আগুন লাগিয়েছে। দেশের অস্থি মজ্জার মানুষগুলোকে যুদ্ধের বাজারে যেন পুড়িয়ে যাক বাক করে দেবে।

আলোচ্য উপন্যাসের সাত সংখ্যক পরিচ্ছেদে আমরা শহরে বিদ্রোহ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সেখানে শোনা যায় উদাও ঘোষণা -- ''স্বাধীন ভারত তার বিরাট ভান্ডার উজার করে ফ্যাশিজম-এর বিরুদ্ধে লড়বে। স্বাধীন ভারত হবে সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের মিত্র; যত ঝড় ঝাপ্টাই আসুক, স্বাধীন ভারত তাদের সঙ্গে সমান ভাবে দুঃখ ভাগ করে নেবে। ... স্বাধীন ভারত হবে সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের মিত্র; যত ঝড় ঝাপ্টাই আসুক, স্বাধীন ভারত তাদের সঙ্গে সম্মান ভাবে দুঃখ ভাগ করে নেবে। ... ভারতবর্ষ স্বাধীন ভারত তাদের সঙ্গে সমান ভাবে দুঃখ ভাগ করে নেবে। ... ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেলে যে কোনো আক্রমণ অব্যর্থভাবে রুখে দাঁড়াতে পারবে - তার পেছনে কাঁধে কাঁধ দেবে সংকল্পে অটল, শক্তিতে দুর্জয় জনসাধারণ।'' (সাত - কতক্ষুধা)। বিদেশী সেনারা দেবতা দাদুকে গ্রেপ্তার করে। তিনি বারুনী গ্রামের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলেন - ''আজ আমাদের চরম পরীক্ষার দিন। শক্ত হও। সত্য নিষ্ঠ হত। মৃত্যুঞ্জয়ী হও। বন্দেমাতরম্'' (সাত - কত ক্ষুধা) দেবতা দাদু কাজলীদের উদ্দেশ্য করে বলেন - ''ভাই বন্ধুরা, পতাকার সম্মান রেখো। নিজেদের বঞ্চনা করো না। আমরা হারি কিম্বা জিতি, অন্তরের বিশ্বাস ঠিক রাখব; অহিংসা আমাদের মূলমন্ত্র।'' (সাত - কত ক্ষুধা)। কাজলী বুড়ো বটের নীচে পতাকা উত্তোলনের উৎসবে ও জাতীয় আন্দোলনের সংকল্প উচ্চারণ করে। সেখানে কাজলী সবুজ পাড়ের খদ্দরের সাদা শারির নীচে বাসন্তী রঙের ব্লাউজ পড়ে যেন তিন রঙা নিশান। তারা সেখানে পতাকার তলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সংঘবদ্ধ হয়।

কত ক্ষুধা উপন্যাসের আট সংখ্যক পরিচ্ছেদে আমরা দেখি -- ''বুক টান করে দাঁড়াল চাষিরা। পরপর বার কয়েক প্রচন্ড সংঘর্ষ হল। গুলি চলল বেপরোয়া জখমী মানুষগুলোকে বাড়ি বয়ে নিয়ে গেল

তাদের ভাইরেরাদায়রা। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে বন্দিদের হাতে হাত কড়া বেঁধে চালান করা হল দলকে দল। মুখ বুজে যারা এতদিন অত্যাচার সয়ে এসেছিল দমন রাজের চোখ রাঙানিতে ভয় তো তারা পেলই না, সাহস বেড়ে গেল। রক্তচক্ষুর অগ্নিবর্ষণে তাদের মনে আগুন জ্বলে উঠল।'' (আট - কত ক্ষুধা)।

এদিকে মাঠের মাঠে সোনার ধান কাটার সময় হয়ে আসে। মাঠের কাঠফাটা বোদ্দুর কাস্তের গায়ে ঠিকরে পড়ে। গ্রামের মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে ধান কাটে। গোলায় ধান তোলে। কাজলী চাষিদের জোটবদ্ধ করে। কাজলীর সঙ্গে ধানকাটার কাজে কাস্তে হাতে তুলে নয়ে কিশোর। কাজলী চাষীদের বলেন-- '' জাগো, জাগো সর্বহারা ''। সে স্লোগান তোলে (তামাম মজুর, এক হও।) সে বলে ওঠো জাগো চাষির দল। কাজলী চাষিদের বলে -- ''উঠে দাঁড়াও চাষির দল। ঘুমোবার চমৎকার সময়টুকু ছাড়া আর কীই বা আছে তোমাদের যে হারাবে? কিছু নেই, কিছুই নেই আর।'' (আট - কত ক্ষুধা)। কাজলীর মা কাজলী বড় হয়েছে ভেবে কিশোরের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবার কথা ভাবে। কিশোর কাজলীর সঙ্গে চাষিদের জাগিয়ে তোলার কথা বলে। এদিকে চাষির ধান সামান্য দামে কিনে দেবার অভিসন্ধিতে গিরিশ মুদি যুদ্ধের কথা বলে তাদের ধান বেঁচে দেবার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে। চাষিদের উদ্দেশ্যে কে বলে-- '' ভাইরে এমন সুযোগ হারালে আর পাবিনে। গোলা খালি করে বেচে দে। আট টাকা করে চালের মন। এমন দর কখনও পেয়েছিস? না একশো বছরের মধ্যে বাপ চোদ্দ পুরুষে কেউ এমন দরের কথা শুনেছে? জোদের ধানগুলো যেন সোনার জলে ছাপানো। রং ধুয়ে যাবে ভাই, রং ধুয়ে যাবে - এ রং পাকা নয়। জাপানি শত্তুররা আজ আমাদের দরোজায়। আমাদের পল্টনদের ভাল মতন খাওয়ার দরকার। আমাদের কলকারখানার মজুররা যারা খেটে চলেছে, তাদের ভরপেট খাওয়া দরকার। বেশিদিন এভাবে যাবে না, ভাইরে; ব্রিটিশরা আছেন, মার্কিনরা আছেন। তাঁদের পায়ের নীচে জাপানি শত্তুররা ছাতু হয়ে যাবে। তখন? ধানচাল কিনবে কে? '' (আট - কত ক্ষুধা)। সরল মনের চাষীদের ভাবে ফন্দি এঁটে গিরিশ মুদিরা কৌশল নিঃস করার ফন্দি এঁটেছিল যুদ্ধের বাজারে। এক শ্রেণীর কালো বাজীরেতে সাধারণ মানুষ নিরন্ন হাহাকারে ভুগেছিল এদেশে। এই শ্রেণীর মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করেছেন ঔপন্যাসি আলোচ্য উপন্যাসে।

আলোচ্য 'কত ক্ষুধা ' শীর্ষক উপন্যাসের নয় সংখ্যক পরিচ্ছেদে কাজলীর প্রাণে আনন্দের বান ডাকে। সরল খুহিতে হাসতে হাসতে তার চোখে জল গড়িয়ে আসে। ''কাজলীকে হাসতে দেখে কিশোরে বুকের মধ্যে রক্তের স্রোত তোলপাড় করে উঠল; মনে তুল তার মাতাল হৃদয় যেন কাগজের নৌকোর মতো ঘুর্ণীর মধ্যে টলছে।'' (নয় - কত ক্ষুধা)। দুমাস হল কিশোর ও কাজলীর বিয়ে হায়েছে। কাজলী

এখন পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত কিশোর চরকায় নিজহাতে শাড়ি বুনে কাজলীকে পাড়ায়। কাজলী ক্রমে মস্তান সম্ভবা হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে এসে অনেক দিন পর কাজলীকে দেখে রাহুল অবাক হয়ে যায়। সংসারের প্রয়োজনে কিশোর শহরে চাকরির খোঁজে রওনা হয়। ট্রেনের জন্য রাস্তা সংক্ষেপ করতে কিশোর বাঁধের ওপর উঠে রেল লাইনে পা দেয়। একজন পাহারাদার সেপাই তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে কিশোর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কাজলীর দুগাল বেয়ে অবিরল ধারায় আশ্রম গাড়িয়ে পড়ে।

আলোচ্য উপন্যাসের দশ সংখ্যক পরিচ্ছেদের শুরুতে কুণাল তার দাদাকে চিঠিতে জানায় লিবিয়ার কোনো মরা প্রান্তর থেকে। সে চিঠিতে ভারতীয় সেনাদের জন্য গর্ববোধ করে। তার গর্ব যে, ''দারুণ অসুবিধার মধ্যে পড়েও ভারতীয় সোপাইরা সামনা সামনি যুদ্ধ করে গোরা সৈন্যদের হটিয়ে দিয়েছে।'' (দশ কত ক্ষুধা)। রাহুল লক্ষ্য করছিল সেকালে মানুষ মরছে অনাহারে। মানুষ তৈরী করেছে কৃত্তি কৃত্রিমভাবে দেশে আকাল। এদেশে ''দুস্থ, নিঃস্ব যে হাজার হাজার গ্রামবসী এই আমিরি শহরে এসে আছড়ে পড়েছে, যন্ত্রণায় কাৎয়াছে তারা।'' (দশ -কত ক্ষুধা) খাদ্যের অভাবে মানুষ শহরে ভিড় করতে থাকে। আর এক শ্রেণীর মানুষকে টাকার নেশা পেয়ে বসেছে। হৃদয়হীন , অমানুষগুলি দেশ জুড়ে অর্থনৈতিক ডাকাতি করছে। গ্রামের মানুষ পিতৃ পুরুষেরা ভিঠেমাটি ছেড়ে শহরে একমুঠো অন্নের জন্য হহাকার করছে। তাদের সম্বন্ধে কালো বাজারী মজুতদারেরা মহা অমনোযাগী ও উদাসীন। এসব ভেবে রাহুল চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে ভাবে নিতান্ত নিজের পেটের জন্য মানুষ বিদ্রোহী হতে পারবে না কেননা সেটা নেহাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থ। কিন্তু এই নিরন্ন মানুষগুলিই যখন নীতির প্রশ্নে তারা লড়াই করবে তখন তাড়া প্রাণ দিতেও পিছপা হবে না। কিন্তু বাদুল আশাবাদী ''কিন্তু দিন আসবে - কোটি কোটি মানুষ চোখে মেলে সত্যকে দেখবে, বাঁচবার অধিকার তারা বুঝে নেবে। সেদিন তাদের জ্বলন্ত ক্রোধের সামনে অত্যাচারীর দল প্রাণ ভয়ে কাঁপবে।'' (দশ - কত ক্ষুধা)

ঔপন্যাসি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কত ক্ষুধা ' উপন্যাসের এগারো সংখ্যক পরিচ্ছেদে আমরা দেখি একদিকে বাংলার নিরন্ন হাহাকার বুভুক্ষের মিছিল অন্যদিকে পাঁচ মাসের গর্ভবতী কাজলীর প্রকৃতির বুক চিড়ে ফসল ফলানোর অদম্য চেষ্টা। সে মাটি কুপিয়ে ঢেলা ভেঙে, আগাছা নিড়িয়ে বা বাগান লাগানোর চেষ্টা করে কাজলী। সে ''বেড়ার ধারে ধারে কাজলী সিমের বীজ লাগিয়েছে। বরবটি গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। এরই মধ্যে বেশ তরতরিয়ে বেড়ে উঠেছে। বেগুন আর সিমের মাঝখানে এক সার ঢ্যাড়স্ গাছ। ঘরের চালের ওপর লতানো কুমড়োর ডাঁটা। বছরের শেষে শুকিয়ে এসেছে। উঠোনের এতটুকু মাটিও পড়ে থাকতে দেয়নি কাজলী।'' (এগারো - কত ক্ষুধা) ''দিনে হাজারবার কাজলী হেঁট

হয়ে গাছগুলোকে দেখে। আস্তে আস্তে সেগুলি থেকে মুকুল বের হয় ধীরে ধীরে শাদা ফল বড়। তার গাছ প্রতিদিন কেমন করে বেড়ে ওঠে সে ধৈর্য ধরে তা দেখে। ধৈর্য ধরে তাদের বেড়ে ওঠা প্রতীক্ষা করে সে। কাজলীর গাছের সঙ্গে অসাধারণ শৈল্পিক গুণে লেখক বাংলার দেশ লড়ছে জীবন মরণ লড়াই। মানুষের সত্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ক্ষুধার্ত শিশুরা কেঁদে কেঁদে মরে যায়। দলে দলে মানুষ মরিয়া হয়ে বাপদাদার ভিটে মাটি ছেড়ে অন্নের সন্ধানে পথে বার হয়। ট্রেনের পাদানীতে ঝুলতে ঝুলতে, চলন্ত ট্রেনের ছাদে উঠে রোদ্দুরে ঝল্সায়। পুলিশ এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। মাঠ খাটের ওপর দিয়ে দলবদ্ধ মানুষ তখন পায়ে হাঁটে। দশ হাজার গ্রাম স্রোতের মতো শহরে ধাওয়া করে।'' (এগারো কত ক্ষুধা)। গ্রামের ছোট ছোট কচিকাঁচা অনুর পরিবার, বিষ্টুর বছর চারেকের বোনটা গলা গলা করে সেদ্ধ ডুমুর খায়। অসুর মা দিদি অনভ্যাসে খেতে না খারলেও বুনো কচু খেতে বাধয হয়। আতঙ্কে হতাশায় অসুর কান্না পায়। সে চোখের পাতা দিয়ে আশ্রয় ঠেকিয়ে রাখে। এসময় বাংলায় প্রচর গরুর চাহিদা বাড়ে। কেনানা পল্টনরা গরুর মাংস খায়। সমাজিক দায়বদ্ধ শিল্পীর চেতনা নিয়ে সমকালের মন্বন্তরের বাংলার ছবি এঁকেছেন ঔপন্যাসি হৃদয়ের তুলিতে। ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের (কত ক্ষুধা) উপন্যাসের সংখ্যক পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই মঙ্গলার খেয়ে বাঁচার মতো ঘাসের জমির অভাব। কারণ হিসেবে ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন-- ''ফসল বাড়ানোর জন্যে গাঁয়ের পুরনো গোচর ভূমিতে এখন আবাদ হচ্ছে - গোরমেন্টের নাকি হুকুম। একটু দূরে আর যেসব মাঠ ছিল, সেখানেও গাঁয়ের লোকের গোরু চরানো বন্ধ ।কেন বন্ধ তা কেউ জানে না। তবে মনে হয়, যেসব পাইকাররা গোরু কেনাবেচা করছে, এ হল তাদেরই ফন্দি। যেসব গোঁয়ার লোকেরা কিছুতেই গোরু বেচতে চাইছে না, ই ভাবে তাদের প্যাঁচে ফেলা হচ্ছে।'' (বারো - কত ক্ষুধা)। এই পারিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই পঞ্চাশের মন্বন্তর মানুষের কৃত্রিম সৃষ্টি। আর এই সংকটের আগুনের আঁচ কেবল মানুষই নয় - মনুষ্যেতর প্রাণীগুলিকেও সেদিন পুড়িয়ে দিয়েছিল সেই দুর্ভিক্ষের আগুন। অস্থিচর্মসার সেদিনের সেই গরুগুলোর দুধেণ আশা ছিল না। কেননা গাইগুলোর বাঁট শুকিয়ে সিঁটকে গিয়েছিল। মঙ্গলাকে নিজের প্রাণ থাকতে বেচে দেবার কথা ভাবতে পারেনা চাষি মা। শেষ পর্যন্ত নিজের পেটের ক্ষিদেয় মঙ্গলার গলার ঘন্টা টি বিক্রি করে সে। দুর্ভিক্ষে সেদিন মা সন্তানের ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে একটি জেলের বউ তার গর্ভের ছোট শিশুটিকে গর্তে মাটি চাঁপা দেয়। লেখক বলেন ''ছেলেটা চিঁ চিঁ করে ক্ষীণ কণ্ঠে কাঁদে। মেয়েটি আদর করে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে ঃ সোনা আমার, আর খিদেয় কষ্ট পাবে না। মালিক আমার ঘমোও। গর্তের মধেয ছেলেটাকে শুইয়ে দেয়, হাড়

বার করা বুকের ওপর দুটো কাঠি কাঠি হাত জোড়া করে চোখের পাতা টেনে বুজিয়ে দেয়। ছেলেটাকে সেযন ঘুম পাড়াচ্ছে। তার পর তাড়াতাড়ি গর্তটা মাটি দিয়ে ভরাট করতে থাকে।

মা যেন পাথর হয়ে গেছেন। নড়তে পাড়ছেন না, কথা বলতে পারছেন না। ছেলেটার চিবুক পর্যন্ত যখন মাটি ভরাট হয়ে এসেছে, তখন মা মরিয়া হয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন।'' (বারো - কত ক্ষুধা)

সেই দুভির্ক্ষের সুযোগ নিয়ে শহরের একশ্রেণীর উচ্চবিত্ত গ্রামের সুন্দরী মেয়ে ও নারী ভোগের লিপ্সার মেতে উঠেছিল। এই শারীরিক ক্ষুধায় ও পাশাবিক চাহিদায় সেই শ্রেণীর মানুষগুলো মহিলাদেরই ব্যবহার করেছিল সেদিন। এই প্রয়োজনে শহরের সেই মানুষগুলো একটি মেয়ে মানুষকে শাড়ী, মিস্টি ও চাল দিয়ে পাঠায় কাজলীর বাড়িতে। সেই মহিলা কাজলীর মাকে ফিস্ ফিস্ করে বলে -- ''রাণির মতো থাকবে তোমার মেয়ে। যেমন গড়ন তেমনি রূপ। শহরের লোক ওকে দেখে পাগল হয়ে যাবে, ওর পায়ের ধূলো চাটবে। যত ইচ্ছে কুঁচকি - কণ্ঠায় খাবে। দেদার শাড়ি পাবে, গয়না পাবে গা-ভর্তি। সোনার চুড়ি, সোনার রুলি। মণিমুক্তোর হার, কানপাশা। দেখ তোমার জন্যে এই শাড়ি এনেছি''। (বারো- কত ক্ষুধা) দুর্ভিক্ষের দিনে উচ্চবিত্ত মানুষগুলির যৌন চাহিদা ও ভোগবাসনার বাদ পড়েনি অন্তঃস্বত্তা নারীরাও। এরই প্রকাশে লেখক লিখেছেন-- ''কতদিন আর মিথ্যে ইজ্জত ধুয়ে যাবে? তারপর মেরে দিকে তাকিয়ে ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করে। অনাহারে যেন তার রূপ আরও খুলে গেছে। শুকনো খরু মুখে বড় বড় টানা চোখ। পেটে ছেলে থাকায় স্তনযুগল সুপরিণত। কিন্তু অনাহারের দরুণ ক্ষুদ্রকায়। '' (বারো - কত ক্ষুধা)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কত ক্ষুধা ' উপন্যাসের (তের) সংখ্যক পরিচ্ছেদে শ্রেণী বৈষম্য ও লেখকের পুঁজিবাদী জনমানষের প্রতি শ্লেষাত্মক সৃষ্টি মানুষ পাই আমরা । সেই সঙ্গে অনাহার ক্লিষ্ট দুস্থ মানুষের প্রতি লেখকের দরদ ভরা জীবন প্রত্যয় দেখি। তাদের কথায় লেখক বলেন ''এই বড় রাস্তা ধরে ছিন্নমূল মানুষ ঘা-দগ্ দগে পায়ে দলে দলে গেছে অদৃষ্টের সন্ধানে। এমনি আরও শত শত রাস্তা ধরে। যত গেছে, ততই কুয়াশার মধ্যে অনিদির্ষ্ট দূরে সরে যায়। পেছনে অতীত নেই। সামনে ভবিষ্যৎ নেই। শুধু মুহূর্তের মধ্যে, শুধু শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে বাঁচা। ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু, চোখ মেলে জীবন, আবার মৃত্যু। রাস্তা তোমার ঘরবাড়ি পথের শুরু কোথায়, শেষ কোথায় দেখা যায় না। রাস্তার ধুলো তুমি, রাস্তা থেকে তোমাকে আলাদা করা যায় না। তোমার নাম দিয়েছে ওরা দুস্থ।'' (তের -কত ক্ষুধা)

গ্রামের হাজার হাজার মানুষ একমুঠো ভাত ও ফ্যানের প্রয়োজনে শহর অভিমুখে ছুটে চলেছে। খাদ্যের সন্ধানে অন্তঃসত্ত্বা নারী কাজলী, নাবালক অনু সকলেই শহরের দিকে ধাবিত হয়। পুলিশের গুলিতে যারা বিকলাঙ্গ তারাই কেবল সেদিন গ্রামে ছিল বাধ্য হয়েই। তথাপি ''মহাজন গাঁ থেকে নড়ছে

না! সে একধার থেকে জমি কিনবে, সম্পত্তি কিনবে। সাধারণ মানুষের সে কেউ নয়। শকৃসিরা মানুষের দুঃখ দুদর্শার ওপর বেঁচে থাকে।'' (তের - কত ক্ষুধা) এখানে লেখকের উচ্চবিত্তের শোষণ বঞ্চনা লোভের প্রতি প্রতিবাদ ও ক্ষোভের প্রকাশ আমরা পাই। মন্বন্তরের গ্রামীণ দুর্দশা গ্রস্থ অসহায় মানুষের প্রতি একাত্ম হয়ে ঔপন্যাসি বলেন '' রাস্তার পাশে জড়াজড়ি করে পড়ে আছে মানুষের শব। হাড় থেকে ঘসিয়ে নিয়েছে মাংস, খাবলানো চোখ - নাক, চিবুক আর পাঁজরের কাছটাতে সামান্য একটু চামড়া আর মাংস লেগে আছে। মাথার খুলি ঠুকরে ঠুকরে ভেঙেছে, চুলগুলো শুধু অক্ষত। বাচ্চাদের পাতলা চুল, পুরুষদের চুল, মেয়েদের কটি তট বিস্তৃত কেশপাশ। একটি গোটা পরিবার চির নিস্প্রায় শায়িত, নিদ্রার পরপারে শকুনির দল।'' (তের-কতক্ষুধা) এখানে অসহায় মানুষের দুভির্ক্ষের কবলে ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছিল। অন্যদিকে সম্পত্তি ও ধন লোভের ক্ষুধায় পুঁজিবাদি মানুষ অমানবিক ভাবে কতটা ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছেন তার জীবন্ত দলিল উপন্যাসে শিল্পিতরূপ দিয়েছেন লেখক। মৃত্যুর পাহাড় ডিঙিয়ে লেখকের ইতিবাচক প্রচন্ড শাবাদিতা তথাপি। জিইয়ে থাকে আগামী প্রচন্ডকে নিয়ে। সেই আশাবাদের কথায় পেটের সন্তান গর্ভে নড়েচড়ে উঠলে কাজলী বলে ''জেগে আছিস? কাজলী দীর্ঘশ্বাস ফেলে নাভিদেশে হাত বোলায় তার অনাগাত সন্তানকে সে আদর করছে। জীবনের সমস্ত রঙিন স্বপ্ন টুকে গিয়ে একটিমাত্র অবশিস্ট আছে। আজও কাজলী স্বপ্ন দেখে তার আগত শিশুকে নিয়ে। '' (তের - কত ক্ষুধা)। সৃস্টির ধারা সময়ের নিয়মে সংকটকে ভিঙিয়েও অটুট থাকে । সেকালে অর্ধমৃত অস্থিচর্মসার মানুষগুলো শেয়াল কোথাও কোথাও জ্যান্ত ছিঁড়ে খেয়েছিল। একসময় কাজলীর শরীর থেকে যখন রক্ত স্রোত বয়ে তার শরীরে যখন সেপ্সিস্ দেখা দিয়েছিল তখন তাকে শেয়াল ছিঁড়ে খাবার উপক্রম দেখা দিয়েছিল। তাকে সেদিন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায় ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কত ক্ষুধা ' উপন্যাসের চোদ্দ সংখ্যক পরিচ্ছেদে লেখক বাংলার মন্বন্তরের কৃত্রিম উপায়কে অন্বেষনী সন্ধানে লিখেছেন -- ''ধান বেরিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে! এক কোটি চাষি যখন খিদেয় আর্তনাদ করছে, তখন তাদের ঘর্মাক্ত হাতে বোনা ধান বাংলাদেশ থেকে প্ল্যান-মাফিক বেরিয়ে যাচ্ছে।'' (চোদ্দ - কত ক্ষুধা) লেখক দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জীবন-মৃত্যুর তথ্যানুসন্ধান করে বলেছেন-- ''গ্রাম থেকে স্রোতের মতো আসছে বুভুক্ষু জনতা। তাদের এক বিরাট অংশের শক্ত খাদ্য হজম করার ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং তারা মরে গেল। তাদের ভাত খেতে দেওয়া মানে মেরে ফেলা। বিশেষ পক্ষের দরকার ছিল তাদের। '' (চোদ্দ - কত ক্ষুধা)।

বিবেকহীন মানুষ সেদিন সমাজ সচেতন শিল্পীদের বাস্তবতার ছবি আঁকাকে আঘাত করে স্তব্দ করে দিতে চেয়েছিল তাদের সৃজনী ধারাকে। এক শিল্পী যখন দুর্ভিক্ষের বাস্তব ছবিতে শিল্পে আকতে বসেছিলেন - মা মরে গেছে আর জ্যান্ত অবস্থায় তার ছেলে বুকের দুধ খাচ্ছে। শিল্পীকে শক্তিমানেরা সেদিন কিল-চড়-ঘুষি দিয়ে তার ছবি আঁকার প্যাড ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল। ''শিল্পী ভদ্রলোক দেহ দিয়ে তাঁর ছবিটা আড়াল করে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লেন। প্রচন্ড চড় লাথি বর্ষণ হতে লানাল তাঁর ওপর। '' (চোদ্দ - কত ক্ষুধা)।

আলোচ্য উপন্যাসের (পনেরো) সংখ্যক পরিচ্ছেদে মঞ্জুওকে তার স্বামী রাহুলের সঙ্গে থাকতে দেখা যায় শহরে। রাহুলের মনে সব সময় অস্থির সুখ নেই। গবেষণায় তার মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে প্রথম প্রথম মঞ্জু রাতে ঘুমোতে পারি না। তার কানে আসে বুভুক্ষু মানুষের মর্মন্তুদ আর্তনাদ - ঘা খাওয়া পশুর মতো। একটানা গোঙানি আর শূন্যগর্ভ বিলাপ - মা! মা - গো-মা! ফ্যান দাও, মা পায়ে পড়ি, মা। '' ক্ষুধার্ত মানুষের আর্ত চিৎকার ক্রমশঃ কেমনভাবে মানষের অনুভূতিতে সহনশীল হয়ে ওঠে তার ছবি তুলে ধরেছেন লেখক মঞ্জুর কথায়। লেখক বলেন -- ''দিনের পর দিন, ঘন্টার পর ঘন্টা, মিনিটের পর মিনিট নিজের বাড়ির দরোজায়, পাড়াপড়শির দরোজায় সেই ক্ষুধার্ত চিৎকার শুনতে শুনতে একদিন তার ধার অনেকটা ভোঁতা হয়ে যায়; প্রথম প্রথম যে বেদনা, যে করুণা জাগত, তা আর জাগে না। শেষ পর্যন্ত আর কোনই অনুভূতি জাগে না আহত পশু মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করলে যেমন আমরা দেখেও দেখি না তেমনি। '' (পনেরো - কত ক্ষুধা)। মঞ্জু জীবনের রুঢ় দিক টিকে বরাবর এড়িয়ে চলেছিল। সেই মেয়ে মঞ্জুর একটি অন্তঃসত্ত্বা পীড়িত মেয়েকে সুশ্রুষা করে ভালবাসার নতুন অর্থ উপলব্ধি করে। ''পীড়িত মেয়েটিকে প্রথমে সে দৈহিক শক্তি দিয়ে সাহায্য করেছে। সেবা করে এক অদ্ভুত নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে সে। নিজেকে আর কখনও এতটা উন্নীত বলে মনে হয়নি। '' মঞ্জু চরিত্রের মধ্যে এখানে লেখক সেবার মহৎ আনন্দের প্রকৃতি শিল্প রূপদান করেছেন। মঞ্জুর চেতনায় মানুষের প্রতি দরদবোধের জাগরণ ঘটে। রাহুলের অসুখী মনের আত্মক্ষয়ী অস্থিরতার সন্ধান পায় মঞ্জু। মঞ্জু বিশ্বনিয়মের রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার স্বামীর অন্তরের সন্ধান পায়। দাম্পত্ত জীবনের দুটি মনকে একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করানোর এক অভিনব শৈল্পিক বোধের পরিচয় দিয়েছেন লেখক। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষও বাঁচার লড়াইয়ে শহরের ডাস্টবিনে কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে স্তুপাকার জঞ্জালে সেদিন খাদ্যের কণা দখল করে নিয়েছিল।

আলোচ্য উপন্যাসের (ষোল) সংখ্যক পরিচ্ছেদে মঞ্জু আর্তমানুষের রিলিফের কাজে মেতে ওঠে। লঙ্গর খানা চালু রাখার কাজে রাহুলকে সাহায্য করে। শিশুদের মরা শিশুদের অনাথ আশ্রম খোলে। তাদের মজুত কাল শেষ হয়। সমরেন্দ্র বাবু মঞ্জুকে চেক লিখে দেয় টাকার জন্য। সমরেন্দ্র বাবু বেঙ্গল লিমিটিডের মালিক লক্ষ্মীনাথকে মনে মনে ঘৃণা করে। কেননা সেই লক্ষ্মীনাথ চোরা বাজারের রাজা। সে দুর্ভিক্ষ্য অঞ্চলের বুকের ওপর চালের গোপন আড়ত তৈরী করেছিল। সমরেন্দ্র বাবু যে কেবল পয়সা আর খেতাব কেই জীবনের লক্ষ্য বলে জেনে এসেছে সে খেন লক্ষ্মীনাথ কে ঘৃণা করে। এই শ্রেণীর মানুষেরা চরিত্রহীন ও লজ্জাহীন। তারা মানুষের যৌন অভিজ্ঞতার কথার অদ্ভুত আনন্দ পায়। সমরেন্দ্র বাবুর কাছে তাদের চাহিদাগুলো তাদের নিজেদেরই বিকৃত ও অসুস্থ মনের পরিচায়ক। সমরেন্দ্র বাবুর মনে হয় - লক্ষ্মীনাথাদের নিজেদের নোংরা জিনিসগুলো দশজনের চোখের সামনে তুলে আনন্দ পায়। এই পরিচ্ছেদে লেখক দুর্ভিক্ষের জন্য স্বার্থপর মানুষের প্রতি অঙ্গগুলি নির্দেশ করেছেন। ব্যক্তি স্বার্থের উর্দ্ধে আর্তের সেবায় যুক্ত করে স্বর্গীয় আনন্দ লাভের পথ দেখিয়ে একটি পরিবারকেও উৎকর্ষতা দান করেছেন।

আলোচ্য উপন্যাসের (সতেরো) সংখ্যক পরিচ্ছেদে বাংলার দুভির্ক্ষের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বোধের পরিচয় আমরা পাই। আলোচ্য পরিচ্ছেদের শুরুতেই আমরা দেখি সোলে মেদিনীপুরের এক সংবাদ দাতার কথায় তিনটি সন্তানের দুস্থ জননী গঙ্গায় ডুবে মরার চেষ্টা করেছেন। সেই পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়া থেকে রয়টারের তার বার্তা ''মাখনের বরাদ্দ কম করার প্রতিবাদে খনিমজুররা ধর্মঘট করেছে।'' রাহুলের মনে হয় সারা পৃথিবী এক, একই অবস্থা কমনওয়েলথ এর। সোলে একটি খবরের কাগজের কার্টুনে দেখানো হয়েছিল-- ''ওপরওয়ালা প্রধানমন্ত্রী জাগ থেকে জল ঢালছেন আর বড়লাট সাহেব হোয়াইট হলে দাঁড়িয়ে সেই জলে হাত ধুয়ে দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে দায়িত্ব স্খালন করছেন।'' (সতেরো - কত ক্ষুধা)

বিপর্যয়ে বিধস্ত মানুষগুলো সেদিন তাদের সমস্ত অনুভূতি নৈতিক বোধ ও মূল্যবোধগুলো হাড়িয়ে ফেলেছিল। লেখকের কথায় ''এরপর হল নৈতিক অধঃপতন। গোড়ায় গোড়ায় ক্ষুধার্ত বাপমায়েরা যেটুকু খাদ্য সংগ্রহ করতে পারত ছেলেমেয়েদের দিত। সকলের তাতে ফুলত না। কিন্তু খিদে যতই মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল, ততই মানুষের সূক্ষ্ম অনুভুতিলো অসাড় হয়ে ঘরে যেতে লাগল। মনের দিক থেকে ময়ে পুরুষেরা পশুর স্তরে নেমে গেল।'' (সতেরো কত ক্ষুধা) সোলে রাস্তার দুপাশে নোংরা দেহের স্তুপ পচাগলা দেহের স্তুপ ময়লা জঞ্জালের দুগন্ধে পথ চলা কঠিন হয়েছিল। আকাশে জাপানী যুদ্ধ বিমনের বিরামহীন আওয়াজ সহ কঠিন পরিস্থিতি ও বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল মানুষ।

'কত ক্ষুধা ' উপন্যাসের আঠারো সংখ্যক সর্বশেষ পরিচ্ছেদের শুরুতে আমরা দেখি দুভিক্ষের কবলে পড়ে এক পান ওয়ালীর কাছে নিজের দেহ বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়। লেখকের কথায়-- '' কাজলী শেষ পর্যন্ত নিষ্করুণ সংকল্পে মন বেঁধে ফেলেছে। সে তার শেষ সম্বলটাও বিকিয়ে দেবে নিজেকে। মার মরণদশা। অসুখে ভুগছেন। ছেলেমেয়েরা রাস্তায় ভিক্ষে করে জঞ্জাল খেঁটে যে খাবার টুকু আনে মা তা খেতে পারেন না ---- সত্তরটা টাকা। তার এই দেহটার দাম অত টাকা? কাজী বিরস মখে অবাক হয়ে ভাবে। মাঠের রাস্তায় এ দেহের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে। আবারও না হয় সে দেহ অপবিত্র হবে, তবু সেই পয়সায় মাকে বাঁচিয়ে তোলা যাবে।--- মার দিকে চাইলে তার চোখ জ্বালা করে, বুকের ভেতরটা কেঁদে ওঠে। হ্যাঁ, সে শেয়ালের হাতেই নিজেকে তুলে দেবে, যে শেয়াল তার বাচ্চাটাকে ছিঁড়ে খেয়েছে। তার আর বেঁচে থেকে কী লাভ? শেয়ালটা তাকেও খেয়ে ফেলুক'' আঠারো কত ক্ষুধা। সে ভাবে একদিন সুদিন আসবে। গ্রামে জমি জায়গা আছে। সেখানে তার বাবাও জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরবে। আর অনু ও একদিন তার মাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। হয়তো তার স্বামী কিশোর আর ভাই অনুর ফাঁসী হয়েগেছে জেলে। জন্মজন্মান্তরে সেই স্বামী কিশোরের সঙ্গে একদিন সে মিলিত হবে। এই মাটিতেই জন্ম নিয়ে কাজলী কিশোরকে আবার স্বামী রূপে পাবার প্রার্থনা করে। তখন জেলে জেলে চলছিল ভুক হরতালি কংগ্রেস নেতারা আমৃত্যু অনশন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেদিন। দেবেশ বসু দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলে-- ''ভাই বন্ধুরা পতাকার সম্মান রেখো, নিজেদের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করে না। চরম পরীক্ষার দিন এসে গেছে। শক্ত হও। সত্য নিষ্ঠ হও। মৃত্যুঞ্জয়ী হও। বন্দেমাতরম্'' (আঠারো - কত ক্ষুধা)। দেশবাসীর বুকে তখন স্বাধীনতার চরম ক্ষুধা। কাজলী সেই পানওয়ালীর সঙ্গে তার কথায় দেহ বিক্রিতে চলেছে। তার স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে তার দাদুর কথায়। কাজলী পতাকাকে প্রণাম করেছে। সে নিজেকে দেশের সৈনিক ভাবছে। ক্রমশ তার মনে হয় শত অত্যাচারেও অনশন সংগ্রামের যন্ত্রণায় যত ব্যথা পেয়েছিলেন দাদু তার নিজের জন্য দেহ বিক্রির কথা শুনলে সে দাদু কতটা ব্যথা পেতেন। ক্রমশ তার অসার অনুভুতিগুলি আচ্ছন্নতা কাটিয়ে প্রাণশক্তি ফিরে পায়, তার বাবা - তার কানু ভাই দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়েছে স্বামী কিশোর মজুরদের জন্য লড়েছে তারা কেউ হার মানেনি। কখনো নিজের জন্য মন ভাঙেনি। আর কাজলী সেখানে নিজের দেহ বিকিয়ে দেবে। দেশের কাগজগুলো জনসাধারণের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা সবর্ত্র ছড়িয়ে দিয়ে জনসাধারণের চেতনায় আঘাত করে সর্বত্র উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সেই দেশীয় সর্বত্র উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সেই দেশীয় কাগজগুলি সঙ্কটে পড়েছিল সেদিন। কাজলী তার দেহ বিক্রির জন্য আগাম নেওয়া টাকাগুলো কাগজের জন্য দান করতে প্রস্তুত হয়। আর সেই পানওয়ালার কাছে মনে হয়

কাজলী পাগল হয়ে গেছে। অপরদিকে সমরেন্দ্র বাবু মঞ্জু ও অন্য ছেলেদের দেশের লড়াইয়ের মানস্তি। তার উপলব্ধি জাগিয়ে তোলে। সম্বিত ফিরে পেয়ে তার জীবনের চাওয়া-পাওয়ার জীবন সম্পর্কে আপসোস করতে থাকেন। আর রাহুল পরাধীনতা থেকে মুক্তিই কেবলমাত্র উপায় নয় বলে ভাবে। সে নতুনন জীবন গড়ার কথা ভাবে। সেখানে অনাহার আর দুভাবনা ভয় তার শোষনের হাত থেকে মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরাধীনতার কবল থেকে দেশকে মুক্ত কের নতুন জীবনের বাঞ্ছিত সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই করে। সেখানে মানুষ নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকার নিজেরাই প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। রাহুলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। রাহুলের মানসপটে ভেসে ওঠে এক বিরাট যন্ত্রণার ছবি '' তার সামনে ভেসে উঠছে দুঃখ যন্ত্রণা অন্তহীন ছবি। লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা দুমুঠো ভাতের জন্যে ধুঁকে ধুঁকে মরেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ, যারা রোগের হাতে মরতে বসেছে, আরও লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল ছিন্নমূল মানুষ রুজিরোজগার হারিয়ে যাদের ভাঙা দেহে ভাঙা মনে বেঁচে থাকতে হবে - মানুষ বলে চেনা যাবে না। যারা সকলের জন্যে মহত্তর জীবন চেয়েছিল, সেই মেয়ে পুরুষ বন্দির ভিড়ে জেল খানা ভারাক্রান্ত'' কিন্তু জেল খানায় নিজেকে একা ভাবে না। সে লক্ষ লক্ষ মানুষের তরঙ্গে নিজেকে একটি বদ্বদমাত্র মনে করে। জেল খানায় সামগ্রিক কারো মধ্যে পরাজয়ের চিহ্নমাত্র নেই। বন্দীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রাহুল বিশ্বকবির জয়ধ্বনি সূচক সঙ্গীতে গলা মিলিয়ে গায় -- ''ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে

মোদের আঁখি ফুটবে;

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে

মোদের বাঁধন টুটবে।''

আলোচ্য উপন্যাসের জাতীয়তাবোধ স্বদেশমুক্তির চেতনা - মন্বন্তরের মর্মন্তদ বেদনা কে সুভাষ মুখোপাধ্যায় মানানসই শব্দ যোজনায়, প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করে অনুবাদ সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন নিশ্চিত রপে। চরিত্র - বিষয় ও মহৎ জীবন দর্শন - জীবন চেতনা - জনজাগরণের লক্ষ্য জাতীয়তাবোধ আলোচ্য উপন্যাসটিকে কত ক্ষুধা উপন্যাসে রূপদানে উদ্দীপক হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল নিশ্চিত রূপে। কত ক্ষুধা সুভাষমুখোপাধ্যায়ের মহৎ শিল্পকর্মের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উপন্যাসটি মৌলিক সৃষ্টি না হয়েও রচনার গুণ, ভাষা প্রয়োগ ও বাক্য বিন্যাসে তাঁর স্বকীয়তা লক্ষ্য করা যায়।

এছাড়াও সুভাষ মুখোপাধ্যায় একাধিক গল্প-উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ভাণ্ডারে বৈচিত্র্য দান করেছিলেন । এগুলির মধ্যে তাঁর অন্যতম অনুবাদ সাহিত্য হল রুশ গল্প সঞ্চয়ন , সলঝেনেৎ সিন এর One day in the life of Ivan Denisovich এর বাংলা অনুবাদ

'ইভান দেনিসোভিচের জীবনের একদিন' , ভীষ্ম সাহানী-র বাংলা অনুবাদ উপন্যাস 'তমস' , হিউটয় এর The Springing Tiger এর বাংলা আনুবাদ ব্যাঘ্রকেতন , 'রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ , চে গেভারার ডায়েরী , ডোরাকাটার অভিসারে , সেদিন বনে জঙ্গলে , আনাফ্রাঙ্কের ডায়েরী ' ইত্যাদি অন্যতম অনুবাদ গদ্য ।

তাঁর গদ্য সাহিত্যের অন্যতম সৃষ্টির মধ্যে ছোট কিশোরদের জন্য সৃষ্ট বাঙালীর ইতিহাস , কথার কথা , জগদীশচন্দ্র বসু , দেশবিদেশের রূপকথা , ইয়াসিনের কলকাতা , টো টো কোম্পানী , রূপকথার ঝুড়ি , জানো আর দ্যাখো জানোয়ার , এলাম আমি কোথা থেকে ইত্যাদি গদ্য নিবন্ধে একজন দায়বদ্ধ শিল্পীর বিশিষ্টবোধ ও চেতনার পরিচয় আমরা পাই । তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ দুটি - 'আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন' এবং 'ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই' বাংলা জীবনী সাহিত্যের অনন্য সম্পদ । গদ্য সাহিত্যের ধারায় তাঁর 'টানাপোড়েনের মাঝখানে' , 'কবিতার বোঝাপড়া' , 'কুড়িয়ে ছিটিয়ে' , 'খোলা হাতে খোলা মনে' , 'ভূতের বেগার' 'ভিয়েতনামে কিছুদিন' , 'অগ্নিকোণ থেকে ফিরে' প্রভৃতি রচনা উজ্জ্বল সৃষ্টি ।